সাইমুম-৫৩

রাইন থেকে অ্যারেন্ডসী

আবুল আসাদ

ইবুক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম

সাইমুম সিরিজকে অনলাইনে টেক্সট আকারে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালের ১৭ই আগস্ট গঠন করা হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট (SSUP) গ্রুপ। তারপর বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুকে প্রোজেক্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন একঝাক স্বেচ্ছাসেবক এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট টীম। টীম মেম্বারদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ৮ মাসে সবগুলো সাইমুম অনলাইনে আসে। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ওয়েবসাইটঃ www.saimumseries.blogspot.com

ফেসবুক পেজঃ www.facebook.com/SaimumSeriesPDF

ফেসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/saimumseries

১

রাইন পার হয়ে এগিয়ে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি। আহমদ মুসা ব্রুমসারবার্গ থেকে রাইনের তীর বরাবর এগিয়ে কবলেঞ্জের ব্রীজ দিয়ে রাইন পার হয়েছিল। উঠেছিল ফ্রাংকফুর্ট-বন হাইওয়েতে।

আহমদ মুসার টার্গেট ক্যাসেল, হ্যানোভার হয়ে অ্যারেন্ডসীর দিকে যাওয়া। এর জন্যে ফ্রাংকফুর্ট-ক্যাসেল কিংবা বন-ক্যাসেল হাইওয়েটা বেশি সুবিধাজনক। কিন্তু আহমদ মুসা এই দুই হাইওয়ে এড়িয়ে ফ্রাংকফুর্ট-বন হাইওয়ে আড়াআড়িভাবে ক্রস করে আঞ্চলিক রোড ধরে এগিয়ে চলছে ক্যাসেল-এর দিকে।

হাইওয়ে থেকে এ রাস্তা অনেক ভিন্ন। গাড়ির সেই ভিড় এখানে নেই, সেই স্পিডও কোন গাড়ির নেই। ড্রাইভ তাই এখানে অনেকটাই চাপবিহীন।

বামে টার্ন নিতে গিয়ে আহমদ মুসা রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকাল। তাকাতে গিয়ে নজর পড়ল ড্যাশবোর্ডের উপর রাখা একগুচ্ছ গোলাপের উপর।

গোলাপ গুচ্ছটি তার মনকে টেনে নিয়ে গেল এক তরুণের দিকে। রাত ১২টার দিকে যখন তারা বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল গাড়ি নিয়ে সে সময় দেখা এই তরুণের সাথে।

একজন ফাদারের পোশাক পরা আলদুনি সেনফ্রিড গাড়ি থেকে নেমে গেট লক করছিল। আহমদ মুসা বসেছিল ড্রাইভিং সিটে।

সেই তরুণটি আহমদ মুসার পাশের জানালায় এসে দাঁড়িয়ে তুলে ধরে ঐ ফুলের গুচ্ছ।

আহমদ মুসা তরুণটির দিকে একবার তাকিয়ে ফুলের গুচ্ছটি হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল।

গোলাপের গুচ্ছ দেখেই আহমদ মুসার মন কথা বলে উঠেছিল।

ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়েই তাকিয়েছিল আহমদ মুসা গুচ্ছের মধ্যে একটা চিরকুটের সন্ধানে। তার সাথে সাথে মন একটা প্রশ্নও করেছিল, এ সময় ওদের চিরকুট আসবে কেন? তারা তো যাচ্ছে এখন অ্যারেন্ডসীতে।

ফুলের গুচ্ছের মধ্যে একটা লাল চিরকুটের উপর নজর পড়ল আহমদ মুসার।

তাড়াতড়ি চিরকুটটি তুলে নিয়ে পড়ল আহমদ মুসা।

একটি বাক্যমাত্র লেখা, 'মিশন অন্য কোথাও যাচ্ছে শুনেছি, জানা গেলে মন্দ কিছু হতো না।'

একরাশ বিস্ময় আহমদ মুসাকে ঘিরে ধরল। আমরা অন্য কোথাও যাচ্ছি, এরা জানতে পারল কি করে!

আমরা তিনজন শুধু জানি। আমরা কেউ তাদের বলিনি। এটা নিশ্চিত। তাহলে এই বাড়ির মালিকের কাছ থেকে জানতে পেরেছে? আলদুনি সেনফ্রিড কিছুদিনের জন্যে বাড়ির বাইরে যাওয়ার বিষয়টা বাড়ির মালিককে বলার কথা, নিশ্চয় বলেছে। তার কাছ থেকে এরা জানতে পেরেছে। আহমদ মুসার মনে পড়ল, এ বাড়ির খবর তো এরাই আমাদেরকে দিয়েছে। বাড়ির মালিকের সাথে এদের সম্পর্ক কি? আসলে কারা এরা? বাড়ির মালিক কি এদের কেউ?

এসব প্রশ্নের কোনটিরই উত্তর জানা নেই আহমদ মুসার। কিন্তু ওরা যা জানতে চেয়েছে, তা ওদের জানাব কি করে?

তাকাল আহমদ মুসা জানালার বাইরের দিকে। বিস্ময়ের সাথে সে দেখল, দু'ধাপ পেছনে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরুণটি। আহমদ মুসা মনে মনে

নিশ্চিত ছিল যে সে চলে গেছে। কারণ ইতিপূর্বে কোন সময়ই ফুলের গুচ্ছ হাতে দেয়ার পর কেউ দাঁড়ায়নি, দ্রুত সরে গেছে।

এ তরুণটি দাঁড়িয়ে আছে কেন? উত্তর নেবার জন্যে কি? তাই হবে। ভাবল আহমদ মুসা।

কিন্তু গন্তব্যের কথা কি ওদের বলা ঠিক হবে? বলা যাবে না কেন? ওরা যে অমূল্য সাহায্য করেছে, সেটা ওদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ। যা জানতে চাচ্ছে ওরা, এটা তাদের বলা যায়।

আহমদ মুসা ইশারা করে ডাকল তরুণটিকে।

এল তরুণটি।

'ধন্যবাদ তোমাদের।' বলল আহমদ মুসা যুবকটিকে উদ্দেশ্য করে।

'ধন্যবাদ স্যার।' তরুণটি বলল।

'ধন্যবাদ কেন, আমি বা আমরা তোমাদের জন্যে কিছু করিনি।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি সবার জন্যে করেন।'

বলে একটু থেমেই সে বলল, 'আমি যেতে পারি স্যার?'

'তুমি অ্যারেন্ডসী চেন? বলতে পার সোজাপথ কোনটা?' বলল আহমদ মুসা।

'ফ্রাংকফুট-ক্যাসেল-হ্যানোভার হয়ে অ্যারেন্ডসী এবং বন-হ্যানোভার-অ্যারেন্ডসী এই দুই হাইওয়ের মধ্যে ফ্রাংকফুট হাইওয়ে বেশি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু আরও সংক্ষিপ্ত পথ হলো কবলেঞ্জ থেকে ফ্রাংকফুট-বন হাইওয়ের যেখানে উঠবেন সেখান থেকে রিজিওনাল একটা সড়ক বহু গ্রাম-গঞ্জ মাড়িয়ে ক্যাসেল হয়ে হ্যানোভারকে বাঁয়ে রেখে স্যাক্সনীর ভেতর দিয়ে অ্যারেন্ডসী গেছে। এই পথে হাইওয়ের গতি নেই, কিন্তু জার্মানীর হৃদয় মানে গ্রামীণ জার্মানীর আনন্দ পাবেন।'

'ধন্যবাদ।' বলল আহমদ মুসা।

'ওয়েলকাম, স্যার। আমি আসি।' তরুণটি বলল।

'জবাব নিলে না?' মুখে মিষ্টি হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

‘জবাব পেয়ে গেছি স্যার, ধন্যবাদ।’বলল তরুণটি।

‘আমার বিরাট একটা কৌতুহল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যরি, সেটা মেটাবার সাধ্য আমার নেই স্যার।’ বলল তরুণটি।

‘নো স্যরি, ওকে। কিন্তু একটা কথা বলো, বাদেন অঞ্চলের হের হেনরীকে তোমরা চেন?’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই তরুণটি ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করে দিয়েছে। আহমদ মুসার ঠোঁটে এক টুকরো মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল।

‘এভাবে ছেলেটি চলে গেল কেন?’ বলল ব্রুনা।

‘ঠিকভাবেই গেছে ব্রুনা। তার মিশন শেষ করেই সে চলে গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক ভাইয়া, তার জবাব সে নিয়ে গেছে। কিন্তু জবাব তো দিয়ে গেল না।’ বলল ব্রুনা।

‘আমার মনে হয়, জবাব সে দিয়েও গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘জবাব দিয়ে গেছে? কিন্তু আপনার সুনিদিষ্ট জিজ্ঞাসার কোন জবাব না দিয়েই তো সে চলে গেল!’ বলল ব্রুনা।

‘তার নিরবে চলে যাবার মধ্যেই জবাব আছে। সরাসরি জবাব দেয়ার এখতিয়ার সম্ভবত তার ছিল না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘জবাবটা কি? হের হেনরীকে তারা চেনে, মানে তারা সবাই এক?’ বলল ব্রুনা।

‘আমি তাই মনে করছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তার মানে হের হেনরী তার কথা রেখেছেন। তার লোকেরা আমাদের খোঁজ-খবর রাখছে। তারা আমাদের অশেষ উপকারও করেছে।’ বলল আলদুনি-সেনফ্রিড, ব্রুনার বাবা।

‘ঠিক বলেছেন মি. সেনফ্রিড।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওদের কাজে আমি বিস্মিত হয়েছি। ওদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কি মি. আহমদ মুসা?’ জিজ্ঞাসা আলদুনি সেনফ্রিডের।

‘ওরা সংঘবদ্ধ ও নিবেদিত। ওদের সম্পর্কে আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও ওরা বুদ্ধিমান ও দক্ষ। আমাকেও ওরা বিস্মিত করেছে মি. সেনফ্রিড।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি কি মনে করেন, স্যাক্সন ধর্মনেতা হেনরী আমাদেরকে সাহায্যের এই ব্যবস্থা করেছেন?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু তিনি ছাড়া বিকল্প কাউকে দেখছিও না। যাই হোক, আমরা খুশি যে একটা অদৃশ্য সাহায্যকারীর হাত আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে।’

বলে আহমদ মুসা নড়ে-চড়ে বসল তার সিটে। সাম্‌নেই বড় একটা বাঁকের ইনডিকেটর।

স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে গতিটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিল আহমদ মুসা।

আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনাও সামনের দিকে তাকিয়েছে। তারাও আর কোন কথা বলল না।

চলছে গাড়ি, যেমনটা আশা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেকটাই দ্রুতবেগে।

ক্যাসেল পেরিয়ে হ্যানোভারকে বামে রেখে লোয়ার স্যাক্সন ও স্যাক্সন স্টেটের মিশ্র এলাকার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলছে আহমদ মুসাদের গাড়ি।

‘মি. আহমদ মুসা আমরা জার্মানীর আরেক স্যাক্সন এলাকার মধ্য দিয়ে চলছি। এটা জার্মানীর স্যাক্সন স্টেট। পাশেই লোয়ার স্যাক্সন এলাকা। রাইন এলাকা রোমানদের দখলে গেলে লোয়ার রাইনের স্যাক্সন পপুলেশনের বিরাট অংশ উত্তর জার্মানীর জলাভুমি ও বনাঞ্চলে মাইগ্রেট করতে বাধ্য হয়। বাদেনের কোন কোন অঞ্চলের মত এই অঞ্চলেও জার্মানীর আদি পপুলেশনের বাস। এ অঞ্চলেও রয়েছে জার্মানীর অনেক আদি পরিবারের মানুষ।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘ভালোই হবে যদি এখানে আর কোন হের হেনরীর সাথে দেখা হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

'ভাইয়া, এই অঞ্চলে ক্রুসেড ফেরত 'নাইট'দের অনেক উত্তরপুরুষের বাস। এদের বাস এক সময় ছিল রাইন তীরের দূর্গ ও প্রাসাদগুলোতে। কিন্তু এরাও এদের স্যাক্সন বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে গিয়ে বাধ্য হয় মাইগ্রেট করতে।' বলল ব্রুনা।

'ধন্যবাদ ব্রুনা। জার্মানী সত্যিই এক সমৃদ্ধ ইতিহাসের দেশ। ইতিহাসকে জার্মানরা রক্ষা করে চলে বলেই ইতিহাসও জার্মাকে রক্ষা করে আসছে।' আহমদ মুসা বলল।

'ইতিহাসই জার্মানদের শক্তির সবচেয়ে বড় উৎস, ভাইয়া।' বলল ব্রুনা।

'সব জাতির জন্যেই এটা সত্য ব্রুনা। যে জাতির ইতিহাস মানে অতীত নেই, তার ভবিষ্যৎ ও থাকে না।' আহমদ মুসা বলল।

কথা বলার সময় ক্লাইমেট ইন্ডিকেটরের উপর নজর পড়েছিল আহমদ মুসার। দেখল, বাইরের আবহাওয়া দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রবল বৃষ্টি আসন্ন। তার সাথে প্রবল বাতাসেরও ফোরকাস্ট রয়েছে। সংগে সংগেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'মি. সেনফ্রিড, যাত্রা শুরুর আগে আপনি বলেছিলেন, মে মাস আপনাদের এখানে সুন্দর আবহাওয়ার মাস। কিন্তু দেখুন ঝড়-বৃষ্টি আসছে।'

'হ্যাঁ, মি. আহমদ মুসা। এখনও বলছি, আমি ঠিকই বলেছি। এটাই সাধারণভাবে সত্য। কিন্তু জার্মানীর আবহাওয়া বলা হয়ে থাকে অস্থিতিশীল ও আনপ্রেডিকটেবল। যে কোন সময় যা কিছু জার্মানীতে ঘটে যেতে পারে। হয়তো সেটাই ঘটতে যাচ্ছে।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

বাইরে বাতাস বাড়তে শুরু করেছে। বৃষ্টিও দু'এক ফোঁটা করে পড়ছে। বাইরের দৃশ্য এখনও খুব স্পষ্ট নয়। প্রায় ৫০ কিলোমিটার আগে আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফজর নামাজ পড়ে নিয়েছে। এতক্ষণে সূর্য ওঠার কথা। মেঘ আর কুয়াশার কারনেই বাইরের এই অন্ধকার।

রাস্তায় গাড়ি তেমন একটা নেই।

রাতের চেয়ে গাড়ির স্পিড কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে আহমদ মুসা।

বৃষ্টি কিছুটা বেড়েছে।

মোটামুটি ফাঁকা রাস্তা ধরে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছে আহমদ মুসার গাড়ি। সামনেই একটা রাস্তার মোড়।

পাশ কাটিয়ে আসা ৫০ কিলোমিটার বামের প্রধান শহর হ্যানোভার থেকে একটা সড়ক এই মোড়ে এসে মিশেছে।

মোড়ে পেট্রোল পাম্প, পুলিশ ফাঁড়িসহ কিছু দোকান রয়েছে।

কিন্তু সেখানেও কোন লোক দেখা যাচ্ছে না। আসন্ন ঝড়-বৃষ্টির মুখে সবাই রাস্তা-ঘাট থেকে সরে গেছে। আর জার্মানীর আবহাওয়া সাধারণভাবে পূর্বাভাসযোগ্য না হওয়ার কারণে মানুষ ঝড়-বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদির প্রথম অবস্থায় অনেকটাই সাবধান হওয়ার চেষ্টা করে।

একদম রাস্তার সাথে লাগোয়া ছোট বাজারের মত জায়গাটার নাম খুঁজছিল আহমদ মুসা।

পথের পাশের জায়গাগুলোর যতটা সম্ভব নাম জানা এবং স্মরণে রাখার চেষ্টা আহমদ মুসার পুরানো অভ্যেস।

জায়গাটার নাম খুঁজতে গিয়েই আহমদ মুসা দেখতে পেল পেট্রোল পাম্পের ওপাশে রাস্তার ধার ঘেঁষে একটা ট্যাক্সির সামনে দাঁড়িয়ে একজন মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। রেইনকোট গায়ে তার। ভিজে গেছে। দেহের সাইজ দেখে সে যে মেয়ে তা নিশ্চিত মনে হচ্ছে। ট্যাক্সিটি কি খারাপ? বিপদে পড়েছে কি সে? বুঝাই যাচ্ছে গাড়ির খোঁজে সে দাঁড়িয়ে আছে। খুব বিপদে না পড়লে আসন্ন ঝড়-বৃষ্টির মুখে সে এভাবে দাঁড়িয়ে গাড়ির খোঁজ করতো না।

আহমদ মুসা গাড়ি তার পাশে নিয়ে দাঁড় করাল। গাড়ির জানালা খুলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্লিজ ম্যাডাম, কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

মেয়েটি আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ স্যার, আমার ভাড়া করা ট্যাক্সিটি খারাপ হয়ে গেছে। গ্যারেজে নেয়া ছাড়া ঠিক করা যাবে না। কিন্তু আমার জরুরি প্রয়োজন। অবিলম্বে আমাকে বাড়িতে পৌঁছতে হবে। এসব লোকাল রোডে বাসের নিয়মিত সার্ভিস নেই।'

‘ওকে, ম্যাডাম, আপনি কোথায় যাবেন? কোথায় আপনার বাড়ি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘সালজওয়াডেল।’ বলল মেয়েটি।

‘আমরা যাচ্ছি অস্টারবার্গ। এটা গেছে হেভেলবার্গের দিকে।’ আহমদ মুসা বলল। সে ইচ্ছা করেই ‘অ্যারেন্ডসী’র নাম গোপন করল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, ‘আপনি তাহলে তো ঐ এলাকার? আপনি লিংকটা বলতে পারবেন।’

‘স্যার, অস্টারবার্গ, হেভেলবার্গের পথেই সালজওয়াডেল। তবে সামান্য একটু ঘোরা পথে।’ বলল মেয়েটি।

আহমদ মুসা তাকাল আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনাদের দিকে।

‘ঠিক আছে মি. আহমদ মুসা, তাকে লিফট আমরা দিতে পারি। অসুবিধা নেই। আমরা তো ওদিকেই যাচ্ছি।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

মেয়েটি গাড়ির দিকে দু’ধাপ এগিয়ে এসেছিল।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জার্মান শ্বেতাংগদের চেহারা যেমন মেয়েটিকে পুরোপুরি তেমন মনে হলো না আহমদ মুসার কাছে। চোখ, রং ও ইমপ্রেশনে কেমন একটা ভিন্নতা আছে।

‘ম্যাডাম, আপনি চাইলে আপনাকে লিফট দিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

গাড়ির ভেতরটা দেখছিল মেয়েটি। বলল, ‘অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের অসুবিধা না হলে..।’

‘ওয়েলকাম!’ বলে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে গিয়ে ব্রুনার পাশের দরজাটা খুলে ধরল।

মেয়েটি তার হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে এসে ‘থ্যাংক ইউ অল স্যার’ বলে ভেতরে ঢুকে ব্রুনার পাশে বসতে বসতে বলল, ‘ম্যাডাম, স্যরি ফর ট্রাবল।’

‘ওয়েলকাম। ট্রাবল কিসের? কিছুক্ষণের জন্যে হলেও একজন সাথী পেলাম। আপনার নাম কি ম্যাডাম?’ বলল ব্রুনা।

‘প্লিজ ম্যাডাম নয়। আমার নাম আদালা হেনরিকা।’ বলল আদালা হেনরিকা নামের আগন্তুক মেয়েটি।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে।

‘সুন্দর নাম। আনকমন কিছুটা।’ ব্রুনা বলল।

‘তোমার নাম কি জানতে পারি?’ বলল আদালা হেনরিকা।

‘শিওর, আমার নাম ব্রুনা ব্রুনহিল্ড। সামনে বামপাশে আমার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড। আর তাঁর ডানপাশে আমার স্যার, বড় ভাই আহমদ মুসা।’ ব্রুনা বলল।

আদালা হেনরিকার চোখে-মুখে কিছুটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছিল। সে আগেই বুঝেছিল, ড্রাইভিং সিটের যার সাথে সে কথা বলছিল, সে জার্মান নয়, এশিয়ান ধরনের কেউ। এখন দেখা যাচ্ছে সে মুসলমানও। তা হলে ব্রুনার সে বড় ভাই হয় কি করে?

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল আদালা। এই সময় তার মোবাইল বেজে উঠল। মোবাইলটা পকেট থেকে বের করতে করতে বলল, ‘প্লিজ, একটা কল এসেছে, কথা বলতে পারি?’ ব্রুনার দিকে চেয়ে বলল আদালা হেনরিকা।

‘অবশ্যই। কথা বলুন।’ বলে ব্রুনা জানালার দিকে একটু সরে হাতের ম্যাগাজিনের দিকে মনোযোগ দিল।

‘গুড মর্নিং। হ্যাঁ, মা, বল। আবার কি ঘটেছে? এভাবে কাঁদছ কেন?’ মোবাইল ধরেই ওপারের কথা শুনে বলল আদালা হেনরিকা। তার কন্ঠে আতংকের সুর।

আদালা হেনরিকার কথা শুনে সবার মনোযোগ তার দিকে নিবদ্ধ হলো। তাকালো সবাই তার দিকে।

তার কথা বলে আদালা হেনরিকা ওদিকের কথা শুনছিল।

এক হাতে মুখটা আড়াল করে মোবাইলে কথা বলছিল সে। হঠাৎ সে কান্নাজড়িত কন্ঠে বলে উঠল, ‘মা আর বলো না, সইতে পারছি না মা।আমি আসছি।

বলে আদালা হেনরিকা হাতের মোবাইলটা সিটের উপর ছুড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্না রোধ করতে চেষ্টা করতে লাগল।

ব্রুনা তার একটা হাত আদালার কাঁধে রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ঈশ্বর আছেন, ধৈর্য ধরুন। কি ঘটেছে জানতে পারি আমরা?'

ব্রুনার কথার সাথে সাথে অবরুদ্ধ কান্নার একটা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে এল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আদালা হেনরিকা।

কিন্তু শীঘ্রই নিজেকে সামলে নিয়ে দু'চোখ মুছে মাথা নিচু রেখেই বলল, 'আমার পরিবার ভীষণ সংকটে পড়েছে। ওরা আমার ভাইকে রাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এই মাত্র তার লাশ বাড়ির গেটে ফেলে রেখে গেছে। শাসিয়ে গেছে, বিকেল ৫টার মধ্যে যে কোন সময় তারা আসবে। দাবি পূরণ না হলে বাবা-মা দু'জনকেই ওরা ধরে নিয়ে যাবে। আরও বলে গেছে যে, তাদের লোকরা আবার খোঁজ নিতে আসবে আমরা তাদের কথা মানছি কি না?'

বলেই আদালা দু'হাতে মুখ ঢাকল কান্না রোধের জন্যে।

পেছন দিকে না তাকিয়েই আহমদ মুসা বলল, 'মাফ করবেন ম্যাডাম, ওরা কারা?'

'ওরা মুখোশ পরে বাড়িতে ঢুকেছিল। চিনতে পারেনি। তবে গির্জা ও সিনাগগ কেন্দ্রিক একটা গ্রুপ আমাদের পরিবারের সাথে অনেক দিন থেকে ঝামেলা করছে। পুলিশ তৎপর হওয়ার পর ঝামেলা চুকে যায় এবং তারা নীরব হয়ে যায়। আকস্মিকভাবে আবার এই ঘটনা ঘটল।' বলল আদালা হেনরিকা।

'স্যরি, জানতে পারি কি নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমাদের বাড়িতে কিছু অ্যান্টিক্স আছে। তার মধ্যে রয়েছে স্বর্ণের একটি মুকুট।

জার্মানীর সর্বপ্রাচীন রাজপরিবার স্যাক্সন ডাইনেস্টির দ্বিতীয় হেনরীর প্রপৌত্র চতুর্থ অটো উত্তর জার্মানীর নতুন স্যাক্সনল্যান্ডে নতুন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ছিল স্বর্ণের একটি রাজমুকুট। আমাদের স্বর্ণমুকুটটি একদম মূল মুকুটটির প্রতিকপি। আমাদের এই মুকুটটি তিনিই আমার প্রপিতামহের

প্রপিতামহকে গিফট করেছিলেন। এটা নিয়েই ঝামেলা। আমাদের সালজওয়াডেলে সিনাগগ-গির্জা কেন্দ্রিক হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির একটা শাখা আছে। হামবুর্গের একটা পুরাতাত্ত্বিক প্রদর্শনীতে তারা আমাদের অ্যান্টিকসগুলো দেখে। তারপর থেকেই শুরু হয় আমাদের মুকুটটা হাত করার চেষ্টা এই চেষ্টা ক্রমেই হুমকি-ধমকি ও বলপ্রয়োগে রুপান্তরিত হয়।'

'পুলিশকে জানানো হয়েছে?' আহমদ মুসা বলল।

'কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবার পর আম্মা পুলিশকে জানিয়েছেন। কিন্তু কারও নাম দেয়া সম্ভব হয়নি। সবাই মুখোশ পরিহিত ছিল। কাউকেই আইডেনটিফাই করা যায়নি।' বলল আদালা হেনরিকা।

'কিন্তু সন্দেহ তো করা যায়। যারা এক সময় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করেছিল, তারাই এবারও এটা করেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি মাকে এটা বলেছিলাম। কিন্তু সেটা হয়নি। মা পুলিশ স্টেশনে গিয়ে ঐ সন্দেহভাজনদের কথা বলায় পুলিশ অফিসার বলেছিলেন যে, ক'মিনিট আগে পর্যন্ত ওরা পুলিশ স্টেশনেই ছিল। ওদের একটা ঘটনা নিয়ে ওরা পুলিশ স্টেশনে এসেছিল। এই অবস্থায় সন্দেহ কোন কাজে আসেনি।' বলল আদালা হেনরিকা।

'বুঝেছি। আচ্ছা ম্যাডাম, মুখোশধারীরা আপনার ভাইকে নিয়ে গেল, কিন্তু সেই অ্যান্টিক স্বর্ণমুকুটটা লুট করে নিয়ে গেল না কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'ঐ সমস্যার পর ওটা আমরা বাড়িতে না রেখে ব্যাংকের সেফ লকারে রেখেছি।' বলল আদালা হেনরিকা।

'বুঝেছি, এজন্যেই তাহলে ওরা ১২টা পর্যন্ত সময় দিয়েছে যাতে এর মধ্যে তা লকার থেকে তুলে আনার সময় হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক তাই স্যার। আমরা সেটা ব্যাংক লকার থেকে আনছি কি না সেটাও তারা জানতে আসবে।' বলল আদালা হেনরিকা।

আহমদ মুসা সংগে সংগেই কথা বলল না। একটু ভাবল। কথা বলল একটু পর। বলল, 'ম্যাডাম, আমি আমার একটা মত বলতে পারি?'

সংগে সংগেই ব্রুনা আদালা হেনরিকার কানে কানে দ্রুত ফিসফিসিয়ে বলল, 'উনি একজন মিরাকল মানুষ। তার মত মেনে নিলে ভালো হবে।'

আদালা হেনরিকা কিছুটা বিস্মিত হয়ে তাকাল ব্রুনার দিকে। তার মনে প্রশ্ন, এমন ভাষায় কেউ তো তার স্বজনেরও প্রশংসা করে না। আবার ব্রুনা তো তাকে স্যার বলেছে। তার মানে উনি এদের স্বজন কেউ নন। তাহলে?

মনের মধ্যে জেগে ওঠা প্রশ্নটা নিয়ে আর এগোলো না আদালা হেনরিকা। আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'অবশ্যই স্যার, বলুন।'

'ধন্যবাদ। আপনি বললেন, ওরা খোঁজ নিতে আসবে, আপনারা বিকেল ৫টায় অ্যান্টিক্সটা তাদের দেয়ার ব্যবস্থা করছেন কি না তা জানার জন্যে। আমার মত হলো, ওরা যদি আসে, তাহলে বলে দিতে হবে তাদের দেয়া সময়ের মধ্যেই অ্যান্টিক্স তাদের দিয়ে দেয়া হবে। আরও বলতে হবে, আমাদের মেয়ে আদালা হেনরিকা আসছে, সেই ব্যাংক থেকে ওটা তুলে নিয়ে আসবে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু স্যার, আমার পরিবার জীবন গেলেও ওটা কাউকে এভাবে দিয়ে দিতে রাজি নয়। ওটা দিতে রাজি হলে তো ভাইকে মরতে হতো না। ভাইকে ওরা নিশ্চয় রাজি করাবার চেষ্টা করেছে। চেষ্টা ব্যর্থ হলে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এই মনোভাব আমাদের পরিবারের সকলের।' বলল আদালা হেনরিকা।

'আমি এই মনোভাবের প্রশংসা করছি। দিয়ে দেয়ার পক্ষে আমিও নই। কিন্তু সময় কিল করার জন্যেই ওদের আশায় রাখা প্রয়োজন। কখন ওরা খোঁজ নিতে আসবে তা জানা নেই। খোঁজ নিতে এসেই যদি ওরা জানতে পারে, অ্যান্টিক্স তারা পাবে না, তাহলে আরও অঘটন তারা ঘটিয়ে ফেলতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ স্যার। আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি গিয়ে অ্যান্টিক্স নিয়ে আসব, এটা বলতে বলেছেন। সত্যিই কি আমি অ্যান্টিক্সটি আনব গিয়ে?' বলল আদালা হেনরিকা।

'এটাও সময় কিল করা এবং ওদের আশায় রাখার জন্যে বলা হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

‘মাফ করবেন স্যার। এই সময় আমরা নিচ্ছি কেন? সময় নিয়ে আমরা কি করব?’ বলল আদালা হেনরিকা।

‘আপনি, আমরা আপনার বাড়িতে পৌঁছা, পুলিশের সাহায্য পাওয়া, আত্মরক্ষার কৌশল ঠিক করা ইত্যাদির জন্যেই সময় প্রয়োজন।’ আহমদ মুসা বলল।

আদালা হেনরিকার চোখে-মুখে বিস্ময়। সে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার ধীর ও ঠাণ্ডা কন্ঠের যুক্তি শুনে মনে হচ্ছে, সে যেন কোন অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ বা প্রবীণ দক্ষ পুলিশ অফিসার কিংবা একজন ঝানু গোয়েন্দার কথা শুনছে। তিনি কি এদের কোন একজন? কে তিনি?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আদালা হেনরিকা বলল, ‘ধন্যবাদ স্যার। অনেক ধন্যবাদ। এত অল্প সময়ে ঘটনার এমন গভীরে প্রবেশ করেছেন এবং এই মুহূর্তের করণীয়ও বের করেছেন। আপনি নিশ্চয় অনেক বড় কোন প্রফেশনাল।’

‘আমার মত সম্পর্কে বলুন। আপনি ভালো মনে করলে আপনার বাড়িতে এটা জানিয়ে দেয়া দরকার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার। আপনার মতের কোনো বিকল্প আমার জানা নেই। আমি এখনই বাড়িতে জানিয়ে দিচ্ছি স্যার।’ বলল আদালা হেনরিকা।

‘ধন্যবাদ ম্যাডাম।’ আহমদ মুসা বলল।

বাইরে বৃষ্টি তখন জমে উঠেছে।

ঝড় না হলেও ঝড়ো হাওয়া বইছে।

রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা আগের মতই কম।

আহমদ মুসা আদালা হেনরিকাকে ধন্যবাদ দিয়ে সামনের দিকে মনোযোগ দিল। বাড়িয়ে দিল গাড়ির স্পীড।

বৃষ্টি ও ঝড়ের বাধা উপেক্ষা করে দ্রুত এগিয়ে চলেছে গাড়ি।

আহমদ মুসার দুই হাতে শক্ত করে ধরা স্টিয়ারিং হুইল।

অনেকটা দূরে থাকতেই আদালা হেনরিকা তার বাড়ি আহমদ মুসাকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

রোড থেকে প্রায় ১০০ গজের ভেতরে আদালা হেনরিকাদের বাড়ি। সুন্দর তিন তলা বাড়ি ট্রিপলেক্স ধরনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেক বড় বাড়ি। অতীতের বনেদি বাড়িগুলোর মতই বাড়িটা প্রাচীর ঘেরা। রোড়-সাইডে প্রাচীরে বড় একটা ফটক। বাড়িতে প্রবেশের গেট এটাই।

বাড়ি দেখেই আহমদ মুসা বলেছিল, 'বাহ, বিরাট বাড়ি তো? জার্মানীর নাইট ও ভূ-স্বামীরাই দুর্গ কিংবা এ ধরনের বাড়িতে থাকতো।'

'ঠিক স্যার, আমাদের বাড়িটা ভূ-স্বামীদের মতই ছিল। প্রায় নয় দশ জেনারেশন আগে আমাদের এক পূর্বপুরুষকে রাজা চতুর্থ অটো স্বর্ণমুকুটটিসহ বিরাট ভূ-সম্পত্তি দিয়েছিলেন। সুতরাং ভূ-সম্পত্তি আমাদেরও ছিল। বাড়ি এবং এই বাড়ি সংশ্লিষ্ট জমি ছাড়া সে ভূ-সম্পত্তি সবকিছুই এখন বেদখল হয়ে গেছে। আছে শুধু ঐ স্বর্ণমুকুটটি।' বলল আদালা হেনরিকা।

'কিন্তু ম্যাডাম, আপনাদের বাড়িটা তো সে রকম পুরানো মনে হচ্ছে না!' আহমদ মুসা বলল।

'না স্যার, এটা সেই পুরানো বাড়ি নয়। সে বাড়িটার কিছু অংশ একদম নষ্ট হয়ে যায়। অবশিষ্ট অংশ নিয়ে নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে আমার দাদুর সময়ে। আগের বাড়ির চেয়ে অনেক ছোট এ বাড়ি।'

আহমদ মুসাদের গাড়ি এসে গেছে আদালাদের বাড়ির প্রায় সামনে।

আদালাদের বাড়ি বামদিকে টার্ন নেয়ার জন্যে আহমদ মুসা গাড়ির গতি স্লো করে দিয়েছে।

টার্নিং পয়েন্টে পৌঁছেনি তখনও আহমদ মুসার গাড়ি। একটা গাড়ি ওদিক থেকে এসে রোডে উঠে দ্রুত উত্তর দিকে চলতে শুরু করল।

গাড়িটা আদালা হেনরিকার বাসা থেকেই বেরিয়ে এসেছে, বুঝল আহমদ মুসা। বলল, 'ম্যাডাম আদালা হেনরিকা, যে গাড়িটা আপনাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সেটা কি আপনাদের গাড়ি?'

'না স্যার, আমাদের কোন গাড়ি নয়।' বলল আদালা হেনরিকা।

'পুলিশের গাড়ি তো নয়ই?' আহমদ মুসা বলল।

‘পুলিশ লাশ অনেক আগেই নিয়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি পুলিশ আসার কথা নয়। আর ওটা পুলিশের গাড়ি নয়।’ বলল আদালা হেনরিকা।

‘অ্যান্টিক্স মুকুটের জন্যে ওরা আসবে, একথা আপনার বাড়ি থেকে পুলিশকে বলা হয়েছে?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা্

‘না, পুলিসকে বলা হয়নি। ওরা শাসিয়েছে, পুলিশকে বললে বংশ সাফ করে দিয়ে যাবে।’ বলল আদালা হেনরিকা। কম্পিত তার কন্ঠ।

বাম দিকে টার্ন নিয়ে আহমদ মুসার গাড়ি আদালার বাড়ির প্রাইভেট রাস্তাটায় ঢুকে গেল।

সামনেই বাড়ির গেট।

‘মা, গেটেই দাঁড়িয়ে আছেন।’ বলল আদালা হেনরিকা।

গাড়ি গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

‘ওয়েলকাম, সকলকে। আমরা এসে গেছি।’ বলে আদালা হেনরিকা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল ষাটোর্ধ মহিলা। আদালার মা। গাড়ি থামতেই সে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছিল।

গাড়ি থেকে নেমে আদালা হেনরিকা ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। মা-মেয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে বাঁধ-ভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

গাড়ি থেকে ধীরে ধীরে নামল আহমদ মুসা, ব্রুনা ও আলদুনি সেনফ্রিড।

তিন জন গিয়ে দাঁড়াল কান্নারত মা-মেয়ের সামনে।

আদালা হেনরিকা তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

মাকে ছেড়ে দিয়ে সে চোখ মুছল।

মায়ের চোখ মুছে দিল। আহমদ মুসাদের দেখিয়ে বলল, ‘এরা আমাকে লিফট না দিলে আমার আসতে আরও অনেক দেরি হতো।’

বলে আদালা হেনরিকা মাকে সবার নাম পরিচয় করে দিল্। আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, ‘ইনি আমাকে অভিভাবকের মত পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তোমাকে ওদেরকে বলার জন্যে যা বলেছি, তা তাঁর পরামর্শে।’

আদালা হেনরিকার মা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। লম্বা একটা বাউ করে বলল, 'আমি আলিসিয়া, ধন্যবাদ বেটা। গড ব্লেস ইউ। আপনারা আমাদের মেহমান। প্লিজ ভেতরে আসুন।'

বলে আদালার মা আদালার দিকে চেয়ে বলল, 'মা, ওঁদেরকে নিয়ে চল।'

আদালা, আহমদ মুসা সকলের দিকে চেয়ে ব্রুনা বলল, 'আপনারা এগোন, আমি গাড়ি নিয়ে আসছি।'

'ধন্যবাদ ব্রুনা।' বলে আদালা আহমদ মুসাদের ভেতরে এগোবার অনুরোধ করল।

সবাই এগোলো।

ব্রুনা গিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠল।

সবাই গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

বিরাট এলাকা নিয়ে বাড়ি।

বাড়িটা আগের কাঠামো থেকে ছোট করা হয়েছে, তা বোঝা যায়।

ছোট করা হলেও ছোট মোটেই নয়।

বাড়ির বিল্ডিং-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সবাই।

বিল্ডিং-এর সামনের চত্বরটা পাথর বিছানো। চত্বরের শেষ প্রান্তে চত্বর থেকে আট নয় ফিট চওড়া সুন্দর সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে।

পৌঁছে গেল আহমদ মুসারা সিঁড়ির কাছাকাছি। আহমদ মুসার পাশাপাশি হাঁটছিল আদালা হেনরিকা। বলল, 'আমাদের দোতলায় উঠতে হবে। নিচের ফ্লোরটা কিচেন, স্টোর ইত্যাদির মত কাজে ব্যবহার হয়।

'মা আদালা, মেহমানদের তুমি উপরে নিয়ে যাও। আমি ব্রুনা মা'কে নিয়ে আসছি।' বলল আদালা হেনরিকার মা্।

'ঠিক আছে মা। তুমি এস।' আদালা হেনরিকা বলল।

দোতলার ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে আহমদ মুসাদের বসতে বলল আদালা হেনরিকা।

বিশাল ড্রইংরুম। সোফা সেঁটে সাজানো। অনেক পুরানো। ঘরের সবকিছুই পুরানো, যা মোটামুটি এখন অ্যান্টিকে পরিণত হয়েছে।

আহমদ মুসার পাশের এক সোফায় বসল ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড। আর আহমদ মুসার ডান পাশের সোফায় বসল আদালা হেনরিকা।

বসেই বলল আদালা হেনরিকা, 'স্যার, এখানকার সবই পুরানো। বলতে পারেন পুরানো এক টুকরো জার্মানী।'

'ম্যাডাম আদালা হেনরিকা, এ দৃশ্য দুর্লভ। যা দুর্লভ তার প্রতিই মানুষের আকর্ষণ বেশি হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ স্যার। তবে...।'

কথা শেষ করতে পারলো না আদালা। ঘরে প্রবেশ করল আদালা হেনরিকার মা ও ব্রুনা্

ঘরে প্রবেশ করে এগোতে এগোতে বলছিল, 'ধন্যবাদ আদালা, মেহমানদের বসিয়েছ।'

আদালার মা আহমদ মুসার কাছে এসে বলল, 'বাবা প্লিজ একটু বস। আমি আসছি। তোমার সাথে কিছু কথা আছে বাবা।'

বলে ভেতরে চলে গেল আদালা হেনরিকার মা।

মিনিট খানেকের মধ্যে একটা হুইল চেয়ার ঠেলে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল আদালার মা। হুইল চেয়ারে সত্তরোর্ধ একজন প্রৌঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, চেহারা। রঙে পুরো শ্বেতাংগ যেন নয়, চোখ ও মুখের আদলের দিক থেকেও নয়। ঠিক ইহুদিরা যেমন শ্বেতাংগ হয়েও ঠিক শ্বেতাংগ হয় না তেমন।

প্রৌঢ়ের দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। খুব বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি।

হুইল চেয়ার ভেতরে প্রবেশ করতেই আদালা হেনরিকা উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'স্যার, ব্রুনা, মি. সেনফ্রিড, হুইল চেয়ারে বসা উনি আমার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার।'

আহমদ মুসাসহ সবাই উঠে দাঁড়াল।

'গুড মর্নিং স্যার।' বলল আহমদ মুসা।

'ওয়েলকাম সবাইকে। কিন্তু আপনারা শুনেছেন, আমাদের পরিবারের জন্যে আজকের সকাল এক সর্বনাশা হিসেবে দেখা দিয়েছে।' বলল আদালার

বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার। তার কন্ঠ কিছুটা কাঁপা ও ভারি।' তার উপর তার চোখে-মুখে অসুস্থতার ক্লান্তি।

কথা শেষ করেই আবার আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'প্লিজ আপনারা বসুন। আপনারা মেহমান। আমাদের দু:খের কথা শুনিয়ে আপনাদের বিব্রত করা উচিত নয়। আমি আদালার মা আলিসিয়ার কাছে শুনলাম, আপনি আদালাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, শয়তানদের দাবি অনুসারে আমাদের স্বর্ণমুকুটটি তাদের দিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে। সে প্রতিশ্রুতি শয়তানদের দিয়ে দেয়াও হয়েছে। কিন্তু কোন কিছুর, এমনকি জীবনের বিনিময়েও পরিবারের এই ঐতিহাসিক আমানতকে শয়তানদের হাতে আমরা দিতে পারি না।' আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার এই কথাগুলো বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

'স্যার, আমি আদালা হেনরিকাকে বলেছি ঠিকই, তবে আমার পরামর্শটা সময় কিল করার জন্যে, স্বর্ণমুকুটটি ওদের দিয়ে দেবার জন্যে নয়।' আহমদ মুসা বলল।

'সময় কিল করা কি জন্যে?' জিজ্ঞাসা আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগারের।

'আমরা এখানে পৌঁছা পর্যন্ত তারা কিছু করে না বসে এজন্যেই সময় কিল করার কথা বলেছিলাম।' আহমদ মুসা বলল।

আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার সংগে সংগে কিছু বলল না। ভাবনার চিহ্ন তার চোখে-মুখে। একটু পর বলল, 'তার মানে আপনারা কিছু করতে চান। আমরা পুলিশকে কিডন্যাপের পরপরই জানিয়েছিলাম। পুলিশ এসেছিল, আমাদের স্টেটমেন্ট নিয়েছিল। 'আমরা উদ্ধারের চেষ্টা করছি' বলে চলে গেছে। আবার সকালে লাশ যখন ফেলে গেল, তখন আবার জানানো হয়েছে। পুলিশ এসে আমাদের বক্তব্য নিয়েছে, তার পর লাশ নিয়ে চলে গেছে। শয়তানরাও এই সময় আসা-যাওয়া করেছে, পুলিশ স্টেশনের সামনে দিয়েই নিশ্চয়। ইয়ংম্যান বলুন, আর কি করার আছে?'

‘লোকাল পুলিশের সহযোগিতা যদি না পাওয়া যায়, তাহলে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চাইতে হবে। ইতিমধ্যে আপনাদের ও স্বর্ণমুকুটের নিরাপত্তা নিশ্চিতের ব্যবস্থা করা দরকার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চাওয়া এবং পাওয়ার বিষয়টা সময়-সাপেক্ষ। সে সময়ের মধ্যে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘আমি একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি স্যার।’

বলে আহমদ মুসা তার মোবাইল পকেট থেকে বের করতে করতে বলল ‘আরও একবার স্বর্ণমুকুট নিয়ে সমস্যা হয়েছিল, সে সময়টা কখন এবং কোন উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা এটা দেখা-শোনা করেছিলেন, তার নাম কি ছিল?’

‘গত বছর এপ্রিলে ঐ ঘটনা ঘটে। তখন এই স্যাক্সনী অঞ্চলের পুলিশ প্রধান ছিলেন মার্লিন ডেস্ট্রিস।’ বলল আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘ধন্যবাদ স্যার।’ বলে আহমদ মুসা মোবাইলে কল করল জার্মানীর পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিসকে।

মোবাইল কানের কাছে তুলে ধরেছে। রিং হচ্ছে ওপারে শুনতে পাচ্ছে আহমদ মুসা।

তিনবার রিং হতেই ওপার থেকে ভারি কন্ঠের ‘হ্যালো’ শব্দ ভেসে এল।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাবে এ সময় সশব্দে দরজা ঠেলে ঝড়ের বেগে তিনজন মুখোশধারী প্রবেশ করল ঘরে। তাদের হাতে উদ্যত স্টেনগান।

তিনটি রিভলবার সবাইকে তাক করেছে।

আহমদ মুসার কথা বলা হলো না। মোবাইল ধরা হাত ধীরে ধীরে নেমে এল পামে জ্যাকেটের পকেটের গা ঘেঁষে।

হাতের মোবাইটি সে ছেড়ে দিল সোফার উপর। তার হাতটি জ্যাকেটের পকেটের আরও ঘনিষ্ঠ হলো।

মুখোশধারীদের একজন আদালার মাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘ধন্যবাদ তোমার মেয়ে আদালা হেনরিকাকে, সে সময় মত এসেছে এ জন্যে। তাকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। তাকে লকারের চাবি কিংবা কোড দিয়ে দাও। মুকুটটি তুলে নিয়ে

আমরা তাকে ছেড়ে দেব। আর ভালো লাগলে তোমার মেয়েও আমাদের সাথে থেকে যেতে পার। সুন্দর মেয়ে বানিয়েছ তোমরা।'

'মুখ সামলে কথা বল শয়তানরা। আর মুকুট তোমরা পাবে না। এটা আমাদের পবিত্র সম্পদ, আমাদের জীবনের চেয়ে মূল্যবান।' বলল ক্রুদ্ধ কন্ঠে আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার।

হো হো করে হেসে উঠল মুখোশধারীদের একজন। বলল, 'এটা তোমাদের পরিবারের পবিত্র সম্পদ নয়। তোমরা একে অপবিত্র করছ। আদি জার্মান রক্তের স্যাক্সন রাজা চতুর্থ অটো পোপের একজন প্রতিভূ ছিলেন। জার্মান রক্ত ও খৃস্টীয় বিশ্বাস দুই দিক দিয়েই তিনি ছিলেন পবিত্র। তার এই পবিত্র মুকুট তোমাদের মত আধা-জার্মান ও আধা-খৃস্টানদের কাছে একদিনও থাকতে পারে না। মনে রেখো, তোমরা দয়া করে আযাদ করা একজন দাস ব্যক্তির উত্তরসূরি।'

'চুপ কর শয়তান। তোমাদের মত টেররিস্ট, ক্রিমিনালদের মুখে এ সব শুনতে চাই না। মুকুট তোমরা পাবে না। আমাদের মেরে ফেলতে পার সে শক্তি তোমাদের আছে। তবে মনে রেখো, এদেশে আইন, বিচার সবই আছে।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার শক্ত কন্ঠে।

হেসে উঠে বলল মুখোশধারীদের একজন, 'পুলিশ তোমাদের নয়, আইন কি করবে, বিচার কোথায় পাবে? গত রাত থেকে দু'বার তোমরা পুলিশের কাছে গেছ। আমরা তোমার ছেলেকে রাতে ধরে নিয়ে গেলাম, তারপর সকালে এসে তার লাশ তোমাদের বাসায় ফেলে গেলাম, পুলিশ কিছু করেছে? করেনি। করবেও না।'

এ মুখোশধারী থামতেই আরেকজন মুখোশধারী শক্ত কন্ঠে নির্দেশের সুরে বলল, 'আর কথা নয়। তুলে নাও আদালা হেনরিকাকে।'

একজন মুখোশধারী সংগে সংগে এগোলো আদালার দিকে।

আদালা জড়িয়ে ধরল তার মাকে।

মুখোশধারী আদালাকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে টানাটানি শুরু করল।

‘আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের মত শয়তানদের হাতে মেয়েকে ছেড়ে দেব না।’ চিৎকার করে বলল আদালার মা।

‘শোন তোমরা, ঠিক আছে আদালা হেনরিকা যাবে, তবে তার সাথে আমিও যাব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘না, আদালার সাথে কেউ যাবে না।’ নির্দেশের সুরে সেই মুখোশধারী আবার বলে উঠল।

তার কথা শেষ হতেই আদালা হেনরিকাকে ধরতে যাওয়া মুখোশধারী আদালাকে ছেড়ে দিয়ে তার স্টেনগানের নল আদালার মায়ের মাথায় ঠেকিয়ে বলল, ‘তবে তুমি মর। তার পরেই আমরা নিয়ে যাব আদালাকে।’ তার তর্জনি স্টেনগানের ট্রিগারে চেপে বসছিল।

‘খবরদার গুলি করবে না আদালার মাকে। যদি কর তিনজনকেই মরতে হবে।’ চিৎকার করে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে উদ্যত রিভলবার।

আদালার মাকে গুলি করতে উদ্যত মুখোশধারীর তর্জনি সরে গেছে স্টেনগানের ট্রিগার থেকে আকস্মিক চিৎকার শুনে। সে আর অন্য দু’জন মুখোশধারী তাকিয়েছে আহমদ মুসার দিকে। তাদের কারো স্টেনগানই তখন আহমদ মুসার দিকে উদ্যত নয়। কিন্তু আহমদ মুসার দিকে ঘুরে তাকাবার পরই দু’জন মুখোশধারীর স্টেনগানের নল বিদ্যুত গতিতে উঠে আসছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বুঝল, এই বেপরোয়া টেররিস্টদের এই মুহুর্তে একমাত্র মৃত্যুই থামাতে পারে, অন্য কিছু নয়।

আহমদ মুসার তর্জনি চেপে বসেছে তার রিভলবারের ট্রিগারে। দু’টি গুলি বেরিয়ে গেল। দু’জন মুখোশধারী টেররিস্ট মাথায় গুলি বিদ্ধ হয়ে কোন শব্দ না করেই ছিটকে পড়ল মেঝের উপর।

বেপরোয়া তৃতীয় মুখোশধারী তার স্টেনগানের ব্যারেল আদালার মার মাথা থেকে সরিয়ে নিয়ে দ্রুত ঘুরিয়ে নিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। তার স্টেনগানের ব্যারেল দ্রুত উঠে আসছিল আহমদ মুসা লক্ষ্যে।

'স্টেনগানের নল আর ওপরে তুলো না মুখোশধারী, অন্যথা করলে তোমার পরিণতি তোমার সাথীর মতই হবে।'

আহমদ মুসা মুখোশধারীর দিকে রিভলবার তাক করে তাকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলল।

কথাগুলো কানেই গেল না যেন মুখোশধারীর। তার স্টেনগানের ব্যারেল উঠে আসছিল। তার প্রস্তুত তর্জনিও স্টেনগানের ব্যারেলে।

মুখোশধারীল স্টেনগানের নল টার্গেটে উঠে আসার আগেই আহমদ মুসার রিভলবারের ট্রিগারে তর্জনি চেপে বসল। আহমদ মুসা ধীরে-সুস্থে টার্গেট করেছিল তার বাহুসন্ধিকে।

ডান বাহুসন্ধিতে গুলি খাওয়ায় মুখোশধারীর হাত থেকে খসে পড়ল স্টেনগান।

কিন্তু বিস্ময়কর বেপরোয়া মুখোশধারী। বাহুসন্ধিতে গুলি খেয়ে স্টেনগান পড়ে যাওয়ার সংগে সংগেই তার বাম হাত ঢুকে গেল জ্যাকেটের পকেটে। বেরিয়ে এল পিংপং বলের মত গোলাকার বস্তু নিয়ে। বিদ্যুৎ গতিতে তার বাম হাতটি উঠে আসতে লাগল আহমদ মুসার লক্ষ্যে।

গোলাকার বস্তুটি দেখেই আহমদ মুসা বুঝল, ওটা ফায়ার বোম, ফায়ার গানও হতে পারে। ফায়ার বোম হলে আহমদ মুসা ও তার পাশের দু'একজন মারা যাবে। আর ফায়ার গান হলে শুধু আহমদ মুসাই মারা যাবে। ফায়ার গানের ফায়ার বুলেট রিভলবার ও স্টেনগানের বুলেটের মতই শরীরকে ভার্টিক্যালি বিদ্ধ করে।

আহমদ মুসার রিভলবার, ট্রিগার ও তার তর্জনি প্রস্তুত ছিল। তর্জনি চেপে বসল ট্রিগারে। বেরিয়ে গেল গুলি।

আহমদ মুসা এবার তার বাম বাহুসন্ধিমূল আহত করতে চেয়েছিল। কিন্তু মুখোশধারী বোমা ছোড়ার জন্যে তার হাত উপরে তোলায় এবং দেহ কয়েক ইঞ্চি নড়ে যাওয়ায় গুলি গিয়ে একদম বিদ্ধ হলো তার বাম বুকে।

বোমা ছোড়া আর তার হলো না। গুলি বিদ্ধ তার দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা ধপ করে বসে পড়ল সোফায়।

রিভলবার সোফায় রেখে তুলে নিল মোবাইল। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখল মোবাইল অন আছে।

মোবাইল কানের কাছে তুলে নিয়ে বলল, 'হ্যালো স্যার, আমি আহমদ মুসা।'

'আহমদ মুসা আপনি ঠিক আছেন তো? মোবাইলে ভেসে আসা কন্ঠ শুনেই বুঝতে পেরেছি আপনি আহমদ মুসা।' বলল ওপার থেকে জার্মানীর পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস উদ্বিগ্ন কন্ঠে।

'ধন্যবাদ স্যার, এই মুহূর্তে এখানে একটা বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার অন করা মোবাইলে আমি সব শুনেছি মি. আহমদ মুসা। কয়জন মারা গেছে? বলুন তো জায়গাটা কোথায়?' বলল ওপার থেকে পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

'তিনজন মারা গেছে। ওরা তিনজনই এসেছিল। আর জায়গাটার নাম 'সালজওয়াডেল'। আহমদ মুসা বলল।

'ঘটনাটা কোন পরিবারের বা বাড়ির নাম-নাম্বার কি?' জিজ্ঞাসা করল ওপার থেকে বরডেন ব্লিস।

মুখের কাছে মোবাইলটা একটু সরিয়ে নিয়ে আহমদ মুসা আদালা হেনরিকার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার পরিবারের কোন নাম-পরিচয় বা বাড়ির নাম্বার বলুন।'

'আমরা 'আলগার' পরিবার। বাড়ির নাম্বার 'সালজওয়াডেল, এম-৯১'। আতংকগ্রস্ত আদালা হেনরিকা শুকনো, কম্পিত কন্ঠে বলল।

'স্যার, 'আলগার' পরিবার, আর বাড়ির নাম্বার, সালজওয়াডেল এম-৯১।' বলল আহমদ মুসা মোবাইল মুখের কাছে তুলে নিয়ে।

'আচ্ছা, আচ্ছা। মনে পড়ছে। গত বছর শুরুর দিকে মুকুট নিয়ে তাদের কোন সমস্যা হয়েছিল, আমি দেখেছিলাম পুলিশ রিপোর্টে।' পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস ওপার থেকে বলল।

‘জি স্যার, ঠিক বলেছেন। আমি ওদের কাছে শুনলাম গত বছরও এই সমস্যা হয়েছিল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘প্রতিপক্ষ কি তারাই, যারা গত বছর এসেছিল?’ জিজ্ঞাসা বরডেন ব্লিসের।

‘ওরা এবারও মুখোশ পরে এসেছে। এরা চিনতে পারেনি। পুলিশ তাদের চেনে, এদের কথায় আমি জেনেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘শুনুন, মি. আহমদ মুসা। আমি সব বুঝতে পেরেছি। আমি সালজওয়াডেলের পুলিশকে এখনি বলে দিচ্ছি। এখনি ওরা আলগার পরিবারে যাবে। আর মধ্য সালজওয়াডেলের পুলিশ স্টেশনের সবাইকে সাসপেন্ড করে আমি এখনি ওখানে নতুন অফিসার পাঠাচ্ছি।’ বলল বরডেন ব্লিস, জার্মানীর পুলিশ প্রধান।

‘ধন্যবাদ স্যার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আচ্ছা, মি. আহমদ মুসা। আপনি কিভাবে এত দূরে এই ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়লেন?’ জিজ্ঞাসা পুলিশ প্রধান বরডেনের।

‘আমরা ব্রুমসারবার্গ থেকে আসছিলাম হামবুর্গের দিকে আমার সেই কাজে। খারাপ আবহাওয়ায় গাড়ির জন্যে অপেক্ষমাণ আলগার পরিবারের মেয়ে আদালা হেনরিকাকে লিফট দিতে গিয়ে এখানে এসেছি এবং ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েছি। আমরা মাত্র দশ পনের মিনিট আগে এখানে পৌঁছেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঈশ্বরই আপনাকে এখানে এনেছেন। থ্যাংক গড। একটা পরিবারকে তিনি বাঁচিয়েছেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আরও আপনার এই কলের জন্যে আরেকটা ধন্যবাদ। ওকে, মি. আহমদ মুসা। বাই।’ বলল ওপার থেকে পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

‘ধন্যবাদ স্যার আপনাকে।’

বলে আহমদ মুসা মোবাইলটা সোফায় নামিয়ে রেখে রিভলবারটা সোফা থেকে তুলে নিয়ে পকেটে পুরল।

মুহুর্তের জন্যে মাথা নিচু করে আত্নস্থ হয়ে আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করে মাথা তুলল। তাকাল সবার দিকে। সবাই পাথরের মত আতংকগ্রস্ত হয়ে বসে আছে। সবার চোখে আহমদ মুসার দিকে নিবদ্ধ। আহমদ মুসার চোখ একবার লাশ তিনটির উপর দিয়ে ঘুরে এল।

অবশেষে তাকাল আহমদ মুসা আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগারের দিকে। বলল, ‘স্যার। অল্পক্ষণের মধ্যেই পুলিশ আসছে। আর সন্ত্রাসীদের যোগ-সাজশকারী এখানকার পুলিশ অফিসার সবাই সাসপেন্ড হয়েছে। নতুন এক সেট পুলিশ অফিসার আসছেন এখানে।’

‘এখানে যা ঘটল, তা আমার কাছে স্বপ্ন। যা আপনি বলছেন তাও আমার কাছে স্বপ্ন। কি হবে, কি ঘটবে আরও, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। শুধু বুঝতে পারছি, আপনি যে জন্যে সময় কিল করতে বলেছিলেন, তা ঘটেছে।’ বলে কান্না রোধ করতে দু’হাতে মুখ ঢাকল বৃদ্ধ জোসেফ জ্যাকব আলগার।

আদালা হেনরিকা এবং আদালার মা অ্যাল্লি আলিসিয়া দু’জনেরই মুখ নিচু হলো। উদ্বেগ-আতংকে তাদের চোখ-মুখ পাংশু।

‘আর কিছুই ঘটবে না স্যার। আমি বলতে পারি, আলগার পরিবারের উপর থেকে আল্লাহ বিপদটা দূর করে দেবেন।’ বলল আহমদ মুসা সান্ত্বনার সুরে।

মুখ তুলেছে আদালা হেনরিকা। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘স্যার, আপনি কার সাথে কথা বললেন?’

‘জার্মানীর পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিসের সাথে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিসের সাথে?’ মুখ তুলে চোখ মুছে বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘জি হ্যাঁ। উনি আমাকে জানেন এবং আমিও তাঁকে জানি।’ বলল আহমদ মুসা।

শুধু জোসেফ জ্যাকব আলগার নয়, আদালা ও আদালার মায়ের মুখেও নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি হলো। প্রশ্নও তাদের চোখে-মুখে। জার্মানীর পুলিশ প্রধানের সাথে এভাবে বন্ধুর মত স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন, ‘কে ইনি?’

প্রশ্নটা করেই বসল জোসেফ জ্যাকব আলগার। বলল, 'স্যরি, আপনার পরিচয় জানা হয়নি। ফিল্মে যা ঘটে তার চেয়ে বড় কিছু আপনি করেছেন। জার্মানীর পুলিশ প্রধান আপনার সাথে বন্ধুর মতই বলা যায় কথা বললেন।'

আহমদ মুসা কিছু বলার আগে ব্রুনাই মুখ খুলল। বলল, 'তাঁর নাম ইতিমধ্যেই আপনারা জেনেছেন, আহমদ মুসা। বলতে পারেন উনি আধুনিক যুগের একজন হাতেম তাই। রবিনহুডের কর্মক্ষেত্র ছিল একটা অঞ্চল, কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র গোটা বিশ্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়াসহ বহু দেশের উনি সম্মানিত নাগরিক। স্ত্রী ও এক ছেলে নিয়ে তিনি থাকেন মুসলিম দুনিয়ার কেন্দ্র সৌদি আরবের মদিনায়। আমাদের একটা বড় কাজে সহযোগিতার জন্যে এসেছেন জার্মানীতে। আমাদের পুলিশ প্রধানসহ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের অনেককেই ওঁর সম্পর্কে ব্রীফ করেছেন তাহিতি দ্বীপপুঞ্জের ফরাসি গভর্নর। আরেকটা বড় পরিচয় উনি ফ্রান্সের বুরবুক রাজকুমারীর স্বামী। আর ধর্মবিশ্বাসে তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান।'

ব্রুনা থামতেই তাকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা বলল, 'আমি তোমাকে কথার মাঝখানে বাধা দেইনি বলে মনে করো না ব্রুনা, তোমার কথাগুলো আমি পছন্দ করেছি। কোন লোকের সামনে তার এভাবে প্রশংসা করা শুধু অসৌজন্যমূলক নয়, ক্ষতিকরও।' গম্ভীর কন্ঠ আহমদ মুসার। তার চোখে-মুখে অসন্তুষ্টির চিহ্ন।

'সংগে সংগেই ব্রুনা দু'হাত জোড় করে বলল, 'মাফ করুন ভাইয়া। এখানকার ঘটনায় আমিও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম বলে কথাগুলো আমি বলে ফেলেছি।'

উঠে দাঁড়িয়েছে আদালা এবং আদালার মা। তারা এবং আদালার বাবা আহমদ মুসার উদ্দেশ্যে লম্বা বাও করে বলল, 'ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ যে আমরা ঠিক সময়ে আপনাকে পেয়েছি। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেছেন আপনাকে দিয়ে।' আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগারের শেষ কথাগুলো অশ্রুরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

একটু থেমেই আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল আদালার বাবা। ঠিক এ সময়েই সিঁড়িতে অনেকগুলো বুটের শব্দ পাওয়া গেল।

আদালার বাবা থেমে গেছে। সবাই উৎকর্ণ।

'পুলিশ আসছে।' আহমদ মুসা বলল।

পরক্ষণেই একদল পুলিশ ঘরে প্রবেশ করল। তাদের সামনে রয়েছে মধ্য সালজওয়াডেল পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত অফিসার।

ভারপ্রাপ্ত অফিসার ঘরে ঢুকেই এগিয়ে গেল আহমদ মুসার কাছে। স্যালুট করে বলল, 'আপনি নিশ্চয় আহমদ মুসা, স্যার?'

স্যালুটের জবাব দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'হ্যাঁ, আমি আহমদ মুসা।'

'স্যার, পুলিশের বড় সাহেব আপনাকে সালাম বলেছেন।'

বলেই পুলিশ অফিসার এগিয়ে গেল আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগারের দিকে। তাকে বলল, 'স্যরি স্যার, আর কোন অসুবিধা হবে না। আমরা সব দেখছি।'

'ধন্যবাদ।' বললো জোসেফ জ্যাকব আলগার। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারটি ঘুরে দাঁড়িয়ে পুলিশদের নির্দেশ দিল, 'যেমন আছে তেমনি লাশগুলোর ছবি তাদের অস্ত্রসমেত নিয়ে যাও। লাশ ও অস্ত্রগুলো যথানিয়মে হেফাজতে নাও। নিয়ে গাড়িতে তোল।'

লাশ ও অস্ত্র উঠানো হয়ে গেলে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার আদালার বাবাকে বলল, 'স্যার, আমরা রক্তমাখা কার্পেট আলামত হিসেবে নিয়ে যেতে চাই।'

আহমদ মুসাসহ সবাই উঠে দাঁড়াল।

পুলিশরা সোফা সরিয়ে কার্পেট তুলে নিয়ে গেল।

ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার দু'জন পুলিশকে নির্দেশ দিল, 'কিছু রক্ত মেঝে পর্যন্তও এসেছ্ তোমরা জায়গাটা পরিষ্কার করে দাও।'

কাজ শেষ করে সব পুলিশ চলে গেলে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার একবার আহমদ মুসার দিকে আর একবার আদালার বাবার দিকে চেয়ে বলল, 'স্যার,

দু’জন পুলিশ সিঁড়ির গোড়ায়, দু’জন পুলিশ গেটে সার্বক্ষণিক পাহারায় থাকবে। কোন প্রয়োজন হলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন স্যার।’

‘ধন্যবাদ অফিসার।’ বলল আহমদ মুসা।

আদালার বাবাও ধন্যবাদ দিল ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে।

আহমদ মুসাদের নিয়ে আদালার মা পাশের রুমে চলে গেল। বাবার হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে আদালা হেনরিকা তাদের পেছন পেছন চলল।

সবাইকে বসিয়ে নিজে বসতে বসতে বলল, ‘একই মানুষের কি বিপরীত দুই রূপ! এই ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার রাতেও এসেছিলেন। সকালেও এসেছিলেন। তখন তার আচরণ দেখে মনে হয়েছিল, আমরা মহাদোষী আর উনি বিচারক। আর এখন মনে হলো, আমরা তাদের মনিব আর তারা আমাদের সার্ভ করার জন্যে তৈরি।’

‘তখন চাপ বা লোভে পড়েই তারা ঐ আচরণ করেছিলেন, এখন চাপ এসেছে আরও বড়। ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা জানা নেই।’ বলল আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার।

বাবার কথা শেষ হতেই আদালা হেনরিকা আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘স্যার, আমার একটা বিস্ময়, আপনি একটা রিভলবার নিয়ে তিনজন স্টেনগানধারীকে মোকাবিলার সাহস করলেন কিভাবে? যদি ব্যর্থ হতেন, তাহলে কি হতো ভাবেননি?’

গম্ভীর হলো আহমদ মুসার মুখ। বলল, ‘যে সময়ের যা দাবি তখন তা করা উচিত। ভবিষ্যৎ আল্লাহর হাতে।’

‘ঈশ্বরের উপর আপনার এত বিশ্বাস, এত ভরসা?’ বলল আদালা হেনরিকা।

‘আমার স্রষ্টা যিনি, আমার প্রতিপালক যিনি, আমার ভালো-মন্দ প্রকৃতপক্ষে যাঁর হাতে, তাঁর উপর ভরসা ছাড়া আর কার উপর ভরসা করব!’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধর্মে তো আপনার দারুণ বিশ্বাস!’ বলল আদালা হেনরিকা।

'আমার দাদু বলতেন, আমাদের পরিবার শুরু থেকে খুব ধর্মভীরু ছিল। কিন্তু মি. আহমদ মুসা, আমার একটা কৌতুহল, 'ভবিষ্যৎ ঈশ্বরের হাতে' এটা কিভাবে? আমি ঈশ্বরের উপর ভরসা করে আক্রমণকারী তিনজনের উপর চড়াও হলাম, এখানে ঈশ্বর কিভাবে সাহায্য করবেন?' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'আল্লাহ যেমন মানুষের স্রষ্টা, তেমনি মানুষের শক্তি সাহসের নিয়ন্ত্রকও তিনি। আর সব শক্তি, সামর্থ্য, কৌশলের উৎসও তিনি। এই সাথে আল্লাহর বান্দারা প্রার্থনা করলে বাড়তি দানও করেন তিনি। তাই মানুষ যখন আল্লাহর উপর ভরসা করে, নির্ভর করে কোন বিষয়ে, তখন আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। তার শক্তি, সামর্থ্য, কৌশল বাড়িয়ে দেন। আর একটা কথা স্যার, মানুষ যখন নিজের শক্তির উপর ভরসা করে লড়াই করে, তখন তার মনে কি হবে, না হবে, এই উদ্বেগ, এই পিছু টান থাকে। যা তাকে দুর্বল করে। যার ফলে সে একজন তিনজনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পায় না। পেলেও এই দুর্বলতার কারণে সে সফল নাও হতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগারের চোখে-মুখে বিস্ময়-বিমুগ্ধের চমক। আদালা ও তার মা আলিসিয়াও অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

'কঠিন দার্শনিক কথা বলেছেন মি. আহমদ মুসা। ঈশ্বরের প্রতি এমন বিশ্বাস থাকলে আপনি যা বলেছেন ঘটতে পার। আমরা বোধ হয় একটু আগে এটাই দেখলাম। ধন্যবাদ আহমদ মুসা আপনাকে।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'ওয়েলকাম স্যার। স্যার, আমরা এখন উঠতে চাই। এখানের কাজ শেষ। এবার আমরা চলে যেতে চাচ্ছি।' আহমদ মুসা বলল।

হুইল চেয়ারে একটু সোজা হয়ে বসল আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার। দুই হাত জোড় করে বলল, 'আমিও মনে করেছিলাম আপনার কাজ শেষ। পুলিশ আমাদের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করেছে এবং আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু এখন ভাবছি, আপনি একজন এশিয়ান মুসলিম। এশিয়ান মুসলিমরা খুব মেহমানদারী পছন্দ করেন। আমি আপনার কাছে এই

মেহমানদারীর সুযোগ প্রার্থনা করছি। লাঞ্চের সময়ের বেশি দেরি নেই। আমার অনুরোধ আমার কথা আপনারা রক্ষা করবেন।'

আহমদ মুসা ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে একবার তাকিয়ে জোসেফ জ্যাকব আলগারকে বলল, 'আপনি পিতৃতুল্য।

আপনার অনুরোধ আমাদের কাছে আদেশ। আমরা লাঞ্চ করেই যাব। কিন্তু একটা বিষয় আমার মনে কৌতুহল সৃষ্টি করেছে, যে বিষয়ে আমি জানতে চাই।'

'কি সেটা মি. আহমদ মুসা?' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'সন্ত্রাসীরা আপনাদের পরিবারকে হাফ জার্মান, হাফ খৃস্টান বলেছে। কেন ওরা তা বলল?' আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগে কথা বলল না জোসেফ জ্যাকব আলগার। প্রশ্নটা শুনেই তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। আদালা ও তার মা আলিসিয়ার মুখেও কিছুটা বিব্রত ভাব। তাদের আলগার পরিবারের একটা গোপন ও দুর্বল দিক এটা।

জোসেফ জ্যাকব আলগার একটুক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'বিষয়টা আমাদের একটা ফ্যামেলি-সিক্রেট। এটা একটা বড় দুর্বলতা আমাদের পরিবারের। আমাদের দুর্বলতার এ বিষয়টি আমরা সব সময় গোপন করে আসছি। এরপরও বিশেষ মহল এটা খুঁজে বের করেছে। একবার হামবুর্গের আন্তর্জাতিক অ্যান্টিকস প্রদর্শনিতে মুকুটটি নিয়ে গিয়েছিল আমাদের পরিবার। রাজা চতুর্থ অটো'র দেয়া অতিমূল্যবান এ অ্যান্টিকস মুকুটটি তাদের নজরে পড়ে যায়। আমাদের বিপদ তখন থেকেই শুরু। ওরাই সন্ধান করে আমাদের পরিবারের হাফ জার্মান হাফ খৃস্টান ও দাস-ব্যাকগ্রাউন্ড বের করেছে এবং একে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করছে।' থামল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'আসল সত্যটা কি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জোসেফ জ্যাকব আলগার বলল, 'আপনি অন্যদের মত নন। আপনার মত মুসলমানও আমার চোখে পড়েনি। আপনি পূর্বাপর সব জানা একজন ভালো ও নিষ্ঠাবান মুসলিম। আপনার মত বিজ্ঞ

মুসলিমকে সব বলা যায় মি. আহমদ মুসা। তবে এখানে নয়। চলুন আমরা স্টাডিতে যাই।'

'সেটাই ভালো হবে।' বলল আদালা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে।

সবাই উঠল।

আদালা তার বাবার হুইল চেয়ার ঠেলে আগে আগে চলল। আর পেছনে তার মা আলিসিয়া আহমদ মুসাদের নিয়ে এগোতে লাগল।

কথা বলছে জোসেফ জ্যাকব আলগার।

তার হুইল চেয়ার ঘিরে কয়েকটা চেয়ার নিয়ে বসেছে আহমদ মুসা, আদালা, ব্রুনা, আদালার মা এবং আলদুনি সেনফ্রিড।

স্টাডি রুমটা তিন তলায়।

বিশাল রুম।

ঘরের চারদিকে দেয়াল বরাবর অনেক আলমারি। বইয়ে ঠাসা।

কয়েকটা কম্পিউটার আছে কক্ষে। অনেক কিয়টি পড়ার টেবিল। তার সাথে আরামদায়ক কুশন চেয়ার। ঘরে কয়েকটি ইজি চেয়ারও রয়েছে।

চেয়ার, আলমারি, টেবিল, ইজি চেয়ার সবই পুরানো। অ্যান্টিকস হিসেবে শো-রুমে থাকার মত।

ঘরের সবকিছুই পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

ঘরে ঢুকেই আহমদ মুসা বলেছিল, মনে হচ্ছে আমরা এক অ্যান্টিকস এর জগতে এলাম। কি করে আপনারা এগুলোকে এত সুন্দরভাবে রক্ষা করেছেন?'

জোসেফ জ্যাকব আলগার বলেছিল, 'আমরা মূল্যবান ফার্নিচার রক্ষা করিনি, আমরা ঐতিহ্য রক্ষা করেছি। আর মি. আহমদ মুসা আমাদের বাড়ির সবকিছুই অ্যান্টিকস, শুধু আমরা ছাড়া। থালা-বাটি থেকে সবকিছুই দেখবেন সেই পুরানো ধাঁচের।'

'পুরানো ধাঁচের বটে, কিন্তু পুরানো নয়। আজকের আধুনিকতার সময়হীন নিরাভরণ ও প্রতিযোগিতার বাজারে কষ্ট-ইফেকটিভ পণ্যের সয়লাবে অ্যান্টিকস আজ মর্যাদার আসন লাভ করেছে।' আহমদ মুসা বলেছিল।

জোসেফ জ্যাকব আলগার আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিল, 'সব বিষয়কে সুন্দর করে বলার শক্তি ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছেন।'

কথা বলছিল জোসেফ জ্যাকব আলগার। তার ইজি চেয়ারের চারপাশে বসা আহমদ মুসা, ব্রুনা, আলদুনি সেনফ্রিড, আদালা ও আদালার মা আলিসিয়াদের অখণ্ড মনোযোগ তার দিকে।

বলছিল জোসেফ জ্যাকব আলগার, 'যা বললাম তা সত্যি। আমরা হাফ-জার্মান, হাফ-খৃস্টান ও দাসবংশোদ্ভুত- তাদের এই অভিযোগ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত কিছুই জানি না। আমার দাদুকে আমি বেশি দিন পাইনি। বাবাকে তো পেয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই বলেননি। তবে বাবার কয়েকটা কথা আমি একদিন হঠাৎ শুনে ফেলেছিলাম। বাবা এই স্টাডিতে বসে আন্টির সাথে গল্প করছিলেন। আন্টি ছিলেন বাবার বড়। দরজা ও জানালা সব বন্ধ ছিল। আমি পাশের করিডোরটা ধরে জানালার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আন্টির একটা কথা আমার কানে গেল, 'হ্যাঁ জোসেফ, কথাগুলো সত্য যে, আমরা পুরো জার্মান নই, পুরোপুরি খৃস্টানও আমাদের কখনও মনে করা হয়নি। আমাদের দাসবংশোদ্ভুত একথাও একটা কঠিন সত্য। আন্টির কথা শুনেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। শুনতে লাগলাম তাদের কথা। 'কিন্তু এই অভিযোগ কেন সত্য হবে? সত্য হলে পরিবারের সবাই এটা জানবে না কেন?' বাবা প্রশ্ন করলেন আন্টিকে।

আমারও প্রশ্ন দাদুর কাছে এটাই ছিল। দাদু আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, জার্মানীতে প্রচুর অজার্মান ও নন-ইউরোপিয়ান এসেছেন সেই প্রাচীন কাল থেকে, মধ্যযুগের আরও বেশি আগে থেকে। তাদের বেশির ভাগ খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। কেউ ইচ্ছায়, কেউ বাধ্য হয়ে। এরা আবার মুখে খৃস্টান হলেও মনেপ্রাণে খৃস্টান হয়নি। খৃস্টধর্মের মূল স্রোতে কখনও এদের গ্রহণ করা হয়নি। এদেরই বলা হয় হাফ খৃস্টান, হাফ জার্মান। আর এ কথাও সত্যি, মধ্যযুগের দাস ব্যবসায়ের যুগে যুদ্ধে পরাজিতদের কিংবা কোনওভাবে ধৃত বিদেশি, বিশেষ করে নন-ইউরোপিয়ানদের দাস হিসেবে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মত জার্মানীতেও প্রচুর মানুষ বিক্রি করা হয়েছে। তারাও হাফ খৃস্টানদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। মনে করা হয় আমাদের পরিবার এ ধরনেরই এক দাসবংশোদ্ভুত পরিবার। আমি দাদুর শেষ বাক্যটা শুনে বলেছিলাম, 'মনে করা হয় কেন? সত্যটা কি?' দাদু বলেছিলেন, 'কারণ, কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই, আমাদের পরিবারেও এ ধরনের কোন দলিল

নেই। তবে বোন, আমার দাদু জার্মানীর প্রথম আদমশুমারির বরাত দিয়ে আব্বাকে বলেছিলেন তাতে নাকি প্রত্যেক পরিবারের অরিজিন কি তার উপর একটা কলাম ছিল। সে কলামে নন-ইউরোপিয়ানদের জন্যে NE এবং দাস বংশোদ্ভুতদের s বর্ণ-সংকেত দেয়া ছিল। পরবর্তী আদমশুমারিতে এ ধরনের কলাম আর ছিল না। কিন্তু প্রথম আদমশুমারির তথ্যই বিভিন্ন ডকুমেন্ট ও লেখায় বিভিন্নভাবে উদ্ধৃত হয়ে আসছে।' আন্টির কথা এ পর্যন্ত শুনেই আমি চলে এসেছিলাম। বিভিন্ন সময়ের এসব কথা থেকেই আমাদের পরিবারে সাধারণ সবারই জানা হয়ে গেছে যে আমাদের পরিবার দাস বংশোদ্ভুত এবং আমাদেরকে পুরো জার্মান ও খৃস্টান মনে করা হয় না।' থামল আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার।

থেমেই আবার সংগে সংগে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে ভুলে গেছি। সেটা আমাদের একটা ফ্যামিলি সিক্রেট। এই সিক্রেট পরিবারের সবাই জানে না। পরিবারের ঐতিহ্য অনুসারে পরিবারের হেড অব দ্য ফ্যামিলী যখন ঠিক মনে করবেন বা প্রয়োজন মনে করবেন, তখন তিনি তাঁর সরাসবি উত্তরসূরি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ, তার অবর্তমানে সরাসবি উত্তরসূরি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাকে সিক্রেট জিনিসটি হস্তান্তর করে যান।' থামল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

অপার বিস্ময় নামল আদালা হেনরিকা ও তার মা অ্যাল্লি আলিসিয়ার চোখে-মুখে। বলল আদালা তার পিতাকে লক্ষ্য করে, 'এত গোপনীয় যে জিনিসটা, সেটা কি বাবা?'

'এটা সত্যিই খুব গোপনীয়। কিন্তু কেন সেটা গোপনীয় আমি জানি না। বাবা-দাদাসহ আমাদের কোন পূর্বপুরুষই এটা প্রকাশ করেননি। আমিও পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য অনুসরণ করব, কোনভাবেই এটা প্রকাশ করব না। আজকের এই ঘটনার আগ পর্যন্ত আমার এটাই সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু মি. আহমদ মুসাকে দেখার পর এই সিদ্ধান্ত আমার পাল্টে গেছে। আমার মনে হয়েছে মি. আহমদ মুসার মত এমন সচেতন, জ্ঞানী, নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী এবং সব দিক দিয়ে যোগ্য ও সহমর্মী এবং সেই সাথে দুনিয়ার সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম ইসলামের অনুসারী কোন মানুষের

সাক্ষাৎ আমাদের পরিবার ইতিপূর্বে নিশ্চয় পায়নি। আমি যখন পেয়েছি, তখন সুযোগটা আমি গ্রহণ করবো।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'কিন্তু বাবা কি এমন বিষয় সেটা, যার জন্যে এমন লোকের সাক্ষাৎ জরুরি?' আদালা হেনরিকা বলল।

'গোপন জিনিসটার সাথে একটা ছোট্ট পরামর্শ যুক্ত আছে। সেটা হলো, একত্ববাদী সর্বকনিষ্ঠ ধর্মের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক বিষয়টির গোপনীয়তার রহস্য ভেদ করতে পারবেন। মি. আহমদ মুসাকে আমার এই ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'ধন্যবাদ। আমি জানি না আমি সেই ব্যক্তি কি না। বিষয়টি কোন কিছুর পাঠোদ্ধার বা 'রিলিজিয়াস কোড' ধরনের মত কোন কিছুর ডিকোড করার বিষয় হতে পারে। তাই কি জনাব?' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। আপনি ঠিক ধরেছেন। বিষয়টি ডিকোড ধরনের।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'ডিকোডের প্রয়োজন! তাহলে জিনিসটা কি বাবা?' আদালা হেনরিকা বলল।

মাথা একটু নিচু করল জোসেফ জ্যাকব আলগার। মুহূর্তেই আবার মাথা তুলল সে। বলল, 'সেটা একটা মেহগনি কাঠের বাক্স। বাক্সে সোনার কারুকাজ। লকটি পোড়ানো খাদহীন লোহার। লক-এর তিনটি ঘোরানোর উপযোগী তিনটি ক্ষুদ্র চাকার প্রত্যেকটিতে রয়েছে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো। সংখ্যার ধাঁধায় যুগ-যুগান্তর ধরে আটকে রয়েছে বাক্সটি।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'বাক্সটি কার?' জিজ্ঞেস করল আদালা হেনরিকা।

'এটা নির্দিষ্ট করে কেউ জানে না। বলা হয় এটা আমাদের আদি পুরুষের একটি পবিত্র আমানত। সেই পুরুষ জার্মানীতে আমাদের প্রথম পুরুষ, না দ্বিতীয় বা তৃতীয় তা আমরা কেউ জানি না।'

বলে একটু থামল জোসেফ জ্যাকব আলগার। বলল আবার, 'মি. আহমদ মুসা, আমি কি বাক্সটি আনতে পারি? বাক্সের কোড-রহস্য ভেদ করতে পারি কি আপনার সাহায্য চাইতে?'

‘ধন্যবাদ মি. জোসেফ জ্যাকব আলগার। আপনাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারলে আমি খুব খুশি হবো।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা।।

বলেই জোসেফ জ্যাকব আলগার ঘুরে তাকালো আদালা হেনরিকার দিকে। একটা আলমারি দেখিয়ে বলল, ‘মা, ঐ আলমারির নীচের তাকের বইগুলো নামিয়ে ফেল। কাঠের তাকটার দু’প্রান্তে দেখো দু’টো কাঠের স্ক্রু আছে। স্ক্রু দু’টো তুলে ফেল। তাকটা সরিয়ে দেখ আয়তাকার ছোট সুন্দর একটা বাক্স পাবে। ওটা বের করে আন।

‘পরিবারের পবিত্র আমানত বাক্সটা কি ঐখানে আছে বাবা?’ জিজ্ঞাসা আদালা হেনরিকার।

‘হ্যাঁ, মা। এখানে কতদিন ধরে আছে আমি জানি না। বাবা আমাকে এখানে দেখিয়ে গেছেন। আমার মনে হয় এই আলমারির বয়স ততদিন, যতদিন ধরে বাক্সটা এখানে আছে।’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সাধারণ অথচ অসাধারণ নিরাপদ জায়গা এটা। যিনিই এটা করুন, তার অসাধারণ কল্পনাশক্তি ছিল।’

‘ধন্যবাদ স্যার, আমি উঠছি।’ বলে আদালা হেনরিকা উঠে দাঁড়াল।

যেভাবে তার বাবা বলেছিল, সেভাবেই ছোট সুন্দর বাক্সটি বের করে আনল আদালা। এনে তার বাবার হাতে তুলে দিল বাক্সটি।

আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার আস্তে আস্তে বাক্সটি হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে সম্মান দেখাল বাক্সটিকে। তারপর লকটিকে একবার দেখে নিয়ে বাক্সের উপর উৎকীর্ণ দু’টি লাইনের উপর নজর বুলাল। পড়ল আবার, ‘পৃথিবীর একত্ববাদী সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম এবং নিষ্ঠার সাথে সেই ধর্ম পালনকারী, ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞ, বিদ্বান ও সৎ কোন ব্যক্তির জন্যে এই ধাঁধা। এই ধর্মের ধর্মগ্রন্থের প্রথম পঠিতব্য শ্লোকের বা বাক্যের ডিজিটাল নাম্বার হলো বাক্সের লক খোলার কোড।’

পড়ে নিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘একত্ববাদী সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম তো আপনার ধর্ম ইসলাম, তাই না?’

‘জি, হ্যাঁ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘মি. আহমদ মুসা, প্লিজ এই বাক্সটি হাতে নিন। আপনিও বাক্সের উপরের ইনস্ট্রাকশনটা পড়ে দেখুন।’

বলে জোসেফ জ্যাকব আলগার বাক্সটি আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে বাক্সটি হাতে নিল। আস্তে আস্তে বসল চেয়ারে। তার আগেই আহমদ মুসার দুই চোখ বাক্সের উপরে খোদাই করা উৎকীর্ণ লেখাগুলোর উপর আঠার মত আটকে গেছে।

বাক্সের উপরে মূল্যবান কাঠের উপর উৎকীর্ণ লেখা পড়ল আহমদ মুসা। একটা বিস্ময় জাগল আহমদ মুসার মনে, একত্ববাদী সর্বকনিষ্ঠ ধর্মের লোকের উপর লকের ধাঁধা ভাঙার দায়িত্ব ছাড়লেন কেন! তাহলে উনি কি মুসলিম ছিলেন!

‘কি পড়লেন মি. আহমদ মুসা?’ জিজ্ঞেস করল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘ধাঁধার বিষয়টাও নিশ্চয় দেখলেন?’ আবার বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘জি, হ্যাঁ। দেখেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মাফ করবেন, আমার খুব কৌতুহল হচ্ছে। আপনি বুঝতে পারছেন, ডিকোড করা কি সম্ভব? কোন শ্লোক বা কাব্যের কোন ডিজিটাল নাম্বার থাকে, তা কোন দিন শুনিনি!’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘আরবি ভাষার বর্ণের একটা করে ডিজিটাল নাম্বার আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আরবি ভাষা! সেটা আবার কোন ভাষা?’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবি। এই ভাষাতেই মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। আবার এটা আরব দেশগুলোর ভাষাও।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনি সব জানেন দেখছি। আপনার ধর্মগ্রন্থ নিশ্চয় আপনার পড়া আছে? প্রথম শ্লোক তো অবশ্যই?’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘প্রতিদিনই পড়ি, পড়তে হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ও! তাহলে তো ধর্মগ্রন্থ আপনার কাছেই আছে?’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘আছে মানে এই ব্যাগেই আছে। না থাকলেও অসুবিধা হতো না। আমাদের ধর্মগ্রন্থের বিরাট অংশ আমার মুখস্থ আছে।’

‘বিরাট অংশ মুখস্থ আছে? এভাবে কোন বই মুখস্থ করা যায়? মুখস্থ কেউ করে?’ বলল বিস্মিত কন্ঠে আদালার মা আলিসিয়া।

‘আর কোন বই এত সহজে মুখস্থ করা বা মুখস্থ রাখা যায় কি না আমি জানি না। তবে আল্লাহর বাণী এই গ্রন্থ সহজেই মুখস্থ করা যায়, মুখস্থ করা হয়, মুখস্থ রাখাও হয়। এই গোটা ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ আছে এমন লক্ষ লক্ষ লোক দুনিয়ায় আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ও গড! বাইবেল কারও মুখস্থ আছে এমন কথা তো কখনও শুনিনি।’ বলল আদালার মা আলিসিয়া।

তার ও আদালার দু’জনেরই চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘আমিও শুনিনি আলিসিয়া। যাক এদিকের কথা। মি. আহমদ মুসা আপনার ধর্মগ্রন্থ একটু দেখাবেন? আমি দেখিনি কখনও মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ।’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘অবশ্যই দেখবেন।’

বলে আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে সুদৃশ্য চামড়ার কভারে মোড়া ছোট্ট কুরআন শরিফ বের করল। কভার খুলে কুরআন খুলে দেখাল সবাইকে।

‘এত ক্ষুদ্র অক্ষর। তবু ভলিউম এত বড় হয়েছে। এই গোটা ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ করা ও মুখস্থ রাখা তো মিরাকল।’ বলল আদালা হেনরিকা।

‘সত্যিই বলেছেন ম্যাডাম আদালা হেনরিকা। বিষয়টা সত্যিই একটা মিরাকল।’ ব্রুনা ব্রুনহিল্ড বলল।

‘ধর্মগ্রন্থটা আমি একটু হাতে নিতে পারি জনাব আহমদ মুসা?’ বলল আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘অবশ্যই স্যার।’ বলে আহমদ মুসা কুরআন শরিফটা জোসেফ জ্যাকব আলগারের হাতে দিল।

জোসেফ জ্যাকব আলগার কুরআন শরিফটা যত্নের সাথে হাতে নিয়ে চুমু খেয়ে আহমদ মুসাকে ফেরত দিতে দিতে বলল, 'আমার পূর্বপুরুষরা কেন বাক্সের কোডকে এই ধর্মগ্রন্থের সাথে যুক্ত করলেন জানি না। তবে এটা ঠিক এ ধর্মগ্রন্থকে তারা জানতেন, হয়তো এর সাথে কোন সম্পর্কও তাদের ছিল। সে কারণে এ ধর্মগ্রন্থের প্রতি আমাদেরও ভালোবাসা থাকা উচিত।'

কুরআন শরিফটা ব্যাগে রেখে বাক্সটা আবার হাতে নিয়ে বলল আহমদ মুসা, 'লকটি কি আমরা এখন খুলব মি. আলগার?'

'হ্যাঁ, মি. আহমদ মুসা। আমরা খুব খুশি হবো। বাক্সের ভেতরে কি আছে, এটা জানার আগ্রহ আমাদের যুগ-যুগান্তরের। ধাঁধার আড়াল সৃষ্টি করে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই বাক্সে অমূল্য কি রেখে গেছেন, তা আমরা সব সময় জানতে চেয়েছি। সোনা-দানার মত অথর্থ-সংশ্লিষ্ট কিছু এ বাক্সে যে নেই এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। কারণ যে স্বর্ণমুকুটটি আমাদের হাতে আছে, অর্থের বিচারে তার চেয়ে মূল্যবান আমাদের কাছে আর কিছু নেই। এই মহামূল্যবান বস্তুর জন্যে সাধারণ শোকেসে রাখা ছাড়া অন্য কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা কখনো করা হয়নি, অথচ বাক্সটা কঠিন ধাঁধার বাঁধনে বাঁধা। এর মাধ্যমে কোন জিনিসের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের পরিবারের রয়েছে অসীম আগ্রহ। প্লিজ, আমাদের সাহায্য করুন।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

আহমদ মুসা ভাবছিল। ধাঁধায় উল্লিখিত ধর্মগ্রন্থের পঠিতব্য প্রথম শ্লোক কোনটা? বিসমিল্লাহ, না সূরা ফাতেহার প্রথম আয়াত? ধর্মগ্রন্থের প্রথম শ্লোক না বলে পঠিতব্য প্রথম শ্লোক বলা হয়েছে কেন? সূরা ফাতেহার প্রথম শ্লোক বা আয়াত তো পড়তেই হয় সুরাটি পড়া শুরু করলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও 'পঠিতব্য' শ্লোক বলা হয়েছে কেন? 'পঠিতব্য' অর্থ হলো আইনের দ্বারা পড়ার জন্যে নির্দেশিত। এই অর্থ বিবেচনা করলে 'বিসমিল্লাহ'ই পঠিতব্য প্রথম আয়াত বা শ্লোক হয়। বিসমিল্লাহ পাঠ নির্দেশিত একটা বিষয়। আহমদ মুসার মন আনন্দে ভরে উঠল। অন্য বিবেচনাতেও বিসমিল্লাহ সেই সঠিক আয়াত। বিসমিল্লাহ সব কাজ শুরুর আগে পঠিতব্য আয়াত। তাছাড়া বিসমিল্লাহর ডিজিটাল ব্যবহার বহুল পরিচিত।

আহমদ মুসা মাথা তুলল। সবার উপর দিয়ে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিল। সবাই তাকিয়েছিল ভাবনায় ডুবে থাকা আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'বোধ হয় সমাধান পেয়ে গেছি।'

বলে আহমদ মুসা লক-এর তিনটি ডিজিটাল চাকা একে একে ঘুরিয়ে '৭৮৬' কম্বিনেশনে দাঁড় করাল। তারপর বাক্সের উপরের ঢাকনার উপর একটা চাপ দিল বিসমিল্লাহ বলে। ঢাকনা নড়ে উঠল। খুলে গেছে লক।

আহমদ মুসা বাক্সটি জোসেফ জ্যাকব আলগারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'লক খুলে গেছে।'

জোসেফ জ্যাকর আলগার, আদালা এবং আদালার মা আলিসিয়ার চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'বাবা, খুলুন বাক্সটা। আমাদের আর তর সইছে না।' বলল আদালা হেনরিকা।

আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগারের চোখে-মুখে এবার উত্তেজনা, একটা বিমূঢ় ভাবও। বলল, 'খুলবো আদালা? আমার যে সাহস হচ্ছে না। আমাদের পূর্বপুরুষ এতে আমাদের জন্যে কি রেখেছেন, কি দেখব এটা যে আমার হার্ট বিট বাড়িয়ে দিচ্ছে।'

বলেই জোসেফ জ্যাকব আলগার তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'প্লিজ আপনিই বাক্সটা খুলুন, আমার সাহস হচ্ছে না।'

'না মি. জোসেফ জ্যাকব আলগার, বিষয়টার সাথে আপনাদের পরিবারের ঐতিহ্যিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। উত্তরাধিকারী হিসেবে এই বাক্স খোলার দায়িত্ব আপনাকেই পালন করতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

জোসেফ আলগার আহমদ মুসার কথার জবাবে কিছু বলল না। তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বাক্স সমেত বাড়ানো হাত টেনে নিল সে। রাখল কোলের উপর।

চোখ দু'টি বন্ধ করে আত্মস্থ হলো সে। একটু পর চোখ খুলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।'

কথা শেষ করেই জোসেফ জ্যাকব আলগার উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হে মহান ঈশ্বর, আমার পূর্বপুরুষ সবার উপর শান্তি বর্ষণ করুন এবং আমাকে তাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হবার শক্তি দান করুন।'

বলে মাথা নিচু করে বাক্সের দিকে মনোযোগ দিল জোসেফ জ্যাকব আলগার। দু'হাত দিয়ে আয়তাকার বাক্সের দুই প্রান্ত ধরে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বাক্সের উপরের ঢাকনার অংশে চাপ দিল। খুলে গেল বাক্স। ধীরে ধীরে ঢাকনা তুলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

উন্মুক্ত হলো বাক্স। সবার চোখ বাক্সের অভ্যন্তরে।

বাক্সের ভেতরে কালো কভার দেয়া বড়-সড় একটা খাতা দেখা যাচ্ছে। খাতাটি আস্তে আস্তে সম্মানের সাথে হাতে তুলে নিল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

সবার চোখ খাতাটার দিকে।

সুন্দর চামড়ার কভার। কত দিনের পুরানো? কভারের চামড়ার অবস্থা দেখে তা বোঝা যাচ্ছে না।

জোসেফ জ্যাকব আলগার আস্তে আস্তে কভার উল্টালো। প্রথম পাতাটায় কিছু লেখা নেই। এটা চামড়ার মূল্যবান একটা কাগজ। কাগজের রং কিছুটা বিকৃত এবং কাগজের প্রকৃতি কিছুটা শক্ত হয়ে গেলেও নিরাপদে পাতা উল্টিয়ে তা পাঠযোগ্য রাখার জন্য এটা যথেষ্ট উপযুক্ত। প্রথম পাতা থেকে দ্বিতীয় পাতায় গেল জোসেফ জ্যাকব আলগার। দ্বিতীয় পাতায় দ্বিতীয় শুধু একটা শব্দ লেখা। দুর্বোধ্য। পরবর্তী কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে দেখল একই ধরনের লেখা, একই ভাষা এবং দুর্বোধ্য। জোসেফ জ্যাকব আলগার আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মি. আহমদ মুসা, ভাষা দুর্বোধ্য। আমি ভাষাটাই চিনলাম না। দেখুন তো এটা কি আপনার ধর্মগ্রন্থের ভাষা?'

বলে জোসেফ জ্যাকব আলগার আস্তে আস্তে খাতাটা আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, 'আপনি একটু দেখুন মি. আহমদ মুসা।'

দু'হাত বাড়িয়ে খাতাটা হাতে নিল আহমদ মুসা। লেখার দিকে চোখ বুলিয়েই বলল, 'মি. জোসেফ জ্যাকব আলগার, এটা আরবি ভাষা। আমাদের ধর্মগ্রন্থের ভাষা।'

'মানে আগে যেটা বললেন এটা আরব দেশগুলোর ভাষা, আপনাদের ধর্মগ্রন্থের ভাষা?' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'জি, হ্যাঁ।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের এমন সেফ কাস্টডিতে সংরক্ষণ করা এবং উত্তরপুরুষের জন্যে পবিত্র আমানত হিসেবে রাখা খাতা বা ডকুমেন্ট আরবি ভাষায় কেন?' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার। তার চোখে-মুখে অপার বিস্ময়।

'হ্যাঁ, এটা আমাদেরও জিজ্ঞাসা।' বলল আদালার মা আলিসিয়া এবং আদালা হেনরিকা।

'আপনাদের এই প্রশ্নের উত্তর হাতে লেখা ঐ খাতা বা বই থেকেই শুধু পাওয়া যেতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

জোসেফ জ্যাকব আলগার তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার কথা শেষ হলে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল জোসেফ জ্যাকব আলগার। কিন্তু তার আগেই আদালা হেনরিকা বলে উঠল, 'বাবা দেখ তোমার বাক্সে ও দু'টো কি, মেডেলের মত?'

জোসেফ জ্যাকব সংগে সংগে তাকাল বাক্সের দিকে। বলল, 'তাই তো দু'টো মেডেল।'

সে হাতে নিল মেডেল দু'টো। বলল, 'ওজন ও রং দেখেই বুঝা যাচ্ছে সোনার মেডেল।'

জোসেফ জ্যাকব চোখ বুলাল মেডেল দু'টির উপর। উল্টে-পাল্টে দেখল। আবার তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়। বলল, 'মি. আহমদ মুসা, এতেও মনে হচ্ছে সেই আরবি ভাষা। প্লিজ একটু দেখুন এগুলো আসলে কি, কিসের মেডেল?'

আহমদ মুসা হাতে নিল মেডেল। উল্টে-পাল্টে দেখল। সোনার মেডেলে উৎকীর্ণ আরবি অক্ষরে কিছু লেখা। লেখাগুলো পড়লো আহমদ মুসা। বিস্ময়াবিষ্ট সকলের অখণ্ড মনোযোগ আহমদ মুসার দিকে।

মেডেল দু'টির একটি হলো, কর্ডোভা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মেডেল অব এক্সিলেন্স'। বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষায় চূড়ান্ত পর্বে প্রথম স্থান লাভের পুরস্কার। প্রাপকের নাম: আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর।

দ্বিতীয়টি কর্ডোভা হাসপাতালের 'মেডেল ফর ব্রিলিয়ান্ট সার্ভিস, ১২৩১'। বিষয়: বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সর্বোচ্চ আই-সার্জরি। সার্জন আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর।

দু'টি মেডেলে উৎকীর্ণ আরবি লেখার এই অর্থ দু'টোও শোনাল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই আদালা হেনরিকা বলে উঠল, কর্ডোভা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্ডোভা হাসপাতালের মেডেল। একজন আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুরকে মেডেলগুলো দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ মেডেল আমাদের বাড়িতে আমাদের পূর্বপুরুষের বাক্সে কেন?' আদালা হেনরিকাসহ তার মা-বাবা এবং ব্রুনা ও আলদুনি সেনফ্রিড সকলেরই চোখে-মুখে বিস্ময়।

'বিষয়টি অবশ্যই বিস্ময়ের। মেডেল দু'টি খাতাটির সাথে ছিল। আর মেডেল দু'টির মত খাতাটিও আরবিতে লেখা। সুতরাং আমার বিশ্বাস খাতাটি থেকেই সব প্রশ্নের জবাব মিলবে।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক মি. আহমদ মুসা। আমাদের পূর্বপুরুষের বাক্সে এই ধরনের মেডেলের অস্তিত্ব আমাকে হতবাক করেছে। প্লিজ আপনি খাতাটা পড়া শুরু করুন। পড়তে আপনার কষ্ট হবে। খাতাটার পৃষ্ঠা সংখ্যা চারশ'র কম হবে না। কিন্তু কি করা যাবে বলুন।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'মেডেল ও খাতার প্রতি আপনাদের যে আগ্রহ ও আকর্ষণ তার চেয়ে আমার আগ্রহ ও আকর্ষণ কম নয়। গোটা বিষয় আমাকে দারুণভাবে অবাক করেছে। পড়তে আমার কোনই কষ্ট হবে না। পৃষ্ঠা চারশ'র মত হলেও প্রতি

লাইনের পরে একটা করে লাইন বাদ রাখা হয়েছে। আর হস্তাক্ষর বড় হওয়ায় স্টান্ডার্ড সাইজে একশ পাতার বেশি এটা হবে না।

আর খুব জরুরি নয়, এমন বর্ণনা ও বিষয় আমি আপাতত বাদ দিয়ে পড়ব। হেডিং বা সাব-হেডিং দেখেই আমি বিষয়টা বুঝতে পারবো আশা করছি।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা, প্লিজ পড়া শুরু করুন।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

পড়তে শুরু করল আহমদ মুসা:

"পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আমার কথা আমি লিখব আগে কখনো ভাবিনি। ভেবেছিলাম অতীতকে মুছে ফেলে একজন জার্মান হিসেবে নতুন জীবন শুরু করবো। আমাদের হাজারো নিবেদিত মিশনারি মানুষ পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, সে সব দেশের মাটি ও মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। আমি তাদেরই একজন, যদিও একজন মিশনারির কোন দায়িত্বই আমি পালন করছি না। বরং নাম-পরিচয় পাল্টে আমি নিজের না থেকে অন্যের হয়ে গেছি। সিদ্ধান্তটা আমার ছিল সাময়িক। কিন্তু সে সাময়িক সিদ্ধান্তই পরে স্থায়ী হয়ে যায়। এর মাধ্যমে আমি আমার পিছুটান একেবারেই মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস ও পরিচয়কে আমার ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বাইরে আমি পুরোপুরি জার্মান হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার ভুল ভাঙতে শুরু করে। জীবনের একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছলাম যখন আমার কাছে পরিস্কার হয়ে গেল যে, আমি বিরাট ভুলের মধ্যে রয়েছি। জার্মান দেশে বাস করলেই, জার্মান ভাষায় কথা বললেই জার্মান হওয়া যায় না। সরকার ও সরকারের আইন যাই বলুক, এখানকার সমাজের মূল স্রোতের যে চরিত্র কিংবা এই মূল স্রোত যারা নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের নিয়ম-নীতি কখনো বদলায় না। এই নিয়ম-নীতি এখানে বহিরাগত আর দাস-বংশীয়দের কখনো জার্মান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। তাতে বহিরাগতরা কোন কালেই জার্মান হয় না। তাদের বহিরাগত আর দাস-বংশীয় হবার অপবাদ বহন করেই চলতে হবে। এই চিন্তা করার পর আমি আমার নিজের কথা লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম, যাতে

আমার উত্তর পুরুষরা অন্তত একথা জানতে পারে যে, তারা ঐতিহ্যবাহী একটা জাতির অংশ। যারা ইউরোপকে সভ্যতা শিখিয়েছিল এবং যারা লন্ডন নগরী গড়ে ওঠার ৭শ' বছর আগে গ্যাসবাতি ও পয়:প্রণালী সমৃদ্ধ নগর

সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। দুর্ভাগ্য আমাদের অনৈক্যের অভিশাপেই বিশেষ করে আমাদের এই সভ্যতার পতন ঘটে। অন্ধকার ইউরোপের হিরক খণ্ড কর্ডোভা, গ্রনাডা, মালাডার মত শিক্ষা-সভ্যতা ও শক্তির কেন্দ্রগুলো নিজেই অন্ধকারে ডুবে যায়।

আমার নাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর। জন্ম আমার ১১৯৯ সালে। আমার জন্ম যে সময়, সে সময়টা গৌরবদীপ্ত মুসলিম সাম্রাজ্য স্পেনের পতন শুরুর কাল। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত, খণ্ড-বিখণ্ড স্পেনের একটা সালতানাতের রাজধানী, শিক্ষা-সভ্যতার জন্যে বিখ্যাত নগরী কর্ডোভায় আমার জন্ম। আমার জন্মের বছরই আল-মোহাইদ বাজবংশের খলিফা আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর ইন্তেকাল করেন। ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে খলিফা আবু ইউসুফ ছিলেন ক্রমবর্ধমান ঔজ্জ্বল্যের এক প্রতীক। আমার আব্বা ছিলেন খলিফার দরবারের একজন কর্মকর্তা। খলিফার ইন্তেকালে শোকাহত আব্বা খলিফার নামানুসারে আমার নামকরণ করেন।

কর্ডোভার রাজকীয় স্কুলে আমার শিক্ষাজীবনের শুরু। আর আমার শিক্ষাজীবনের শেষ হয় কর্ডোভা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পঁচিশ বছর বয়সে। আমার শিক্ষাজীবনের গোটাটাই ছিল কৃতিত্বপূর্ণ। বরাবরের মত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাতেও আমি প্রথম স্থান অধিকার করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠীদের বিরাট অংশ ছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশের। গোটা ইউরোপে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাক, একটা মেডিকেল স্কুলও ছিল না। তখন ইউরোপে চিৎকিসাসহ সব ধরনের বিজ্ঞান চর্চা ছিল নিষিদ্ধ। কৃতিত্বের সাথে পাস করার পর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অধ্যাপকের চাকরি পাকাপোক্ত হয়ে গেল। কর্ডোভার মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই শেষ পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনটি যেমন ছিল আমার আনন্দের, তেমনি দিনটি ছিল বিষাদেরও। আমার রেজাল্ট নিয়ে বাসায় কি অপার আনন্দ হবে! আব্বা কি যে

খুশি হবেন শীর্ষ কৃতিত্বসহ আমাকে ডাক্তার হতে দেখে! কিন্তু বাড়ির সীমানায় পা দিয়েই কান্নার রোলে আনন্দের শেষ রেশটুকুও আমার মন থেকে হারিয়ে গেল। আব্বাকে আর সুসংবাদ দেয়া হলো না, তাঁর ইন্তেকালের দু:সংবাদ নিয়ে আমি বাড়িতে প্রবেশ করলাম।

আমার পরিবারের যে দু:সময় তার চেয়ে বড় দু:সময় তখন চলছিল সুন্দর নগরী, শিক্ষার নগরী, সভ্যতার নগরী কর্ডোভার। ভয়ানক দু:সময় তখন গোটা মুসলিম স্পেনের। ১২২৭ সাথে আব্বা মারা যান। তখন একমাত্র গ্রানাডা ছাড়া কর্ডোভাসহ দক্ষিণ ও মধ্যস্পেনের বড় বড় শহরের কোনটিই আর মুসলমানদের অধিকারে ছিল না। কর্ডোভা তখন ছিল ক্যাস্টাই ও লিওনের খৃস্টান রাজার দখলে। এই অবস্থা অনেকের মত খলিফার দরবারের একজন কর্মকর্তা বাবাকেও দারুণভাবে আঘাত করেছিল। এই আঘাত ছিল বাবার মৃত্যুর অন্যতম কারণ। আমি পাস করার আগে থেকেই কর্ডোভার বিখ্যাত সরকারি হাসপাতালে ইন্টারনি ডাক্তার হিসেবে কাজ করছিলাম। নতুন খৃস্টান শাসক কর্ডোভা নগরীর বিখ্যাত ও নগরীর বিখ্যাত মসজিদের অনেক ক্ষতি করলেও নগরীর বিখ্যাত হাসপাতালে গায়ে তাদের স্বার্থেই হাত দেবার চেষ্টা তারা করেনি। হাসপাতাল থেকে তারা সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে, সেই কারণে হাসপাতালের কোন কার্যক্রমে তারা হস্তক্ষেপ করেনি। আমরা স্বাধীনভাবেই হাসপাতালের কাজ করেছি।

পাস করার পর ডাক্তার হিসেবে হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেবার পর ১২২৮ সালে কর্ডোভার আঞ্চলিক এক মুসলিম সুলতান কর্ডোভাকে মুক্ত করেন। একটা আনন্দের প্রদীপ জ্বলে উঠল আমাদের মনে। কর্ডোভা-নগরী ও কর্ডোভা নগরীর কেন্দ্রবিন্দু কর্ডোভা মসজিদের ক্ষতস্থানগুলো সারিয়ে তোলার চেষ্টা চলল। আমাদের হাসপাতাল পূর্ণ প্রাণচাঞ্চল্য আবার ফিরে পেল।

কিন্তু ১০৩১ সালে শেষ উমাইয়া খলিফা তৃতীয় হিশাম চারদিকের ঘনায়মান অন্ধকারে ব্যর্থতার দায় নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাবার পর স্পেনে সীমাহীন বিরোধ-বিভক্তির যে যাত্রা শুরু হয়েছিল ইউসুফ ইবনে তাসফিনের আল-মুরাবাইদ বংশের শক্তিমান উত্থান তাকে রোধ করতে পারেনি, বরং ১১৩০

সালের দিকে আল-মোহাইদ বংশের উত্থান এই প্রচেষ্টার আরও ক্ষতিই করেছিল। পর্তুগাল, ইউরোপ ও উত্তর-স্পেন কেন্দ্রিক খৃস্টানদের সম্মিলিত উত্থানের মুখে ভেসে গিয়েছিল আল মোহাইদ, ইবনে হুদ ও নাসেরাইড ডাইনেস্টির মত শাসকরা।

কর্ডোভা আবার হাতছাড়া হলো। সেই কাস্টাইল বংশেরই রাজা তৃতীয় ফার্ডিন্যান্ড তার বিশাল বাহিনী নিয়ে কর্ডোভা দখল করে নিল। এই দখলের হৃদয়হীন ঝড় লণ্ডভণ্ড করে দিল কর্ডোভাকে। মুসলিম নামের ক্ষমতালিপ্সু, নির্লজ্জ শাসকদের বিভেদ-সংঘাতের কারণেই এই মহাবিপর্যয় ঘটেছিল। তবু তাদের বোধোদয় হয়নি। এদেরই একজন স্পেনে নাসেরাইড ডাইনেস্টির প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আল হামার। কর্ডোভার পতনের পর কর্ডোভা বিজয়ী খৃস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ডকে মোহাম্মদ আল-হামার প্রস্তাব দিলেন যে, তিনি ফার্ডিন্যান্ডকে মুসলিম রাজ্য সেভিল জয়ে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে ফার্ডিন্যান্ড মোহাম্মদ আল-হামারকে গ্রানাডার অনুগত স্বাধীন সুলতান হিসেবে মেনে নেবেন। এই চুক্তি অনুসারেই আল-হামার সেভিল জয়ে ফার্ডিন্যান্ডকে সাহায্য করেছিল। তারপর খৃস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ডের আনুগত্যের তকমা পরে আল-হামার গ্রানাডায় প্রবেশ করেছিল গ্রানাডার সুলতার হিসেবে। গ্রানাডায় প্রবেশের সময় বিবেকের দংশনে বিপর্যস্ত এই সুলতান স্লোগান তুলেছিল, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন বিজয়ী নেই'। 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন বিজয়ী নেই'-এই কথাকে তিনি তাঁর রাষ্ট্রেরও মূল স্লোগান বানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিখ্যাত আল-হামরা প্রাসাদের দেয়ালে আরবি ভাষার অপরূপ কারুকার্যময় লিপিতে শতবার শতভাবে এই কথা লিখে রাখেন। আমার ক্রীতদাস জীবনের শুরুতে আমি যখন উত্তর ফ্রান্সের এক দাস বাজারে, তখন আমি এই খবরটা শুনেছিলাম। এটা শোনার পর আমি অঝোর নয়নে কেঁদেছিলাম আল-হামরার মত মুসলিম শাসকদের চিন্তা ও কাজের বেদনাদায়ক বৈপরীত্য দেখে। কর্ডোভার ভাইদের প্রতি না তাকিয়ে, সেভিলের ভাইদের বুকে ছুরি মেরে তাদের উপর খৃস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ডকে বিজয়ী করে যিনি গ্রানাডাকে তার পুরস্কার হিসেবে নিয়েছেন, সেই সুলতার কি করে পারলেন এই স্লোগান তুলতে আর আল-হামরা প্রাসাদের গায়ে লিখতে যে, 'আল্লাহ ছাড়া

আর কোন বিজয়ী নেই!’ দু’হাত তুলে সেদিন কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, এই সব শাসকের কথা ও কাজের এবং ঈমান ও আমলের এই বৈপরীত্যের মাশুল হিসেবে স্পেনের লক্ষ লক্ষ মুসলমান ধ্বংস হয়ে গেল, আমার মত হাজারো মানুষ ক্রীতদাসের শৃঙ্খল গলায় পরতে বাধ্য হলো। মা’বুদ আমার জীবদ্দশায় কর্ডোভা যদি মুক্ত হয়,

তাহলে আমাকে সেখানে যাবার সুযোগ দিও, যাতে গোয়াদেল কুইভারের ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে আমি চিৎকার করে বলতে পারি, ‘আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বিজয়ী নয়, এ কথা সত্য, কিন্তু যে শাসক নিজের স্বার্থে অন্যকে বিজয়ী করে, তাদের অধিকার নেই এই পবিত্র বাক্য উচ্চারণের। এরা এদের স্বার্থ হাসিলের জন্যে মুসলিম জনতাকে বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু আমার ইচ্ছা পূরণ হয়নি। আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জানি কর্ডোভা মুক্ত হয়নি, বরং তার উপর রাতের অন্ধকার আরও গভীরতর হয়েছে।

কর্ডোভার পতন হওয়ার দুর্ভাগ্যের দিনটিও ছিল আমার জন্যে পরম সৌভাগ্যের। এদিন সকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসেবে অর্ধযুগের কাজের মূল্যায়নের স্বীকৃতি হিসেবে চিকিৎসা সেবায় সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর পুরস্কার লাভ করি আমি। একটা স্বর্ণের মেডেল এবং তার সাথে পাই এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার হিসেবে। একই সাথে এই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ও আমার শেষ পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার মেডেল দিয়ে দেয়। আমার পিতার মৃত্যু আমাকে এতটাই আপসেট করেছিল যে, মেডেলটি সংগ্রহ ও বাড়িতে নেয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু এদিন বিশ্ববিদ্যায়ের প্রক্টর আমার প্রিয় শিক্ষক বললেন, চারদিকের অবস্থা ভালো নয়। হাজারটা বিপদ শহরের উপকন্ঠে, মেডেলটা নিয়ে যাও। আমি সে মেডেলটা নিয়ে ব্যাগে পুরেছিলাম। তবে হাসপাতালে ফিরে দেখলাম একের পর এক আহত সৈনিক ও সাধারণ লোকদের নিয়ে আসা হচ্ছে হাসপাতালে। জানতে পারলাম ফার্ডিন্যান্ডের বাহিনী শহরে প্রবেশ করেছে। বিজয়ী হিসেবে তৃতীয় ফার্ডিন্যান্ডের কর্ডোভায় প্রবেশ এবার ধ্বংসের ঝড় নিয়ে এল। পালাতে পারেনি এমন কোন মুসলমান সেদিন এই ঝড়ের কবল থেকে বাঁচেনি। এই ঝড়ের কথা আমি আগে কল্পনাও করতে

পারিনি। আমি একজন ডাক্তার হিসেবে সেদিন সারা দিন হাসপাতালেই ছিলাম। আহত খৃস্টান, মুসলমান সৈনিক ও সাধারণ মানুষ অবিরাম আসছিল হাসপাতালে। আমার যোগ্যতা ও শক্তির সবকিছু উজাড় করে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছি। আহার, বিশ্রাম সব কিছু ভুলে খৃস্টান, মুসলমান নির্বিশেষে সকলের সমান সেবা করেছি। আমার ধর্ম ইসলামে আহত মানুষের কোন জাত নেই। তারা মানুষ। মানুষ হিসেবেই তাদের সমান সেবা করতে হবে। আমি তাই করার চেষ্টা করেছি। একদিন একরাতের পর সেদিন ভোরে ফজরের নামাজের পর ঘুরে বসতেই মনে পড়ল বাড়ির কথা, একমাত্র সন্তান ও স্ত্রীর কথা। চমকে উঠলাম্। গত ২৪ ঘন্টা ওদের কথা মনে করিনি কেন? ওরা কেমন আছে? সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। রাজপথে রক্তের স্রোত মাড়িয়ে বাড়ি পৌঁছলাম। অল্প কিছু দূরে গোয়াদেল কুইভারের তীরেই আমার বাড়ি।

বাড়ির বাইরের প্রাঙ্গণে পৌঁছতেই দূর থেকে চোখে পড়ল আমার বাড়ির মূল গেট হা করে খোলা। আঁৎকে উঠলাম আমি। এমন তো হবার কথা নয়! এমন পরিস্থিতিতে বাড়ির গেটের দরজা খোলা থাকার প্রশ্নই আসে না। দৌড় দিলাম আমি। গেটে পৌঁছেই দেখলাম গেটের দরজা খোলা নয়, ভাঙা। এবার দেহের রক্তে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল। বুঝলাম কি ঘটেছে। বাড়ির ভেতরে পা বাড়াতে ভয় করছিল। কি দেখব সেখানে দিয়ে! কম্পিত পায়ে তবু এগোলাম। বৈঠকখানা ঘর খোলা, শূন্য। ভেতর বাড়িতে ঢুকলাম। সব ফাঁকা। পৌঁছলাম শোবার ঘরের সামনে। দরজা ভাঙা। আর এগোতে পারছিলাম না আমি। শরীরের সব শক্তি যেন নি:শেষ হয়ে গেছে। বুক কাঁপছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মনটাকে শক্ত করে ঘরের ভেতরে পা বাড়ালাম। ঘরের ভেতরে চোখ পড়ল। আমার অজান্তেই বুক থেকে মুখ ভেদ করে একটা আর্তচিৎকার বের হয়ে এল। আমার তিন বছরের সন্তানের রক্তাক্ত দেহ মেঝেতে পড়ে আছে। তার মাথাটা গুঁড়ো হয়ে যাওয়া। দৃষ্টি ছুটে গেল পাশেই একটু দূরে। পড়ে আছে আমার স্ত্রীর দেহ। একবার তাকিয়ে চোখ বন্ধ করলাম। এবার চিৎকারও বের হলো না মুখ থেকে। চিৎকারের ভাষা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। অবরুদ্ধ বোবা আবেগ দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে দিল হৃদয়টাকে। টলতে টলতে গিয়ে আমি বিছানা থেকে চাদর তুলে এনে ঢেকে

দিলাম আমার স্ত্রীর দেহ। ধপ করে বসে পড়লাম স্ত্রীর চাদর-ঢাকা দেহের পাশে। আমার দৃষ্টি ঝাপসা। চারদিকের পৃথিবীটা আমার কাছে ছোট হয়ে গেছে। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। ক্ষুধার্ত, অবসন্ন, বোবা হয়ে যাওয়া আমি তখন বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্নও হয়ে পড়েছিলাম। অদ্ভুত একটা চিন্তা চলন্ত ছবির আকারে মাথায় এল। তা হয়তো স্বপ্ন ছিল। দু'টি লাশ কাপড়ে জড়িয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ির পাশের গোয়াদেল কুইভারের পানিতে নামিয়ে দিয়ে একটা পথ ধরে আমি এগিয়ে চলছি। পথটা নতুন। এর আগে কখনও দেখিনি। পথটা এগিয়ে আরও এগিয়ে দূর দিগন্তে আকাশের সাথে যেন মিশে গেছে।

তন্দ্র কেটে গেল আমার।

কিন্তু চিন্তাটা জীবন্ত দৃশ্যের মত সামনে রয়ে গেল আমার। ভাবলাম আমি, আমার প্রভুর নির্দেশ কি এটা আমার জন্যে! আমাকে কি কর্ডোভা ছাড়তে হবে? কোন নতুন পথ কি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে? সে পথে একাই চলার ভাগ্য কি আমার?

দু'চোখ থেকে অশ্রুর ধারা নেমে এল আমার। একা বেঁচে থাকাটা আমার জন্যে দু:সহ। তার চেয়ে ভালো হতো যদি ফার্ডিন্যান্ডদের লোকদের সাথে লড়াই করে জীবন দিতে পারতাম। তাহলে সকলের সাথে আমি কর্ডোভায় থাকতে পারতাম। কিন্তু তন্দ্রায় দৃশ্যগুলো আমার জীবনের জন্যে এক অমোঘ নির্দেশ বলে মনে হলো।

চোখের পানি মুছে বিমোহিতের মত উঠে দাঁড়ালাম। দু'টো লাশকে বিছানার চাদরে জড়িয়ে কাঁধে তুলে নিলাম। আমার প্রিয় বাড়িটির জন্যে একটুও মায়া মনে জাগল না। আমার দাদার তৈরি বাড়িটা বাবার অতিপ্রিয় ছিল, আর আমারও জীবনের সাথে অচ্ছেদ্য বাঁধনে জড়িয়ে ছিল বাড়িটা। কিন্তু এখন বাড়িটা ছাড়তে আমার কিছুই মনে হলো না। আমার বাড়ির সামনেই গোয়াদেল কুইভার নদী। বাড়ির পরে একটা পায়ে চলার রাস্তা। তার পর একটা ঘাট ধাপে ধাপে নেমে গেছে গোয়াদেল কুইভারের পানিতে। হাঁটু পরিমাণ পানিতে নেমে কাঁধ থেকে লাশ দু'টো নামিয়ে আদরের সাথে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিলাম গোয়াদেল কুইভারের বুকে। তার নীরব স্রোতধারা যেন পরম স্নেহেই গ্রহণ করল লাশ দু'টোকে।

মুহূর্তেই গোয়াদেল লাশ দু'টোকে আড়াল করল আমার চোখ থেকে। কিছুক্ষণ ওদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। চোখের পানি দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিল। ধীরে ধীরে উঠে এলাম সিঁড়ি বেয়ে উপরের রাস্তায়। মুহূর্ত মাত্র দাঁড়ালাম। তাকালাম বাড়ির দিকে। চিরপরিচিত বাড়ি। রাস্তার দিকে মুখ ফেরালাম। হাঁটতে শুরু করলাম। গোয়াদেল কুইভারের তীর বেয়ে পায়ে চলার পথ। এগিয়ে গেছে সামনে, এগিয়ে গেছে সীমাহীন সীমান্তের দিকে। এ যেন গোয়াদেল কুইভারের সেই পরিচিত রাস্তা নয়। সব মানুষের সামনে চলার এ যেন সনাতন পথ। সেই পথ আজ আমারও পথ। চলছি বিরামহীন, লক্ষ্যহীন।

এই পথ আমাকে নিয়ে এল স্পেন পেরিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে। সময় পার হয়েছে তিন মাস। আমার পিঠের ব্যাগটি অনেক বড় হয়েছে। এক কাপড়ে বেরিয়েছিলাম। আরেক প্রস্থ কাপড়, জ্যাকেট ইত্যাদি কিনতে হয়েছে। ব্যাগের পকেটের সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ছিল আমার সম্বল। এই টাকা ভেঙেই বেঁচে থাকার চেষ্টা করে এসেছি আর পথ চলেছি। কোথায় যাব, পথের এই যাত্রা কোথায় থামাব, মন সে ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলেনি।

দক্ষিণ ফ্রান্সের পথের ধারের পান্থশালায় আমি সেদিন ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি সম্বলমাত্র ব্যাগটি আমার নেই। ব্যাগটি মাথার নিচে দিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। কখন কে আমার মাথার তল থেকে ব্যাগটি নিয়ে গেছে জানি না। এবার প্রকৃতই আমি পথের মানুষ হয়ে দাঁড়ালাম। তবু খুশি হলাম এই ভেবে যে, আমার দু'টি মেডেল রক্ষা পেয়েছে। ও দু'টি আমি রেখেছিলাম আমার পাজামার কোমরে এক গোপন পকেটে।

খাওয়া-দাওয়া-নাওয়া কিছু নেই, পথ চলছিলাম। জনবসতি কম। মাঝে মাঝে পথের পাশে গুচ্ছ বাড়ি দেখা যাচ্ছে কিন্তু ভিক্ষুক হতে মন সায় দেয়নি। বেওয়ারিশ সব গাছের পরিচিত অপরিচিত ফল-মূল খেয়ে আমার সময় কাটছিল।

একদিন ক্ষুধা-কাতর অবসন্ন দেহে পথের পাশে একটা গাছে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে নিদ্রাচ্ছন্নের মত বসেছিলাম। একটা গাড়ি আমি যেদিক থেকে এসেছি সে দিক থেকে এগিয়ে আসছে শব্দ পাচ্ছিলাম। কিন্তু চোখ খোলার প্রবৃত্তি হয়নি। গাড়িটি আমার বরাবর এসে দাঁড়াল। আমাকে দেখেই দাঁড়িয়েছে।

আমি শুনতে পাচ্ছিলাম একজন বলছিল, ‘দেখতে মুরদের মত লাগছে। নিশ্চয় মুরদের কোন পলাতক সৈনিক। বয়স দেখা যাচ্ছে চল্লিশ এখনও হয়নি। ধরে নাও। স্লেভ মার্কেটে মুররা এখন হট কেক।’ এর কথা শেষ হলে আরেকজন বলে উঠল, ঠিক বলেছ জ্যাকি। মুর সৈনিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের এ চালানে কিন্তু এখনও একজন মুর জোটেনি। একে পেলেই তো এবারের চালান পূর্ণ হয়ে যায়। চল ধরে ফেলি। ফাঁদটা বের কর।’

মনে হলো ওরা কয়েকজন গাড়ি থেকে নামল। ওদের মতলব বুঝতে পারলাম। পালাতে পারতাম কি না জানি না, কিন্তু পালাবার প্রবৃত্তি হলো না। আমার চিন্তা শেষ হতে পারল না। কি যেন এসে আমার শরীরের চারদিকে অস্পষ্ট মোটা শব্দ তুলে পড়ল। চোখ মেলে দেখলাম, চারদিক থেকে দড়ির জালে আমি আবদ্ধ। জাল ওরা গুটিয়ে নিচ্ছে। আমি শুনেছি বন্য পশুকে এভাবেই ধরে থাকে। এখন ওরা পশুর মত করেই মানুষ শিকার করছে।

আমার পরিণতি কি হতে যাচ্ছে তা ওদের কথা থেকেই বুঝতে পেরেছি। ওদের ক্রীতদাস বাণিজ্যের চালানে এখনও একজন লোক কম আছে। আমাকে দিয়েই তারা ঐ শূন্যস্থান পূরণ করতে চায়। সব বুঝেও আমার কিছু করার ছিল না। চেষ্টা করেও ওদের হাত থেকে, ওদের ফাঁদ থেকে পালাতে পারতাম না। আর আমি আগেই নিজেকে পথের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছি। পথ আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটাই দেখার বিষয়।

বিরাট বড় ওদের গাড়ি। একটা কাভার্ড ভ্যান আরও চারটি কাভার্ড ভ্যানকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এখানে-সেখানে থেমে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে গাড়ি বহরটি গিয়ে পৌঁছল দক্ষিণ জার্মানীর সীমান্ত শহর স্ট্রাসবার্গে। এখানেই বসে মধ্য ইউরোপের সবচেয়ে বড় দাস বাজার। অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, সুইডেন, ডেনমার্ক অঞ্চল থেকে এখানে খদ্দের আসে।

স্ট্রাসবার্গে গিয়ে বুঝতে পারলাম কতজনকে দাস মার্কেটে বিক্রির জন্যে আনা হয়েছে। আমরা সংখ্যায় ছিলাম একশ জন। একেক কাভার্ড ভ্যানে পঁচিশজন করে। পশুর মত গাদাগাদি করে আমাদের আনা হয়েছে।

দাস বাজারে স্লেভ ট্রেডারদের এক বা একাধিক খোয়াড় ধরনের জায়গা আছে। এগলোর ছাদ আছে এবং গোলাকার চারদিকটা লোহার শিকের বেড়া দিয়ে ঘেরা। খোঁয়াড়ে প্রত্যেকের জন্যে একটা করে বেড আছে। খোঁয়াড় থেকে একেকজন করে বেরিয়ে খাবার নিয়ে আসতে হয়। খোঁয়াড়েই ঘুরে বেড়াতে হয়। রাত ছাড়া শোয়ার হুকুম নেই। পূর্ণ রাত্রি ঘুম ও পর্যাপ্ত খাবার আমাদের দেয়া হয়। দাসদের স্বাস্থ্য ভালো হওয়া বেশি দাম পাওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয়। খাওয়ার জন্যে বাইরে বের করে আনা হয় এটা দেখানোর জন্যে যে, সে শান্ত-শিষ্ট ও অনুগত। ভালো দাম পাবার জন্যে দাসকে শান্ত-শিষ্ট ও খুব অনুগত প্রমাণ করতে হয় ক্রেতার কাছে। যতদিন খদ্দের না পাওয়া যায়, তখন দাস বাজারের খোঁয়াড়েই থাকতে হয়। শীতের সময় রাতের বেলা খোঁয়াড়কে টিন শিট দিয়ে ঘেরা হয় এবং বাইরে চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে আবহাওয়া গরম রাখা হয়। আমার সংগীদের মধ্যে জনাদশেক ছাড়া সবাই আফ্রিকার খৃস্টান। অবশিষ্ট দশজনের সবাই মুসলিম। তাদের কাউকে আমি চিনি না। ওরা সবাই সৈনিক। বিভিন্ন অঞ্চল খেকে ওদের ধরে আনা হয়েছে। এদের সবাইকেই আমি মনের দিক দিয়ে ভেঙে পড়া অবস্থায় পেয়েছি। আমি ওদের সাহস দিয়েছি, আল্লাহর ওপর ভরসা করতে বলেছি। সুস্থ থাকা, শান্ত থাকা এবং যেহেতু এর বিকল্প নেই, তাই যা ঘটে তা মেনে নেয়ার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে বলেছি। সবাইকে হারালেও, সবকিছু হারালেও আল্লাহকে না হারাবার জন্যে ওদের উপদেশ দিয়েছি। আল্লাহ রাজি থাকলে কষ্টের এ দুনিয়ার পর অনন্ত সুখের সম্ভাবনা থাকে। কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকাংশই সোহেলী অঞ্চলের। সোহেলী ভাষা আমি মোটামুটি জানি। কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে প্রায় ৩০ জনের মত মুসলমান পেয়েছি। আমাদের নামাজ পড়া দেখে তারাই এসে তাদের পরিচয় দিয়েছে। এটা ঘটেছে দাস বাজারের খোঁয়াড়ে আসার পর। আমি তাদের উপদেশ দেবার সুযোগ পেয়েছি। তারা সবাই আমার ভক্তে পরিণত হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, আমাদের এই নামাজ রাতের বেলা

গোপনে পড়তাম। আমাকে তারা মুর জানত, কিন্তু সরাসরি জানত না আমি মুসলমান। আমি ইচ্ছা করেই আমার লেখা-পড়া, পেশা ও আমার ধর্ম গোপন করেছি শুরু থেকেই। খোঁয়াড়ের সবার সাথেই একটা হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম কে কোথায় বিক্রি হয় তা জানার ও গোপনে লিখে রাখার চেষ্ট করব, যাতে ভবিষ্যতে ওদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো আমাদের একশজনের লটের মধ্যে আমিই প্রথম বিক্রি হয়ে যাই।

কয়েক দিন থেকেই আমি দেখছিলাম দীর্ঘ দেহী 'নাইট'দের ইউনিফরম পরা বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত একজন ঘোড়সওয়ার দাস বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের খোঁয়াড়ে কয়েক বার ঘুরে গেছে।

সেদিন দুপুরে আমাদের স্টল থেকে আমি খাবার আনছিলাম। হঠাৎ আমি সেই ঘোড়সওয়ারের সামনে পড়ে গেলাম। ঘোড়সওয়ারও থমকে দাঁড়াল। আমাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল, 'তোমার নাম কি?' আমি বলল, জোসেফ জ্যাকব আলগার।'

নামটি আমি আগেই ঠিক করে আমার মালিককে বলে দিয়েছিলাম। নামটি আমার মূল নাম 'ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর'-এর খৃস্টীয়করণ। উভয় নামের অর্থ একই। ঘোড়সওয়ার লোকটি একটু ভ্রুকুঁচকে বলল, 'দাসদের সবার নামই সংক্ষিপ্ত। তোমার এত বড় নাম? এ নামের অর্থ কি জান?'

আমি বললাম, 'উত্তম যোদ্ধা জোসেফ জ্যাকব।'

গম্ভীর কন্ঠে বলল ঘোড়সওয়ার, 'তুমি কি যোদ্ধা? যুদ্ধ করেছ?'

আমি বললাম, 'যোদ্ধাও নই, যুদ্ধও করিনি। তবে যাদের নামে আমার নাম তারা সবাই এক ধরনের যোদ্ধা ছিলেন।'

'কি ধরনের যোদ্ধা ছিলেন?' বলল ঘোড়সওয়ার। সেই গম্ভীর কন্ঠেই।

'শুনেছি তাঁরা মানুষ পরিবর্তনের যোদ্ধা ছিলেন।' বললাম আমি। এবার আরও একবার ভ্রূকুঁচকে গেল ঘোড়সওয়ারের। বলল, 'কোথায় শুনেছ তুমি?'

উত্তর আগেই চিন্তা করে রেখেছিলাম। বলল, 'গির্জার সামনে শুনেছি।'

ঘোড়সওয়ারের চেহারায় প্রসন্নতা দেখা দিল। বলল, 'তুমি গির্জায় যাও?'

‘যেতাম।’ আমি বললাম।

‘তুমি লেখাপড়া জান?’ জিজ্ঞেস করল ঘোড়সওয়ার।

‘কোন রকমে লেখা ও পড়ার মত অক্ষরজ্ঞান আমার আছে।’ বললাম আমি।

‘তুমি জার্মান ভাষার নাম শুনেছ?’ জিজ্ঞেস করল ঘোড়সওয়ার।

‘শুনেছি। কিছু বলতে ও বুঝতে পারি।’ আমি বললাম।

এবার বিস্ময় ঘোড়সওয়ারের চোখে-মুখে। বলল, ‘কেমন করে জান, কোথায় শিখেছ?’

‘আমার একজন জার্মান প্রতিবেশী ছিলেন। তার কাছ থেকেই দিনে দিনে কিছুটা শেখা হয়ে গেছে।’ বললাম আমি।

‘তোমাকে কোথেকে ধরেছে?’ জিজ্ঞেস করল ঘোড়সওয়ার।

‘পশ্চিম স্পেনের যুদ্ধ সংলগ্ন এক গ্রাম থেকে প্রতিপক্ষ যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরে নিয়ে যায় এবং বর্তমান মালিকের কাছে বিক্রী করে।’ আমি বললাম। এটাই মালিক বলতে বলেছিল।দক্ষিন ফ্রান্সের শান্ত এলাকা থেকে এরা আমাকে ধরেছে, এ কথা না বলতে শাসিয়ে দিয়েছিল মালিক। আমি সেটাই বললাম।

‘দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে আমার খারাপ লাগেনি?’ জিজ্ঞেস করল মালিক।

‘এটাই মনে হয় আমার ভাগ্য।’ বললাম আমি।

‘এই ভাগ্যকে তুমি মেনে নিয়েছ?’ বলল ঘোড়সওয়ার।

‘ভাগ্য তো ভাগ্যই। একে মেনে নেয়া, না নেয়ার কোন অবকাশ নেই।’ আমি বললাম।

‘তুমি খুব বুদ্ধিমান। আমি খুশি হয়েছি।’ বলল ঘোড়সওয়ার।

‘ধন্যবাদ।’ বলে আমি চলে এলাম আমার খোঁয়াড়ে। আমার খাওয়া শেষ করে আমি হাত-মুখ পরিস্কার করতে গিয়ে দেখলাম, সেই ঘোড়সওয়ার ও আমার মালিক কথা বলছে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এলাম।

আমি ফিরে আসার পরপরই ফিরে এল আমার মালিক। হাসিমুখে আমার কাছে এসে বলল, ‘আমার সৌভাগ্য, তোমারও সৌভাগ্য। ক্রুসেড ফেরত একজন

বিখ্যাত নাইট তোমাকে কিনে নিয়েছে। সে একজন বীর ও জ্ঞানী মানুষ। এটা তোমার সৌভাগ্য। আর আমার সৌভাগ্য হলো যে রেট চলছে, তার দ্বিগুণ দাম সে আমাকে দিয়েছে। তুমি রেডি হও। সে আধা ঘন্টার মধ্যে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।

মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। আমার সাথী খোঁয়াড়ের সবাইকে আমি ভাইয়ের মত ভালোবেসে ফেলেছিলাম, বিশেষ করে মুসলিম ভাইদেরকে। আমার চলে যাওয়া মানে চিরতরে ওদের আমি হারিয়ে ফেলব।

মনটা আমার কেঁদে উঠলেও করার কিছু ছিল না। আধা ঘন্টার মধ্যেই ঘোড়সওয়ার আমার খোঁয়াড়ে গিয়ে হাজির হলেন একটা ঘোড়ায় টানা জার্মান গাড়ি নিয়ে। তার সাথে আরেকজন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক।

মালিক স্বয়ং খোঁয়াড়ের মুখে ছিল। আমি বের হয়ে এলাম খোঁয়াড় থেকে। বের হবার সময় হাত দিয়ে একবার দেখলাম নতুন পাতলুনের পকেটে আমার সেই দু'টো মেডেল আছে কি না। নিশ্চিত হয়ে সামনে এগোলাম।

ঘোড়সওয়ার আমাকে স্বাগত জানাল। সাথের যুবকটিকে দেখিয়ে বলল, 'এ হলো বেনেডিক্ট, আমার সেক্রেটারি। আর আমি ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক। রাইনের একজন নাইট। এখন রাইন ছেড়ে সালজওয়াডেলে চলে গেছি। তুমি সেখানেই যাবে। গাড়ির পেছনে উঠে বস।'

বলে ঘোড়সওয়ার নাইট ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক গিয়ে বসল ড্রাইভিং সিটে। তার পাশে বসল তার সেক্রেটারি বেনেডিক্ট।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

আমি বললাম, 'ঘোড়াটার কি হবে? ঘোড়া কে নিয়ে যাবে?'

'ধন্যবাদ আলগার, তুমি ঘোড়াটার কথা মনে করেছ। ঘোড়াটা আমার ভাড়া করা ছিল। নাইটরা ঘোড়ায় চড়তেই বেশি গৌরব বোধ করে, ঘোড়ায় টানা গাড়িতে নয়। এখানে এসে ভাড়া করেছিলাম ঘোড়াটা।' বলল নাইট ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক।''

এই পর্যন্ত পড়ে আহমদ মুসা সামনের আরও পাতা উল্টিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'মি. আলগার, এর পরের কিছু পাতায় রয়েছে স্ট্রাসবার্গ থেকে জার্মানীর

আরেক এলাকা সালজওয়াডেলে যাবার কাহিনী। এখানে পথের বর্ণনা ছাড়া তেমন কিছুই নেই। আগেও কিছু কিছু বাদ দিয়েছি, এখানে বড় একটা অংশ বাদ দিতে হবে।' থামল আহমদ মুসা।

কোন জবাব নেই মি. আলগার কিংবা কারও তরফ থেকে। তাকাল আহমদ মুসা তাদের দিকে। দেখল, অপার বিস্ময় আর বেদনার দৃষ্টি নিয়ে আলগার তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। আদালার মায়ের চোখেও একই বিস্ময় আর বেদনা। কিন্তু আদালার চোখ অশ্রুতে ভরা। চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর ধারা তার দুই গণ্ডেও নেমে এসেছে।'

মি. আলগারই কথা বলল। সে বলল, 'মি. আহমদ মুসা, জবাব তো আমরা পেয়ে গেছি। আমরা দাস বংশোদ্ভূত কেন, কেন আমরা নন-জার্মান, আমাদের মূল কোথায়, পরিচয় আমাদের কি-সব প্রশ্নের জবাব আমরা পেয়ে গেছি। আমার দাদু আমার নাম আমাদের প্রথম পুরুষের নাম অনুসারে রেখেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, নাইট ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক দাস হিসেবে যাকে কিনে এনেছিলেন, সেই ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর ওরফে জোসেফ জ্যাকব আলগার আমাদের প্রথম পুরুষ। তাঁর নতুন নামেই আমার নাম। আরও জানলাম, আমাদের মূলটা একটা গৌরবদীপ্ত সিভিলাইজেশন-এর সাথে। মূলে গিয়ে আমরা মুসলমান। জার্মানীতে আমার প্রথম পুরুষ মুসলমান ছিলেন। কিন্তু সব কিছুর পরেও মি. আহমদ মুসা আমরা দাস বংশোদ্ভূত আমরা নন-জার্মান, এটাই প্রতিষ্ঠিত হলো।'

থামল জোসেফ জ্যাকব আলগার। বেদনায় ভেঙে পড়া তার কন্ঠ।

পিতা জোসেফ জ্যাকব আলগার থামতেই চোখ মুছতে মুছতে আদালা হেনরিকা বলে উঠল, 'বাবা, তোমাকে আমি ডিপ্রেসড দেখছি। তোমার কন্ঠে বেদনার সুর বাবা। আমি এর প্রতিবাদ করছি। আমি আমাদের প্রথম পুরুষ ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর ওরফে জোসেফ জ্যাকব আলগারের সীমাহীন দু:খ-বেদনা ও বিপর্যয়ে কেঁদেছি বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি আমি গৌরব বোধ করছি। আমার পূর্বপুরুষকে যিনি কিনেছেন, সেই নাইট একজন যোদ্ধা ছিলেন মাত্র আর আমার পূর্বপুরুষ ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর গোটা ইউরোপে যখন মেডিকেল

বিশ্ববিদ্যালয় তো দূরে থাক, একটা মেডিকেল স্কুলও ছিল না ইউরোপ জুড়ে, তখন ছিলেন কর্ডোভা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত কৃতি ছাত্র এবং কর্ডোভা মেডিকেল কলেজের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কৃতি চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং সেই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি অধ্যাপক। ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি হওয়া ছিল একটা ঘটনাচক্র। আর বাবা, আমার মহান সেই পূর্বপুরুষ একজন ডাক্তার হিসেবে ধর্ম, দেশ পরিচয় নির্বিশেষে সকল আহতকে সেবা দিচ্ছিলেন, প্রাণ বাঁচাচ্ছিলেন আহতদের, তখন তার সন্তান ও স্ত্রীকে বীভৎস পাশবিকতার সাথে হত্যা করা হয়। রাজ্য হারিয়ে, সন্তান ও স্ত্রীর মৃত্যুর বীভৎস দৃশ্য দেখে তিনি সব ব্যাপারে এতটাই নিরাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, সব ত্যাগ করে পথের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন, মানে ঈশ্বরের হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর বা আল্লাহ তাঁকে এই জার্মানীতে আনবেন বলেই এসব ঘটেছে। তাঁর গৌরব, তাঁর মর্যাদা এতে এতটুকুও ম্লান হয়নি। আমরা তাঁর বংশধর, আমাদের মর্যাদাকে ম্লান ভাবছি কেন? তিনি যে উন্নতশিরে দাস জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহর ইচ্ছা ভেবে, আমরাও তেমনি উন্নতশির হবো দাস বংশোদ্ভূত হওয়ার পরিচয় দানের ক্ষেত্রে।' বলল আদালা হেনরিকা।

জোসেফ জ্যাকব আলগার ও তার স্ত্রী আদালার মা'র চোখ মুখ অনেকখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বলল আদালার বাবা আলগার, 'ধন্যবাদ আদালা, আমাদের মহান প্রথম পুরুষের সর্বকনিষ্ঠ উত্তরসূরির উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করেছ। আমরা যেটা পারিনি। পারিনি কারণ, এই দায়িত্ব নেয়ার জন্যে যে শক্তি ও প্রাণপ্রাচুর্য দরকার তা আমাদের বোধ হয় নেই। আমরা এখন শান্তি খুঁজি, স্বস্তিতে থাকতে চাই। আর শান্তি ও স্বস্তির সন্ধান মানুষকে অনেকটাই দুর্বল ও রক্ষণশীল করে তোলে। ধন্যবাদ তোমাকে আদালা। কিন্তু আমাদের মহান সেই প্রথম পুরুষ তার মুসলিম পরিচয় ও কৃতী চিকিৎসাবিজ্ঞানী হওয়ার পরিচয় সেদিন গোপন করেছিলেন কেন?'

'বাবা, তুমি জান সে সময়টা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড উন্মাদনার সময়। এটা ফার্স্ট ক্রুসেডের পরবর্তী ঘটনা। তারপরও আরও কয়েকটি ক্রুসেড হয়েছে। সে সময় মুসলিম পরিচয় পেলে কিংবা মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীর

পরিচয় পেলে ইউরোপের এই অংশের কোন দেশেই তার বাঁচার কোন সুযোগ ছিল না। আমি মনে করি, মুসলিম পরিচয় গোপন করে তিনি অন্তত প্রাণ বাঁচাতে পেরেছেন। তারপর তিনি আরও কি সুযোগ পেয়েছেন কিংবা কি' ঘটেছে তা পরবর্তী পাঠ থেকে জানা যাবে বাবা। পড়া আমার শুরু হওয়া দরকার। আপাতত কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে পড়লে সংক্ষেপে সব জানার জন্যে তা ভালো হবে। পরে পুরো পড়ার সুযোগ নেয়া যাবে, যদি স্যার আমাদের প্রতি দয়া করেন।' বলল আদালা হেনরিকা।

'প্লিজ মি. আহমদ মুসা, আপনি যেভাবে ভালো মনে করেন পড়া শুরু করুন। আদালার সাথে আমি একমত।'

আহমদ মুসা আবার পড়া শুরু করল:

''তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় সালজওয়াডেলে পৌঁছলাম। মাঝখানে দু'রাত আমরা বিশ্রাম নিয়েছি দুই হোটেল বা পান্থশালায়। সব জায়গায় দেখেছি নাইট ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিকের ভীষণ খাতির। সবাইকে বলাবলি করতে শুনেছি, ইস্তাম্বুল অভিমুখের ষষ্ঠ ক্রুসেড পরিচালনায় তিনি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার লোক হিসেবে আমরাও কম খাতির পাইনি।

সালজওয়াডেল নদীর ধারে বিশাল দুর্গসদৃশ বাড়ি নাইট ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিকের। পরে শুনেছি নাইট ফ্রেডারিক যখন রাইনের দুর্গ ছেড়ে সালজওয়াডেল চলে আসেন, তখন কিং চতুর্থ অটো তাকে স্বাগত জানিয়ে এই বাড়ি দান করেন এবং নদীর উপর পাহারাদারীর দায়িত্ব দেন।

বাড়িতে পৌঁছে আমার নতুন মালিক নাইট ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক তার সেক্রেটারি বেনেডিক্টকে বলল, আলগারকে আপতত বিশ্রামের একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে নাস্তা করাও। তারপর তাকে সেলুনে নিয়ে গিয়ে চুল কাটাও।

দাসদের চুলকাটা মানে মাথা, মুখ সবকিছুকে নগ্ন করা। জীবনে এই প্রথম দাড়ি,গোঁফ ও চুল কেটে নেড়ে হলাম।

চুল কাটার পর মালিকের সেক্রেটারি বেনেডিক্ট আমাকে জানাল, 'আগামীকাল সকালে তোমাকে নাইট ফ্রেডারিকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাঁর সাথে পরিবারের অন্য কেউ থাকতে পারেন। সেই দেখা করার পর ঠিক হবে

কোন কাজ তোমাকে দেয়া হবে।’ বুঝলাম সাক্ষাৎকারটা আসলে একটা ইন্টারভিউয়ের মত। মানে যে দাসকে কেনা হলো তাকে দিয়ে কোন কাজটা করানো হবে।

পরদিন নাস্তার পর আমাকে মালিকের সামনে হাজির করা হলো। মালিকের দুর্গসদৃশ বাড়ির প্রধান গেট দিয়ে ঢুকে বিরাট লন। লনের শেষ প্রান্তে বিরাট সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। বাড়িটা সত্যিই দুর্গের মত দশ বারো তলার সমান উঁচু। দোতলায় সিঁড়ির মুখে একপাশে একটা টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ারে বসেছেন আমার নতুন মালিক। তার বামপাশে তার প্রায় সমবয়স্ক এক মহিলা, নিশ্চয় তার স্ত্রী হবেন। মহিলার পাশে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের আরেকজন যুবতী, তার পাশে আট দশ বছরের একটি শিশু। তাদের পরিচয় ঠিক বুঝলাম না, তবে মনে হলো মেয়েটি মালিকের মেয়ে এবং শিশুটি মালিকের নাতি হলে মানায়। সবাইকে দেখলম প্রসন্ন, কিন্তু ডাক্তারের চোখ দিয়ে বুঝলাম, যুবতী মহিলাটি মানসিকভাবে ডিপ্রেসড। অন্য সবার মধ্যে একটা জীবন্ত আগ্রহ দেখলাম, শুধু সে ছাড়া।

তাদের টী টেবিল থেকে দশ ফুট দূরে হাতজোড় করে আমাকে দাঁড়াতে হলো। মনে কষ্ট লাগল এভাবে দাঁড়াতে, কিন্তু বেনেডিক্টের নির্দেশে এভাবে দাঁড়াতে হলো। আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে কখনও হাতজোড় করিনি। কিন্তু আজ মানুষ মনিবের কাছে তা করতে হলো। আমার সামনে ছিল উঁচু ক্ষুদ্র একটা ডেস্ক। ডেস্কের উপরে ছিল এক শিট কাগজ ও একটা কলম।

আমি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার নতুন মালিক নাইট মি. ফ্রেডারিক বলে উঠলেন, ডেস্কের উপরের কাগজটায় তুমি তোমার নাম, দেশের নাম, অঞ্চলের নাম, স্ত্রী-সন্তান আছে কি নেই, তোমার ভাষা, তোমার জানা অন্য ভাষা, তোমার অতীত পেশা, কোন ক্রাইম তোমার দ্বারা হয়ে থাকলে তা লেখ। এসব বিষয় স্লেভ ট্রেডারের হুকুমেও লিখতে হয়েছিল, সে যেমন বলেছিল সেইভাবে। তার পুনরাবৃত্তি আমি লিখে ফেললাম। স্ত্রী-সন্তান নিহত হয়েছে লিখলাম আর পেশা আগের মতই কারখানায় চাকরি লিখলাম। আমার লেখা শেষ হলে পাশে দাঁড়ানো বেনেডিক্ট কাগজ কলম নিয়ে আমার দুই হাত এবং হাতের আঙুলগুলো পরীক্ষা

করল। তারপর কাগজে কিছু লিখল এবং কাগজ কলমটি রেখে এল মালিকের টেবিলে। মালিক কাগজটি হাতে তুলে নিয়ে নজর বুলিয়ে স্ত্রীর হাতে দিল। তার স্ত্রী তা দেখে তার পাশের মেয়েটির হাতে দিল। মেয়েটি দেখে নিয়ে কাগজটি তার বাবার হাতে ফেরত দিল।

ফেরত পাওয়া কাগজটি হাতে নিয়ে মালিক একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, 'ফ্যাক্টরিতে তুমি কি কাজ করেছ?'

মিথ্যাটা আগেই সাজিয়ে রেখেছিলাম। বললাম, 'প্যাকিং-এর কাজ করেছি।'

আবার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল মালিক আমার দিকে। বলল, 'দেখ, আমি একজন মুসলিম ক্রীতদাস কিনতে চেয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল, একজন মুসলিমকে ক্রীতদাস বানিয়ে আমি প্রতিশোধ নেব। ক্রুসেডে আমি যা পারিনি এভাবে আমি তারই কিছুটা পূরণ করতে চেয়েছিলাম। আমি চতুর্থ ক্রুসেডে যোগদানকারী জার্মানের একজন শ্রেষ্ঠ নাইট। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের অধীনে পশ্চিম ইউরোপের সাথে আমরা জার্মানরাও সে ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিলাম। লক্ষ্য ছিল, মুসলমানদের হাত থেকে জেরুসালেমকে আবার উদ্ধার করা। প্রথম ক্রুসেডে আমাদের পূর্বসূরিরা মুসলমানদের হাত থেকে জেরুসালেম কেড়ে নিয়েছিলেন।

জেরুসালেম শহরের সত্তর হাজার মুসলমানকে যুদ্ধোত্তর অপারেশনে হত্যা করে আমরা চেয়েছিলাম জেরুসালেমকে আমাদের হাতেই রাখব। কিন্তু তা হয়নি। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যাকে মুসলমানরা গাজী সালাহ্উদ্দিন বলে, জেরুসালেম আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। ইউরোপের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্রসেড পারেনি জেরুসালেমকে মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিতে। এই জেরুসালেম উদ্ধারই ছিল আমাদের চতুর্থ ক্রসেডের লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের এই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। হয়নি ঘরের শত্রু বিভীষণকে বধ করতে গিয়ে। পোপের অধীন ক্যাথলিক চার্চ বিশেষ করে আমাদের জার্মানদের ঘোরতর শত্রু ছিল বাইজান্টাইন অরথোডক্স চার্চ। ওরা রোমান ক্যাথলিকদের আইন-নীতি ভংগকারী, অধর্মচারী, লোভী, রক্তপায়ী, বিশৃঙ্খল বর্বর, নোংরা ইত্যাদি ধরনের

গালাগালি করতো। কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে এই বাইজেন্টাইনরা ক্যাথলিক পোপ ও জার্মানীর তারা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই ক্রুসেড যাত্রার পর আমরা গতি পরিবর্তন করে জেরুসালেম জয়ের পরিবর্তে কনস্টান্টিনোপল জয়ের যাত্রা শুরু করেছিলাম। এই যাত্রা আমাদের সফল হয়েছিল। আমরা কনস্টান্টিনোপল জয় এবং তারপর তা বিধ্বস্ত করেছিলাম। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে বা্ইজেন্টাইন অর্থোডস্ক চার্চের সমাধি রচিত হলো বটে, কিন্তু মুসলমানদের গায়ে আমরা হাত দিতে পারলাম না। এই দু:খ আমাকে পুড়িয়ে মারছে। তাই চেয়েছিলাম একজন মুসলিম ক্রীতদাস এনে তার উপর মনের ঝাল মিটিয়ে দু:খ কিছু লাঘব করবো। তাও হলো না। তোমার সাথে কথা বলে তোমাকে আমার খুব পছন্দ হলো, তাই তোমাকে নিয়ে এলাম। সেই তুমি যাত্রা শুরু করলে মিথ্যা কথা বলে। তুমি ফ্যাক্টরিতে কাজ করনি। তোমার হাতের সবটুকু নরম হওয়া তারই প্রমাণ। আর তোমার কলমের আঁচড় প্রমাণ করে তুমি ভালো লেখায় অভ্যস্ত। ইচ্ছা করেই খারাপ করে লিখেছ। এই দুই মিথ্যার পর তোমার দেয়া তোমার পরিচয়ের উপরও এখন আমার আস্থা নেই। সুতরাং তুমি ভালো আচরণ পাওয়ার উপযুক্ত নও। তুমি আমার ফার্মল্যান্ডে কাজ করবে। ফার্মল্যান্ডের কঠোর পরিবেশ এবং কাজই মিথ্যাবাদীর জন্যে উপযুক্ত জায়গা।'

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল আমার নতুন মনিব। তাঁর সাথের সবাই উঠল। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ফার্ম হাউজে। আমার মালিক ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিকের বাড়ির বিশাল এরিয়ার সীমা থেকেই তার ফার্মল্যান্ডের শুরু। সেখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ফার্মল্যান্ডের মাঝখানে ফার্মহাউজ। এই ফার্মহাউজ থেকেই বিশাল ফার্মল্যান্ড পরিচালনা করা হয়।

হাসপাতালের একজন কৃতী ডাক্তার ছিলাম তা ভুলে গেলাম। ফার্মের শ্রমিক হিসেবে নতুন জীবন শুরু হলো। শ্রমিকরা বেতন পায়, কিন্তু ক্রীতদাসরা বাঁচার জন্যে শুধুই খাবার পায়। তাদের কাজের কোন সময়সীমা নেই। ক্রীতদাসদের সেই ভোরে কাজের শুরু হয়, আর ঘুমানো পর্যন্ত কাজ চলে। এভাবেই জীবন চলল।

একদিন মালিক-পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে এলেন ফার্মে। ফার্মটা দেখা ও তত্ত্বাবধান করার পর তারা ফার্মহাউজে এলেন। ফার্মহাউজে গোডাউন ছাড়াও রয়েছে শ্রমিক কর্মচারি ও দাসদের আবাস। এই সাথে ফার্মহাউজে রয়েছে দোতলা সুরম্য ভবন। ফার্মল্যান্ডে এলে মালিকরা এখানে থাকেন।

সেদিন বেলা পাঁচটায় মালিকরা এলেন সেই ভবনে। সেদিন সন্ধ্যার পর সে ভবনের দোতলায় প্রচণ্ড কান্নাকটি হৈ চৈ শুনতে পেলাম। সারাদিন পর আবাসস্থলে সবে এসে বসেছি। কান্না হৈ চৈ শুনে সবাই সেদিকে ছুটল। কৌতুহলের বলে আমিও সেদিকে গেলাম।

ফার্মহাউজের মাঝের এই বাড়িটি আসলে বাড়ির মধ্যে আর একটা বাড়ি। একট গেট পেরিয়ে প্রাচীর ঘেরা এই বাড়িতে ঢুকতে হয়। আমরা গেটের বাইরে একটা দূরত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের লোকদের বলাবলিতে জানলাম, মালিকের মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গতকাল বিকেলে হামবুর্গের রাজকীয় চিকিৎসালয়ে মাসখানেক চিকিৎসা নিয়ে ফিরেছে সে। আজই আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ভীষণ মাথাব্যথা। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। আগেই শুনেছিলাম, মালিকের এই মেয়ে ক্যাথারিনার স্বামী একজন নাইট, ১২২৮ সালে শুরু হওয়া ষষ্ঠ ক্রুসেডে যোগ দিয়ে তিনি নিহত হয়েছেন। এই সময় ঘোড়ার গাড়িতে একজন ডাক্তার আসতে দেখলাম। ডাক্তার ভেতরে চলে গেল। আমি চলে এলাম। আধাঘন্টার মত পার হয়ে গেল। আমি ফার্মহাউজের পাশে ফার্মের গরুগুলো সামলাচ্ছিলাম। আবার হৈ চৈ কানে এল, দৌড়াদৌড়ি দেখতে পেলাম। সেই সাথে মালিকের উচ্চকন্ঠ। কৌতুহলবশেই আমরা ছুটে গেলাম সেই বাড়ির দিকে। শুনলাম, ডাক্তার অপারগতা প্রকাশ করে চলে গেছেন। বলে গেছেন, রাজকীয় চিকিৎসালয়ের ডাক্তার যে ওষুধ দিয়েছেন, তার বাইরে কোন ওষুধ নেই। সেই ওষুধে যখন কাজ করেনি, তখন আর করার কিছু নেই। রাজকীয় চিকিৎসালয়ের ডাক্তারের দেয়া ওষুধ খেতে হবে এবং ঈশ্বরকে ডাকতে হবে।

মালিক এ সময় বাইরে বেরিয়ে আসছিলেন। বিপর্যস্ত তার চেহারা। বেদনায় নীল তার চোখ মুখ। একমাত্র সন্তান মেয়েকে খুব ভালোবাসেন তিনি।

মালিক গেটে এসে গেটের পাশে দাঁড়ানো তার সেক্রেটারিকে বললেন, তুমি গাড়ি তৈরি করতে বল। ক্যাথরিনাকে আবার রাজকীয় চিকিৎসালয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার ভেতরে কি যেন হয়ে গেল। ডাক্তার ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর আমার মধ্যে যেন তীব্রভাবে জেগে উঠল। হঠাৎ কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মালিক, রোগটা কি আমি দেখতে পারি?'

মালিক বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আমার দিকে ঘুরল। তার চোখ-মুখ অপমানে কালো হয়ে গেছে। দু'চোখ দিয়ে তার আগুন ঝরছে। তীব্রকন্ঠে বলে উঠল, 'এতবড় স্পর্ধা..!'

কিন্তু হঠাৎ করেই তার কন্ঠ থেমে গেল। তার চোখ-মুখ সহজ হয়ে এল। নিভে গেল চোখের আগুন। মাথা নিচু করল। পরক্ষণেই মাথা তুলে বলল, আমার অন্য কোন শ্রমিক-কর্মচারি-ক্রীতদাস এমন কথা বললে তার আমি শিরচ্ছেদ করতাম। কিন্তু আমি দেখে আসছি তুমি সবার চেয়ে ভিন্ন। তুমি মিথ্যা কথা বল না, কাজে ফাঁকি দাও না, খাবার যা পাও, তার বেশি কোন দাবিও তোমার নেই। সবাইকে আমি চিনি, কিন্তু তোমাকে চিনতে পারিনি। তাই তুমি বেঁচে গেলে। কিন্তু বল, কেন তুমি এই কথা বললে? নিশ্চয় জান রাজকীয় চিকিৎসকের চিকিৎসাও ব্যর্থ হয়েছে।'

'মালিক, কোন দুই ব্যক্তির বুদ্ধি, চিন্তা, দৃষ্টিকোণ সমান নয়। আর যে ঈশ্বর রোগ দিয়েছেন, তিনি তার ওষুধও দিয়েছেন।' বললাম আমি।

মালিক কিছুক্ষণ আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন। তিনি কি যেন আমার মধ্যে খুঁজে পেলেন। তারপর বললেন, 'এস।' বলেই তিনি চলতে শুরু করলেন। আমিও তার পিছু পিছু চললাম। উঠলাম দোতলায়। তাঁর এই দোতলায় ওঠা তাঁর পরিবারের বাইরের কারো জন্যে এটাই বোধ হয় প্রথম।

দোতলার একটা ঘরে তিনি ঢুকলেন। মিনিট খানেক পরে বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকলেন। ঢুকলাম সেই ঘরে বিরাট সুসজ্জিত ঘর। দেখে কোন শাহবেগম বা শাহজাদীর ঘর বলে মনে হলো। ভাবলাম ফার্মহাউজের ঘর যদি এমন হয়, তাহলে আসল বাড়ির ঘরটা কেমন? বিধবা মেয়েকে মালিক কত ভালোবাসেন, এটা বোধ হয় তারই প্রমাণ।

মালিকের মেয়ের গোটা শরীর চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। বালিশে মুখ গুঁজে সে চিৎকার করছে, ছটফট করছে। তার মাথার পাশে বসে আছেন মালিকের স্ত্রী। তিনি যখন আমার দিকে তাকালেন, মনে হলো ডুবন্ত মানুষের মত কোন সহায় যেন তিনি হাতড়াচ্ছেন। তিনি মেয়ের মাথার যে পাশে বসে আছেন, তার বিপরীত দিকে মালিকের মেয়ে ক্যাথারিনার মাথার পাশে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম।

মেয়েটিকে মাথাগুঁজে ছটফট করতে দেখে আমি আশান্বিত হয়েছিলাম। যে সন্দেহটা আমার মনে উঁকি দিয়েছিল সেই সন্দেহটাই তাহলে ঠিক?

আমি মালিকের দিকে তাকালাম। বললাম, 'মালিক ওকে চিৎ হয়ে শোয়াতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গেই মালিকের স্ত্রী তার মেয়েকে বলল মা একটু চিৎ হয়ে শুতে হবে।' বলে নিজে তাকে চিৎ হতে সাহায্য করতে গেল।

মেয়ে ক্যাথারিনা চিৎকার করে বলল, 'আমি আর ওষুধ খেতে পারবো না। আমার মাথার সাথে এখন পেটও জ্বলতে শুরু করেছে। আমি মরে যেতে চাই, আমাকে মরতে দাও।'

মালিক গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর স্ত্রীর পাশেই। সে এগিয়ে গেল। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, মা আমার, সোনা মা, আমরাও যে কষ্ট পাচ্ছি। একটু ঘুরে শোও। ঈশ্বরের প্রতি ভরসা রাখ মা।'

'কত ভরসা রাখবো বাবা, যতই দিন যাচ্ছে, অসহ্য হয়ে উঠছে যন্ত্রণা। রাজবৈদ্যও তো চেষ্টার কম করলেন না। এই রোগে আমার মৃত্যুই বোধ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছ। তার ইচ্ছাই পূরণ হোক। আমি মরতে চাই।' বলল মালিকের মেয়ে ক্যাথারিনা। বলে বালিশে আবারও বেশি করে মুখ গুঁজল।

হঠাৎ করেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'মানুষ মরণশীল। সুস্থ ও অসুস্থ দুই অবস্থাতেই মানুষ মরতে পারে। মৃত্যুর জন্যে অসুস্থতা জিইয়ে রাখার প্রয়োজন হয় না। আর ঈশ্বরের বিধান হলো, রোগ হলে চিকিৎসা করাতেই হবে।'

এক ঝটকায় মেয়েটি ঘুরে উঠে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। তীব্র কন্ঠে বলল, 'মৃত্যুর জন্যেই কি আমি অসুস্থতা জিইয়ে রাখছি?' আমি একটা ছোট্ট বাউ করে বললাম, 'স্যরি ম্যাডাম। আমি তা বলিনি, আমি একটা নীতিকথা বলেছি।'

সেই তীব্র কন্ঠেই মেয়েটি বলল, 'রাজবৈদ্য যেখানে ব্যর্থ, এই মাত্র একজন বিখ্যাত ডাক্তারও যেখানে আর কিছু করণীয় নেই বলে চলে গেল, সেখানে একজন ক্রীতদাস চিকিৎসা করতে আসা একটা স্পর্ধা নয় কি!'

'মাফ করবেন ম্যাডাম। প্রত্যেক মানব শিশু স্বাধীন হয়েই জন্মায়, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব তাকে নানা রূপ দিয়ে গড়ে তোলে, ক্রীতদাসও বানায়। রোগটা কি তা দেখতে চেয়েছি, এটা আমার স্পর্ধা নয়, মানুষের প্রতি একটা দায়িত্ববোধ থেকে এটা করেছি। একটা পথের শিশু হলেও আমি এটাই করতাম।' বললাম খুব নরম, কিন্তু অনড় কন্ঠে।

মালিকের মেয়ের চোখ দু'টি বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে। তার পলকহীন চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ হলো। অবাক হয়ে কি যেন সন্ধান করছে সে আমার মধ্যে। ধীরে ধীরে তার পলকহীন চোখ বুজে গেল। নীরব হয়ে গেল সে। বুঝা যাচ্ছে, দাঁতে দাঁত চেপে সে তার অসহ্য যন্ত্রণা চাপা দেবার চেষ্টা করছে। আমি মেয়েটির মাথার আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। আমি ঝুঁকে পড়ে তার দু'চোখ থেকে যে ধমনীগুচ্ছ মাথার দিকে চলে গেছে, তার ভেতর থেকে দুই প্রধান ধমনী খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলাম। তার শ্বেত-শুভ্র কপাল বেদনায় আরক্ত হয়ে গেছে। দুই চোখের দুই কোণার দূরত্ব বিবেচনায় রেখে আনুমানিক হিসেব থেকে সে দুই ধমনীর অবস্থান ঠিক করলাম। তারপর মালিক-পত্নীর দিকে চেয়ে বললাম, 'মা, আপনি আপনার দুই বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঠিক এই দুই জায়গা মাঝারি শক্তিতে চেপে ধরে রাখুন।'

মালিক-পত্নী তাকাল মালিকের দিকে। বলল, 'আমি বোধ হয় ঐভাবে ধরতে পারব না।'

আলগার, ব্যাপারটা তুমিই ভালো বুঝবে। কাজটা তুমিই করো।আমার দিকে তাকিয়ে বলল মালিক।

আমি তার মাথার পাশে ভালোভাবে বসে দুই হাতের দুই বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বিসমিল্লাহ বলে সেই দুই ধমনী চেপে ধরলাম।

উপুড় হয়ে বালিশে তার মাথা গুঁজে থাকা, তার চোখ-মুখের রং ইত্যাদি দেখে আমার প্রাথমিক ধারণা হয়েছিল তার যন্ত্রণার উৎস মাথা নয়, চোখ। যদি তাই হয় তাহলে চোখ থেকে উপরে ওঠা প্রধান ধমনী দু'টি নির্দিষ্ট পরিমাণে চেপে ধরলে ব্যথার উপশম হবে। আল্লাহর রহমতে তাই হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মুখের অবস্থা সহজ হয়ে গেল। ধমনী দু'টি চেপে রেখে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। আনন্দের সাথে দেখলাম, তার মুখে প্রশান্তি ও একটা শিথিলতার ভাব নেমে এসেছে। আমি তার কপাল থেকে হাত তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মালিকের দিকে চেয়ে বললাম, 'এর সমস্যা মাথায় নয়, চোখে। চোখের সমস্যার কারণেই তাঁর মাথার যন্ত্রণা। চোখ থেকে মাথার দিকে উঠে যাওয়া প্রধান ধমনী দু'টোকে আমি যখন চেপে রেখেছিলাম, তখন দেখেছি তার মাথার যন্ত্রণা কমে গেছে। আমি ওর চোখ দু'টি একটু দেখতে চাই।

মালিক ও মালিক-পত্নী উভয়েরই চোখে-মুখে অপার বিস্ময়। মালিক এগিয়ে গেলেন মেয়ের দিকে। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'মা একটু চোখ খোল। এখন কেমন মনে করছ মা?'

চোখ খুলল মেয়ে ক্যাথারিনা। তাকাল বাবার দিকে। বলল, যন্ত্রণা প্রায় ছিলই না। আঙ্গুলের চাপ তুলে নেবার পর মনে হচ্ছে একটু একটু করে বাড়ছে যন্ত্রণা।' খুশি হলেন ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক, আমার মালিক। বললেন, 'তাহলে তো আলগার ঠিকই বলেছে। সে চোখ দেখতে চায়, চোখটা দেখাও মা।' বলে একটু সরে দাঁড়ালেন মালিক।

আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'প্লিজ ম্যাডাম, খাটের এ পাশে এসে পিঠের তলায় বালিশ দিয়ে খাটে হেলান দিয়ে একটু বসুন।'

কোন কথা না বলে খাটে হেলান দিয়ে বসল সে। আমি এগিয়ে গিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে তার চোখ দু'টি পরীক্ষা করলাম। দুই আঙ্গুলে চোখ ফাঁক করে চোখের আইবল বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করলাম। কিন্তু আমি যেট দেখতে চাই বুঝতে চাই, সেটা তেমনটা হলো না।'

আমি দাঁড়িয়ে একটু সরে এসে মালিককে বললাম, 'হাতখানেক লম্বা কিছুটা সরু একটা লোহার বা কাঠের কিংবা বাঁশের সোজা চোঙা দরকার।'

'চোঙা দিয়ে কি হবে?' বললেন মালিক।

'চোখ পরীক্ষায় চোঙার ভেতর দিয়ে যাওয়া নিয়ন্ত্রিত আলোর শক্তিশালী ফোকাস ভালো কাজ দেয়।' আমি বললাম।

'হ্যাঁ আছে, আনছি এখনই।'

উনুনে বা স্বর্ণকারের কয়লার আগুন উস্কে দেয়ার জন্যে যে সরু চোঙা ব্যবহার হয়, সে চোঙাই তিনি নিয়ে এলেন। খুশি হলাম আমি।

চোঙার এক মাথা আমি ক্যাথারিনার খোলা চোখের উপর রেখে অন্য মাথায় পাওয়ার ফুল লন্ঠনের আলোর শিখা সেট করলাম, যাতে আলো অন্য দিকে বিচ্ছুরিত হবার সুযোগ না পেয়ে চোঙার সুড়ঙ্গপথে চোখের উপর গিয়ে কেন্দ্রীভূত হতে পারে।

সেই আলোতে ক্যাথারিনার দুই চোখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করলম। দু'টো জিনিস পেলাম।এক, দুই চোখেরই সূক্ষ্ম ধমনীর গুচ্ছ আহত হয়েছে এবং রক্তের সূক্ষ্ম জমাট বিন্দুর সৃষ্টি হয়েছে। দুই চোখেরই আইবলের রেদপেনসিভ নয় যথেষ্ট পরিমানে। আইবলের কিছু টিস্যু শুকিয়ে গিয়ে চোখের জীবন্ত সত্তাকে বাধাগ্রস্ত করারই লক্ষণ এটা। চোখের এই পরীক্ষা শেষ করে আমি বললাম মালিককে উদ্দেশ্য করে, 'দুই চোখের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধমনী ড্যামেজড হয়েছে এবং দুই আইবলের কিছু টিস্যু শুকিয়ে গেছে।'

মালিক ও মালিক-পত্নী অপার বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। আমার কথায় তাদের চোখে-মুখে আতংকেরও সৃষ্টি হলো। বলল মালিক, 'তাহলে এখন উপায় আলগার?'

'মালিক, আমার দেয়া ওষুধ যদি খাওয়ানো বা ব্যবহার ঠিক মনে করেন, তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারি। এই রোগের চিকিৎসা আছে মালিক।' আমি বললাম।

মালিক ও মালিক-পত্নী দু'জনরই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মালিকের মেয়ে ক্যাথারিনা চোখ বন্ধ করে তার কপালের সেই বিশেষ স্থান দু'টো চেপে ধরে

বসেছিল। মালিক বলল, 'আলগার তুমি রোগ ধরতে পেরেছ এবং ঠিকভাবেই ধরেছ। তাই তোমার ওষুধই চলবে।'

'ঠিক আছে মালিক, ওষুধ যেটা দরকার, তা তৈরি করতে সময় লাগবে। বনজ কিছু ওষুধের সাথে কিছু দুর্লভ অনুপান যোগাড় করতে হবে। সেটা পরে করব। আপাতত চোখে দেয়ার মত একটা ওষুধ পাঠাচ্ছি। সেটাতে চোখের ক্ষতিপূরণ না হলেও যন্ত্রণা কমে যাবে। আমাকে একটা পরিষ্কার শিশি দিন। ওষুধটা দিনে চার পাঁচ বার এক ফোঁটা করে চোখে দিতে হবে। চোখে কোন চাপ দেয়া যাবে না, শুয়ে থাকতে হবে। ঘরে তীব্র নয়, ঠাণ্ডা আলো থাকবে।'

'আমি শিশি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার ওষুধ পাওয়ার পর আমরা ক্যাথারিনাকে বাড়িতে নিয়ে যাব। সকালে আমি ওষুধের অনুপান কি কি কিনতে হবে, তা তোমার কাছ থেকে জেনে নেব।' বললেন মালিক।

'ঠিক আছে মালিক, আমি চলি।' বলে আমি চলে এলাম।

এসেই আমি ফার্মহাউজের বাগান থেকে ইউনানি ওষুধ বিজ্ঞানের জীবাণুনাশক, বেদনানাশক, স্নায়ু শীতলকারক এবং চক্ষুকোষের শক্তিবর্ধক একটা গাছের কিছু পাতা ও ফুল জোগাড় করে আনলাম। রস করে মালিকের পাঠানো শিশিতে করে পাঠিয়ে দিলাম। আমি তখন শুয়ে পড়েছি। আমার সাথী কয়েকজন শ্রমিক হুড়মুড় করে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল। সমস্বরে বলে উঠল, 'ওস্তাদ, তোমার ভাগ্য খুলেছে। তোমার প্রমোশন হয়েছে। তোমাকে আর এই ফার্মে কাজ করতে হবে না, এই ফার্মহাউজেও থাকতে হবে না। মালিকের বাড়িতে তোমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।'

কথাগুলো আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো না। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় শুনলে?'

'শুনব আর কোথায়। খোদ মালিক যাবার সময় এ কথা তার শ্যালককে বলে গেছে, 'কালকে সকালেই আলগারকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে। ব্যাবস্থা করেছি, ওখানেই সে থাকবে।' শুনেই মালিকের শ্যালক সাহেব প্রতিবাদ করলেন, আলগার শুধু কাজই করতো না, কাজ করাতোও সে। সে সাথে থাকলে শ্রমিকদের কাছ থেকে অনেক বেশি কাজ পাওয়া যায়। সে গেলে ফার্মহাউজের

ক্ষতি হবে।' 'ফার্মহাউজের কাজের জন্যে নয়, এখানে তাকে পাঠিয়েছিলাম একটা শাস্তি হিসেবে। সেটা তার প্রতি অবিচার হয়েছে। জান তোমার বোন কি বলছে, আজকেই এখন থেকে তাকে আমাদের বাড়িতে ট্রান্সফার করতে হবে।' এরপর শ্যালক সাহেব আর কথা বলেননি।'

মালিকের বাসায় আমার আরেক জীবন শুরু হলো। সেখানে আমাকে কোন কায়িক পরিশ্রম করতে হলো না। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো, বাড়ির স্টাফদের কাজ ঠিকমত হচ্ছে কি না দেখা এবং তা করিয়ে নেয়া। কোন কিছু ঘটলে তা মালিক বা মালিক-পত্নীকে অবহিত করা। আমার থাকার জায়গা দোতলায় সিঁড়িমুখের একটা ঘরে। বাড়ির স্টাফ কর্মচারিরা সবাই থাকে নিচলতায়। মালিকের সেক্রেটারি বেনেডিক্টের কাছে শুনেছি, মালিক আমার থাকার জায়গা এক তলারই একটা ভালো ঘরে করেছিলেন। কিন্তু মালিক-পত্নী রাজি হননি। তিনি বলেছেন, 'ছেলেটা আমার মেয়ের চিকিৎসা করছে, এটাই শুধু নয়, ছেলেটির কথা-বার্তা, কয়েক মাসের আচার-ব্যবহার থেকে মনে হচ্ছে সে শুধু শিক্ষিত ও ভদ্রই নয়, মানুষ হিসেবেও অনেক বড়। দেখনা মাত্র কয়েক মাসেই ফার্ম হাউজের সবাইকে নিজের ভক্ত বানিয়ে ফেলেছে। শুনেছি, সবাইকে ভালোবেসে, সবার পাশে দাঁড়িয়ে, সবার জন্যে কাজ করেই সে সবার ভক্তি-ভালোবাসা অর্জন করেছে। ক্রীতদাস হয়েছে বলেই তার সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। তাকে সম্মান দিলে আমরা ছোট হয়ে যাব না!' এসব কথা বলে মালিক-পত্নী দোতলার ঐ ঘরটায় আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। এসব আমার শোনা কথা। মালিক কিংবা মালিক-পত্নী নিজ মুখে আমাকে কখনও কিছু বলেননি।

শিশিতে আমি যে তরল ভেষজ-রস সে রাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা ব্যবহার শুরু করেই মালিক-তনয়া ক্যাথারিনা একমাসের মধ্যে প্রথম বারের মত শান্তিতে ঘুমাতে পেরেছে। মালিক দু'দিনের মধ্যেই দুর্লভ উপাদান ও অনুপানগুলো আমাকে এনে দিয়েছিলেন। সেসব উপাদানের সাথে কিছু বিস্ময়কর গাছ-গাছড়ার মূল, পাতা, ফুলের সমন্বয়ে ওষুধ তৈরি করে অনুপানগুলোর সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশিয়ে সময়ে সময়ে তা খাওয়ানোর ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে যায়। মালিক ও মালিক-পত্নী একদিন ডেকে

আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন আমি কি চাই, তা তারা আমাকে দেবেন। আমি বলেছিলাম, 'আমি কোন বিনিময় চাই না। আর বিনিময় চাওয়ার অধিকার ক্রীতদাসের থাকে না। আপনারা আমার জন্যে যথেষ্ট করেছেন। আমি তার জন্যে কৃতজ্ঞ।'

বলে আমি চলে আসছিলাম। দেখলাম সিঁড়ির মুখের এক পাশে একটা পিলারের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে মালিকের মেয়ে ক্যাথারিনা। তাকে দেখে আমি সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

সেদিনই সন্ধ্যার পর আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছিলাম। পেছন থেকে নারীকন্ঠের আওয়াজ শুনলাম, 'শুনুন।'

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম সিঁড়ির মুখে মালিকের মেয়ে ক্যাথারিনা দাঁড়িয়ে। আমি এক ধাপ এগিয়ে মাথা নিচু করে বললাম, 'আমাকে ডাকছেন?'

'হ্যাঁ।' বলল মালিকের মেয়ে ক্যাথারিনা।

'কিছু আদেশ আছে, বলুন?' আমি বললাম।

'আদেশ নয়, অভিযোগ আছে।' বলল ক্যাথারিনা।

'অভিযোগ?' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, অভিযোগ! আপনার বিরুদ্ধে!' বলল ক্যাথারিনা।

'তাহলে মালিককে বলুন। আমি কোন দোষ তো করতেই পারি।' আমি বললাম।

'কোন ক্রীতদাসের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। আমার অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে। তাই মালিককে বলবার প্রয়োজন নেই।' বলল ক্যাথারিনা।

'ক্রীতদাস এবং আমি একই সত্তা। ঠিক আছে...।'

আমার কথার মাঝখানেই সে বলে উঠল, 'কিন্তু সেদিন আপনি বলেছিলেন ক্রীতদাস পরিস্থিতির সৃষ্টি। পরিস্থিতি যা সৃষ্টি করে তা আসল নয় এবং স্থায়ীও নয়। সুতরাং তা মানব সত্তার অংশও নয়।' বলল ক্যাথারিনা।

'ঠিক আছে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা বলতে পারেন।' আমি বললাম।

'সেদিন আপনাকে ক্রীতদাস বলেছিলাম। তাই আজ আপনি নিজেকে ক্রীতদাস বলে বিনিময় প্রত্যাখ্যান করে আমার উপর প্রতিশোধ নিলেন। কিন্তু

আপনি জানেন না সেদিন থেকেই আমি মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছি। মাফ চাইবার সুযোগ খুঁজছি। এর মধ্যেই আপনি...।'

কথা গলায় আটকে গেল ক্যাথারিনার। গলাটা হঠাৎ তার ভারি হয়ে উঠেছিল।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আপনার ব্যাপারটাকে এভাবে দেখা ঠিক নয়। ক্রীতদাস পরিচয় আমার সত্তার অংশ হোক বা না হোক, পরিস্থিতিগত কারণে আমি ক্রীতদাস একথা তো ঠিক? এটা তো অনস্বীকার্য বাস্তবতা? সুতরাং ক্রীতদাস বলায় আমি কিছুই মনে করিনি, মনেও রাখিনি বিষয়টা। অতএব প্রতিশোধের বিষয় হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

কিন্তু আমি তো অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি। আপনি আমাকে মাফ না করলে আমার এ যন্ত্রণা যাবে না।' বলল ক্যাথারিনা।

'না, আপনি আমার মনিব-কন্যা। আপনি এভাবে বলতে পারেন না।' বললাম আমি।

'আমি মনিব-কন্যা নই। আমি একজন মানুষের কন্যা ক্যাথারিনা।' বলল ক্যাথারিনা।

'ধন্যবাদ। কিন্তু সেদিন মানুষের কন্যা ক্যাথারিনা আমাকে ক্রীতদাস বলেননি, বলেছিলেন মনিব-কন্যা ক্যাথারিনা।' আমি বললাম।

'আপনি অনেক বিজ্ঞ, জ্ঞানী। কথায় কিংবা কোন দিক দিয়েই আমি আপনার সাথে পারব না।সেদিনের মনিব-কন্যাকেও আপনি মাফ করুন।' বলল ক্যাথারিনা। কন্ঠ তার আবার ভারি হয়ে উঠেছিল।

মনিব-কন্যার সাথে এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলা আমার মানায় না। আর তার এই পরিবর্তন আমার মনে নতুন এক আশংকারও সৃষ্টি করল। বুকটা আমার কেঁপে উঠল। আমি আর কথা না বাড়াবার জন্যে বললাম, 'ঠিক আছে ম্যাডাম। আপনার ইচ্ছা, অনুরোধ আমার কাছে আদেশ। আমি মাফ করলাম, যদিও সেদিন তা বলা আপনার জন্যে অন্যায় কিছু ছিল না। আপনার মহত্ত্বের জন্যে ধন্যবাদ।'

বলে আমি চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালাম। পেছন থেকে মনিব-কন্যা ক্যাথারিনা বলে উঠল, 'শুনুন, এটা আমার মহত্ত্ব নয়, একজনের মহত্ত্বের কাছে, বিরাটত্বের কাছে এক দুর্বিনীত হৃদয়ের আত্মসমর্পণ।'

মনিব-কন্যার কন্ঠ ছিল পরিষ্কার, স্থির, শান্ত কিন্তু শক্ত, তার কথাগুলো বিশ্বাসে দৃঢ়। কন্ঠের সেই ভারিভার এখানে ছিল না। এ যেন এক সিদ্ধান্তের পরোয়াহীন প্রকাশ।

আমার হৃদয়টা আবার কেঁপে উঠল। পরিচিত সেই আশংকা আমার হৃদয়ে মাথা তুলল। আমি দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে মনিব-কন্যার কথার প্রতিবাদে কিছু বলার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখলাম তিনি চলে যাচ্ছেন, আস্তে, শান্ত ও শক্ত পদক্ষেপে।

তাকে ডাকা আমার জন্যে অন্যায় মনে করলাম। আমি নেমে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। দিন আমার এগিয়ে চলল ভিন্নতরভাবে। আমি মালিকের বাড়ির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দেখা-শোনার কাজ করি। কিন্তু মালিক আমাকে কোন আদেশ করেন না। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কোন বিষয় নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি আমার পরামর্শ চান অথবা বলেন তুমি যেটা ভালো মনে করো সেটাই করো। মনিব-কন্যা ক্যাথারিনার আট নয় বছরের ছেলে বেরুন বেকার প্রায়ই আমার কাছে আসে, নিষেধ সত্ত্বেও আংকেল বলে ডাকে।১৫ দিন ধরে নিয়মিত সে আমার কাছে পড়তে আসে সন্ধ্যার পর। মাসখানেক আগে সে একদিন বলে, 'আংকেল, মা আমাকে আপনার কাছে পড়তে বলেছেন। মা বলেন, রাজার স্কুলে যা শেখানো হয় তা যথেষ্ট নয়। দেখুন, মা কি পড়াতে বলেছেন।' বলেই সে আমার হাতে একখণ্ড কাগজ তুলে দেয়। কাগজে দেখলাম 'যা পড়ানো হচ্ছে' শিরোনামে তিনটি সাবজেক্টের নাম লেখা। সাবজেক্টগুলো হলো, জার্মান ও ল্যাটিন ভাষা, ক্যাথলিক থিওলজি ও চার্চের ইতিহাস। এরপর 'যা পড়ানো দরকার' শিরোনামেও তিনটি সাবজেক্টের নাম লেখা, সাবজেক্টগুলো হলো, অংক, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও পৃথিবীর ইতিহাস। আমি এই সাবজেক্টগলোর নাম দেখে বিস্মিত হলাম। সবগুলোই ইউরোপের জন্যে নিষিদ্ধ সাবজেক্ট। জার্মানসহ ইউরোপের কোন দেশেই অংক-বিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও দুনিয়ার ইতিহাস

পড়ানো হয় না। আমি বেরুন বেকারকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই বিষয়গুলোর নাম কি তোমার মা লিখেছেন?'

'হ্যাঁ, মা তো লিখেছেন। তাছাড়া কে লিখবেন?' বলল বেরুন বেকার।

'তোমার মা এ বিষয়গুলো পড়েন, জানেন?' আমি বললাম বেরুনকে।

'মা এগুলো জানেন, পড়েন কি না জানি না। তবে মা'র অনেক বই আছে। মা তো পড়েই সময় কাটান।' বলল বেরুন বেকার।

ডাক্তারের চেতনা থেকেই বোধ হয় আমার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'চোখের অসুখ থেকে উঠেছেন, এখন তোমার মাকে কিছুদিন বই পড়া বন্ধ রাখতে হবে।'

'তাই? তাহলে মাকে গিয়ে বলি।' বলেই উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল বেরুন বেকার। কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাকে পড়াবেন কবে থেকে, মা জিজ্ঞাসা করলে কি বলব আংকেল?'

'ঐ কঠিন বিষয়গুলো কি আমি পড়াতে পারি?' বললাম আমি।

'ঠিক আছে বলব মাকে।' বলে আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল বেরুন বেকার। এর কয়েকদিন পর মালিক আমাকে ডেকে বললেন, 'আলগার, আমার নাতি বেরুনকে একটু কষ্ট হলেও পড়াও, ক্যাথারিনার অনুরোধ। তার বিশ্বাস, তুমি স্পেনের মানুষ। বেরুনকে খুব ভালভাবে তুমি পড়াতে পারবে। আমরা যাই বলি, মুসলিম স্পেন তো অংক বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ সব বিজ্ঞান , ইতিহাস, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার বিস্ময়কর কেন্দ্র। আমরা জানি, ইউরোপে আমরা অংক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, চিকিৎসা ইত্যাদির চর্চা নিষিদ্ধ হলেও কিছু কিছু ইউরোপিয়ান ছেলে লুকিয়ে স্পেনে পড়তে গিয়েছে, যাচ্ছে। মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে ভর্তি করে নেবার মত উদারতা দেখিয়ে আসছে।'

পরদিন সন্ধ্যার পর বেরুন বেকারকে আমি পড়াচ্ছি। পড়াতে রাজি হয়ে নতুন বিপদে পড়ে গেলাম। ক্যাথারিনা মাঝে মাঝেই তার ছেলের হাতে বই পাঠায়। বইয়ের স্থানে স্থানে দাগ দিয়ে তার ব্যাখ্যা জানতে চায়। বইগুলোর প্রায় সবই ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক। আমি প্রথম দিকে জানি না বলে এড়িয়ে

যেতাম। ক্যাথারিনা একদিন লিখে পাঠায়, ‘জনাব, একজন তৃষ্ণার্তকে পানি পান করানো কি সবচেয়ে বড় কর্তব্য, সবচেয়ে বড় ধর্ম নয়?’ এরপর আমি আর না করিনি। বইয়ে দাগ দিয়ে পাঠানো তার সব জিজ্ঞাসার জবাবই লিখে পাঠাতাম। চোখের কথা বলে তাকে এত পড়াশোনা এখন না করার জন্যে বেরুন বেকারের মাধ্যমে আবার বলে পাঠিয়েছিলাম। সে লিখে পাঠিয়েছিল, ‘মান্যবর ডক্টর, লেখা-পড়াই তো আমার সাথী। লেখা-পড়া ছেড়ে দিলে রোগ থেকে হয়তো আমি বাঁচবো, কিন্তু আমি মরে যাব।’ আমি আর তাকে কিছু বলিনি। চিঠিটা আমার অবচেতন মনের কোথায় কি যেন বিদ্ধ করে, চিঠির সাথের অদৃশ্য একটা যন্ত্রণা যেন আমার হৃদয়েও সংক্রমিত হয়। দিন এভাবেই চলতে থাকে।

একদিন সকালে আমার ঘরে আমি নাস্তা খেতে বসতে যাচ্ছি, এ সময় মালিকের খাস পরিচারিকা এসে বলে, মালিক আপনাকে স্মরণ করেছেন। তিনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।’

নাস্তা না খেয়ে উঠতে হলো। পরিচারিকার সাথে সাথে চললাম।

পরিচারিকা যেখানে নিয়ে গিয়ে আমাকে পৌঁছালো সেটা তিন তলায় মালিকের পারিবারিক ডাইনিং কক্ষ। ডাইনিং টেবিলে বসে আছেন খোদ মালিক। তার বামপাশে তার স্ত্রী আর ডানপাশে নাতি বেরুন বেকার, বেরুনের পাশে বেরুনের মা ক্যাথারিনা এবং ক্যাথারিনার মামা মালিকের শ্যালক অসরিক রেডওয়ার্ল্ড। নাস্তা তাদের সামনে প্রস্তুত, কিন্তু নাস্তায় কেউ হাত দেয়নি।

এই অবস্থায় তাদের মধ্যে হাজির হয়ে আমি বিব্রত বোধ করলাম। বললাম, ‘মালিক আমি পরে আসছি।’ বলে চলে আসার উদ্যোগ নিলাম।

‘দাঁড়াও আলগার, আমরা তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। তুমি নাস্তার টেবিলে বসবে। কথা বলব এবং একসাথে বসেই নাস্তা করব। বস তুমি।’

মালিকের হুকুম শিরোধার্য। কিন্তু আমার দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফোরিত। এ কি বলছেন উনি! মালিকের খানার টেবিলে বসবে তার ক্রীতদাস! ইসলাম এটা আটশ’ বছর আগে চালু করেছে, কিন্তু ইউরোপে এটা অবিশ্বাস্য। আমি দ্বিধা করছিলাম।

মালিক-পত্নী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন। 'এস বেটা, আমার পাশে বসবে।'

সবার দিকে তাকালাম। দেখলাম, ক্যাথারিনার মুখ নত। আর বেরুন বেকার আনন্দে চামচ দিয়ে প্লেট বাজাচ্ছে। মালিক ও মালিক-পত্নী আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি ধীরে ধীরে মালিকের স্ত্রীর পাশে বসলাম। পরিচারিকা আমার সামনে প্লেট ও কাঁটাচামচ এগিয়ে দিল।'

নাস্তা আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেল। সবাই নাস্তার সাথে পানীয় হিসেবে মদ পান করলেন। রীতি অনুসারে অন্তত আমারও মদ পান করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি তা করলাম না। পরিচারিকা আমাকে লেমোনেড ওয়াটার দিল। আমি মদ পান করছি না দেখে সবাই অবাক হয়েছিল। বিস্ময়ে চোখ তুলে ক্যাথারিনা তাকিয়েছিল আমার দিকে। এই প্রথম সে আমার দিকে তাকাল চিকিৎসা শেষ হওয়ার পর। আমি দেখলাম নাস্তা শেষে সেও মদ পান করল না। তার গ্লাসের মদ গ্লাসেই থেকে গেল। আমি মদ পান করি না দেখে মালিক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার মদ পান না করার কারণ কি? আমি বলেছিলাম মালিক অনুমতি দিলে জবাবটা পরে দিতে চাই। তিনি তা মেনে নিলেন।

নাস্তার পর চা খাওয়া শুরু হলে মালিক বললেন, 'আলগার, দু'টি কথা বলার জন্যে তোমাকে ডেকেছি। প্রথম কথা, তোমার একটা বড় ধরনের সাহায্য প্রয়োজন। গতকাল সকালে আমি সম্রাট চতুর্থ অটো'র দরবারে গিয়েছিলাম। দরবার বসেনি। গোটা রাজপ্রাসাদ বিষাদে ঢাকা। কথায় কথায় জানলাম, সম্রাট চতুর্থ অটোর একমাত্র ছেলে যুবরাজ তৃতীয় হেনরী থিয়োলজী যুদ্ধাবিদ্যা ইত্যাদি শেখার জন্যে রোমে ছিলেন গত দু'বছর। সেখানে এক বছর যেতেই তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সেখানে অনেক চিকিৎসা হয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। সম্পূর্ণ অন্ধ অবস্থায় তিনি গত পরশু বাড়ি ফিরেছেন। এখানকার রাজবৈদ্যরা গত দু'দিন ধরে দেখে অভিমত দিয়েছে, চোখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। দৃষ্টিশক্তি ফেরানো আর সাধ্যের মধ্যে নেই। এই খবরে সম্রাটের প্রাসাদে কান্নার রোল পড়ে গেছে। আমি সম্রাটের সাথে কথা বলেছি। তোমার কথাও আমি

বলেছি তাকে। রাজবৈদ্যরা ব্যর্থ হবার পর কিভাবে তুমি ক্যাথারিনার চোখ সারিয়ে তুলেছ, সেটাও বলেছি আমি তাকে। শুনেই সম্রাট অস্থির হয়ে উঠেছেন তোমাকে তাঁর ছেলে দেখাবার জন্যে। আজই আমি তোমাকে সম্রাটের প্রাসাদে নিয়ে যেতে চাই। তোমার সম্মতি প্রয়োজন।' থামলেন মালিক।

আমি বললাম, 'আপনার সম্মতিই আমার সম্মতি মালিক। আমার ভিন্ন সম্মতির প্রয়োজন নেই। তবে এত বড় বড় চিকিৎসক ব্যর্থ হবার পর আমি সম্রাটের ছেলের চিকিৎসার ব্যাপারে কতদূর কি করতে পারব বুঝতে পারছি না। আপনি কি যুবরাজ তৃতীয় হেনরিকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, দেখেছি আলগার।' বললেন মালিক।

'তার চোখের দিকে খেয়াল করেছেন? চোখ দু'টি কি গর্তে ঢুকে গেছে, না মোটামুটি স্বাভাবিক আছে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম মালিককে।

'আমি তার চোখ দু'টিকে ভালো করে দেখেছি। তুমি যেটা বললে তার চোখ মোটামুটি স্বাভাবিক কি না, হ্যাঁ আমি সে রকমই দেখেছি। চোখ গর্তে ঢুকে যায়নি।' বললেন মালিক।

'যদি তাই হয়, তাহলে চোখের টিস্যু ও ধমনীতে এখনও রস আছে, সেগুলো এখনও সজীব রয়েছে। এটাই আমার কথা।' আমি বললাম।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাকে ধন্যবাদ। ঈশ্বর তোমার কথা সত্য করুন। গতকাল থেকে তার সম্পর্কে শুধু হতাশার কথাই শুনছি। তুমিই প্রথম আশার কথা শোনালে।' বললেন মালিক।

'স্রষ্টার দয়া সম্পর্কে হতাশ হতে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি জীবিতকে মৃত করেন এবং মৃতকে জীবিত করতে পারেন। তার সব দয়া মানুষের জন্যে।' আমি বললাম।

'আলগার তোমাকে যতই দেখছি, ততই বিস্মিত হচ্ছি। এত জ্ঞান তুমি কোথা থেকে পাও?' বললেন মালিক।

'মালিক, সব জ্ঞানের উৎস স্রষ্টা। মানুষের মগজ স্রষ্টার ইচ্ছা প্রকাশের একটা মাধ্যম। এই মাধ্যমের পথ ধরেই মানুষের সকল আবিষ্কার, সকল মহৎ সৃষ্টি।' আমি বললাম।

ক্যাথারিনা আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। বিস্ময়ভরা তার চোখে অনেক প্রশ্ন দেখলাম। মালিকই কথা বললেন, 'সাংঘাতিক কথা বলেছ আলগার। কথাটা সাগরের চেয়েও গভীর। কারণ সাগরের তল আছে। ঈশ্বর তোমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই মালিক আবার বললেন, 'তাহলে আজ বিকেলেই তুমি আর আমি রাজধানীতে যাত্রা করব।' বলে থামলেন মালিক।

কেউ কোন কথা বলল না।

অস্বস্তিকর একটা নীরবতা।

নীরবতা ভাঙলেন আবার মালিক নিজেই। বললেন, 'এবার আমার দ্বিতীয় কথা।'

কথাটা সংগে সংগে শুরু করলেন না মালিক। আবার নীরব হলেন তিনি।

অন্য সবাই আনত দৃষ্টিতে বসে আছে। অস্বস্তিকর নীরবতায় আবার কাটল কিছুক্ষণ। পরিবেশকেও ভারি করে তুলেছে এই নীরবতা।

আবারও নীরবতা ভাঙলেন মালিকই। শান্ত, গম্ভীর কন্ঠে বললেন, 'আলগার, সেদিন তোমাকে কিছু চাইতে বলেছিলাম। তুমি চাওনি। বলেছ ক্রীতদাসদের কিছু বিনিময় চাইবার অধিকার নেই। চলমান ব্যবস্থায় এটা সত্য। কিন্তু আলগার, কোন ক্রীতদাস এতবড় কাজ করার পর কিছু চাইবে না তা একেবারেই স্বাভাবিক নয়, অবিশ্বাস্য। এই অবিশ্বাস্য কাজ করে তুমি প্রমাণ করেছ আমরা যা ভাবতে পারি তার চেয়েও তুমি মহৎ, বড়। এমন মহৎরা কিছু চায় না, দিতে হয় তাদের। চাইবে না বলে তাদের দিতে হবে না, এটা ঠিক নয়। আমরা সেদিন ভুল করেছিলাম। সেদিনও তোমাকে চিনতে ভুল করেছি। সে ভুল আমাদের ভেঙেছে আলগার। সেদিন যা আমাদের না চাইতেই দিয়ে দেয়া উচিত ছিল, সেটা আজ আমরা দিয়ে দিতে চাই। আজ থেকে তুমি মুক্ত আলগার। তুমি আর কারও ক্রীতদাস নও। তুমি এখন আমাদের ছেলে সন্তানের মত। আমাদের তো কোন ছেলে সন্তান নেই!' থামলেন মালিক। শেষের দিকে তার কন্ঠ কান্নারুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আশার চেয়ে বড় কিছু ঘটলে, মানুষ যেমন বাকরুদ্ধ, বিহ্বল হয়ে যায়- আমারও সেই অবস্থা হলো। মুক্ত মানুষ থাকার যে কি স্বাদ তা ভুলেই গিয়েছিলাম, চেষ্টাও করেছি অতীতকে ভুলতে। আজ মুক্তির সংবাদ পাওয়ার পর সেই অতীত বাঁধভাঙা জোয়ারের মত আমার হৃদয়ে এসে আছড়ে পড়ল। সেই আদরের কর্ডোভা, সেই প্রিয় আমার বাড়ি, প্রিয়তমা স্ত্রী, প্রাণাধিক সন্তান, তাদের ও আমার পরিণতি, সবই এক সঙ্গে এসে আমার মনের দুয়ারে আছড়ে পড়ল। দু'চোখ থেকে দরদর করে নেমে এল অশ্রুর ধারা। ভুলে গিয়েছিলাম পারিপার্শ্বিকতা। কতক্ষণ কেঁদেছিলাম জানি না। পিঠে একটা মমতা ভরা হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। চমকে উঠে নিজেকে সামলে নিলাম। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, মালিক-পত্নীর হাত আমার পিঠে। তার চোখে রাজ্যের মমতা।সবার উপর দিয়ে আমার চোখ ঘুরে এল। দেখলাম মালিকের চোখে প্রশান্তির উজ্জ্বলতা। আর ক্যাথারিনের দৃষ্টি আনত। তার দুই রক্তিম ঠোঁটে খেলা করছে স্বচ্ছ হাসি। তবে দু'চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুর দুটি ধারা। হাসছে ক্যাথারিনার মামা আমার দিকে চেয়ে। বেরুন বেকার একেবারেই নির্বাক।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। নতমুখে ধীর কন্ঠে বললাম, আমার মুরুব্বি, আমার গুরুজন, আমার মহৎহৃদয় মালিকের প্রতি আমার হৃদয়ের অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমি যা করেছি তা খুবই সামান্য, তিনি যা করলেন তা অনেক বড় হৃদয়ের পরিচয়। স্রষ্টা তাঁর মঙ্গল করুন। এই জগৎ ও পরজগতে স্রষ্টা অনেক বড় বিনিময় তাকেঁ দান করুন। আমার পরিবার থাকলে তারা আজ ছুটে আসত তাঁকে স্বাগত জানাতে, তাঁকে মাথায় তুলে নিতে। আমার তো কেউ নেই, সবহারা মানুষ আমি। তাই আমার একার সামান্য কয়েকটা কথা ছাড়া দেয়ার বা করার আমার কিছু নেই। এই পরিবারের সবার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তারা প্রকৃতিগতভাবেই ভালো মানুষ। তাদের কাছে আমি ভালো ব্যবহার পেয়েছি। অবস্থাগত কারণ আমিই বরং কিছু মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছি। আপনাদের সবাইকে অন্তরের অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ। বললাম আমি।

‘তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আলগার। তুমি মহৎ বড়, বিজ্ঞ বলেই সবাইকে মহৎ ভাবতে পারছ। আলগার এখন একটা অনুরোধ করতে পারি?’ বললো আমার সাবেক মালিক।

আমি বললাম, ‘আপনি গুরুজন, অনুরোধ নয়, আদেশ করুন।’

‘তুমি যে মিথ্যাচারের কথা বললে, সেটা বুঝলাম না। আর আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি তা হলো, তোমার পরিচয় আমরা জানি না। তুমি যেটুকু পরিচয় দিয়েছিলে তা আমার কাছে তখনই বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। তোমার আচরণ, কথা-বার্তা কোন কিছুর সাথেই তোমার পরিচয় মেলে না। জানতে পারি কি সব কথা?’ বললেন মি. ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক, আমার অভিভাবক।

একটু ভাবলাম। লুকিয়ে তো আর লাভ নেই।তবে মুসলিম পরিচয় এখন বলতে চাই না।যুবরাজের চিকিৎসা তাতে বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

পরক্ষণেই আবার ভাবলাম, আবার মিথ্যাচারের আশ্রয় নেব কেন? সত্য আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাব।

আমার জবাব দিতে দেরি হচ্ছে দেখেই বোধ হয় আমার সাবেক মালিক ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক বলে উঠলেন, ‘থাক আলগার, অসুবিধা বা বলতে না চাইলে বলো না। এখন...।’

আমি তার কথার মাঝখানেই বললাম, ‘স্যরি। বলতে চাই না তা নয়, অসুবিধাও কিছু নেই।’

বলে একটু থেমে আমি শুরু করলাম, ‘আমার নাম ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর। আমার জন্ম স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে। আমার বাবা কর্ডোভার সুলতানের প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। কর্ডোভা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে ঐ হাসপাতালেই ডাক্তার হিসেবে ১২৩০ সালে চিকিৎসক জীবনের শুরু করি। আমি ছাত্র হিসেবে যেমন সেরা ছাত্রের গোল্ড মেডেল নিয়ে বেরিয়ে আসি তেমনি চিকিৎসক হিসেবেও সেরা চিকিৎসকের গোল্ড মেডেল পাই ১২৩৬ সালে।’ এই কথাগুলো বলে আমি সংক্ষেপে কিভাবে দেশে বিপর্যয় ঘটল, কিভাবে স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান হারালাম,

কি করে আমি পথে নামলাম, পথ কিভাবে আমাকে জার্মানীতে নিয়ে এল তার কাহিনী বললাম। থামলাম আমি।

সবাই নীরব। সবার চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ। ক্যাথারিনারও। তাদের চোখে বিস্ময় ও বেদনা দু'টোই।

আমি চোখ নামিয়ে নীরব রইলাম।

কথা বলে উঠলেন আমার সাবেক মালিক ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক। বললেন, 'তোমার ও তোমার স্ত্রী সন্তানদের এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্যে আমি ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি আলগার। তোমার এই দু:খের উপর এবং আজকের জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সর্বশ্রেষ্ট কেন্দ্র স্পেনের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের রাজধানী কর্ডোভার সেরা ডাক্তারের উপর কষ্ট ও নির্যাতনের যে বোঝা চাপিয়েছিলাম, চিকিৎসকের সোনাফলা হতে শ্রমিকের যে বেলচা, কৃষকের যে কোদাল তুলে দিয়েছিলাম, তার জন্যে আমি ও আমরা গভীর দু:খ প্রকাশ করছি। তুমি তোমার মুসলিম পরিচয় ও কর্ডোভার চিকিৎসকের পরিচয় গোপন করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ঠিকই করেছিলে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের যে উন্মত্ততা ইউরোপ ও জার্মানীতে চলেছিল তাতে তোমার মুসলিম পরিচয় নিরাপদ ছিল না। প্রথমে তোমার এই পরিচয় পেলে বড় শিকার পেয়েছি বলে আমিও হয়তো তোমাকে হত্যা করে ফেলতাম। কিন্তু অর্ধেক বছরের ছোট্ট সময়ে আমরা তোমাকে নানা অত্যাচার করলেও তুমি তোমার কাজ, কথা, ব্যবহার দ্বারা আমাদের মন জয় করে নিয়েছ। তা না হলে যাই পরিণতি হোক, আমার মেয়েকে দেখানো বা তার চিকিৎসার জন্যে তোমাকে অ্যালাও করতাম না। তোমার প্রতি আমার অনুরোধ আলগার, তোমাকে তোমার পরিচয় ও স্পেনের ডাক্তার হওয়ার পরিচয় এখনও গোপন রাখতে হবে। আলগার, এই মুহূর্তে আমি অনুভব করছি, যে ধর্ম তোমাকে এত সুন্দর, এত মহৎ বানিয়েছে, সেই ধর্ম আমাকে, আমাদেরকেও যেন জয় করে নিচ্ছে। কিন্তু বেটা, ক্রুসেডের আবেগ-উন্মত্ততার সয়লাব এখনও ইউরোপ জুড়ে চলছে। তোমার আসল পরিচয় এখনো নিরাপদ নয়। আমার পরিবারের আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি তারা ছাড়া আর কেউ জানবে না তোমার এই পরিচয়।'

থামলেন আমার অভিভাবক। আমি খুশি হলাম তাঁর কথায়। তিনি ঠিক পরামর্শ আমাকে দিয়েছেন। শুধু দেশ জোড়া নয়, মহাদেশ জোড়া এমন বৈরী পরিবেশে ইসলাম মেনে চলা ও প্রচারের কাজ করতে হলে একটু ভিন্ন, একটু কৌশলী হতেই হবে। আমি বললাম আমার অভিভাবককে লক্ষ্য করে, আবারও আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সঠিক পরামর্শ দানের জন্য। আপনি যে পরামর্শ দিয়েছেন, সেটাই হবে। আমি থামলাম।

আমার পাশ থেকে আমার সাবেক মালিকের পত্নী, যাকে আমি মা বলে ডেকেছি, তিনি বলে উঠলেন, 'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন আজ। আমি বেটা আলগারকে আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আজকের দিনকে খানার এক বিশেষ আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করতে চাই। আর ক্যাথারিনার বাবা নাইট ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিককে অনুরোধ করবো, আমাদের বাড়ি ও ফার্মল্যান্ডের সকল শ্রমিক, কর্মচারি, কর্মকর্তাকে একমাস বেতনের সমপরিমাণ অর্থ উপহার হিসেবে আজ দিয়ে দেয়ার জন্য।'

আমার সাবেক মালিকের স্ত্রী থামতেই আমার অভিভাবক মি. ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক বললেন, 'ধন্যবাদ গ্রিটা, ক্যাথারিনার মা। তোমার দুই প্রস্তাবই আমি আনন্দের সাথে গ্রহণ করলাম এবং সম্রাটের ওখানে যাওয়ার সময় আমি রাত আটটা পর্যন্ত পিছিয়ে দিচ্ছি। বলে দিচ্ছি রাত ৮টায় সম্রাটের ওখান থেকে গাড়ি আসতে।'

'বাবা, মা তোমাদের দু'জনকেই ধন্যবাদ। বিশেষ করে বাবাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি একজন মানুষকে তার মানবিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার মহৎ সিদ্ধান্তের জন্যে। এই সিদ্ধান্ত শুধু তাঁকে মুক্ত করেনি বাবা, আমাদেরকেও মুক্ত করেছে। যে দূর্বহ কালো পাথরটা বুকের উপর চেপে ছিল, তা আজ থেকে নেমে গেল বাবা।' বলল ক্যাথারিনা আনত মুখে। শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে সে কেঁদে ফেলল।

'ধন্যবাদ মা ক্যাথারিনা। ঈশ্বর আমাদের সকলকে সাহায্য করেছেন।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক বললেন, ‘আমরা এখন উঠছি। গ্রিটা, তুমি আলগারকে তিন তলায় তার থাকার নতুন জায়গায় নিয়ে যাও। আর...।’

কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। তার কথার মাঝখানেই কথা বলে উঠল ক্যাথারিনার মামা অসরিক রেডওয়ার্ল্ড। বলল, ‘বৈঠক শেষ হচ্ছে দেখছি? তৃতীয় একটা কথা ছিল আমার।’

‘তোমার আবার কি কথা? বল।’ বললেন আমারা সাবেক মালিক।

‘আপা ঠিকই বলেছেন, শ্রেষ্ঠ দিনগুলোর সর্বশ্রেষ্ঠ দিন আজ। এই মহান দিনের জন্যে উপযুক্ত আরেকটা বড় কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে।’ বলে থামল অসরিক রেডওয়ার্ল্ড।

‘থামলে কেন, বল সে কাজটা কি? তোমার দ্বিতীয় বিয়ের কথা বলবে না তো! তোমার বউ মরে যাবার পর থেকেই কিন্তু পাত্রী খুঁজছি। এখনও পাইনি। বল, কি বলবে।’ বললেন আমার সাবেক মালিক।

‘ঠিক ধরছেন দুলাভাই। বিয়ের কথাই, তবে আমার বিয়ে নয়। আমার স্নেহের একমাত্র ভাগ্নির বিয়ে।’ বলল অসরিক রেডওয়ার্ল্ড।

‘ভাগ্নি মানে? ক্যাথারিনার বিয়ে?’ জিজ্ঞাসা করলেন আমার সাবেক মালিক। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘হ্যাঁ দুলাভাই। আমাদের সকলের প্রিয়, আমাদের শ্রমিক কর্মচারিদের প্রিয় জোসেফ জ্যাকব আলগারের সব কাহিনী আমরা জানলাম। তার স্ত্রী-পুত্র পরিজন কেউ নেই। তিনি সব হারিয়েছেন। তিনি এখন একা। আমরা তাঁকে আমাদের পরিবারের একজন হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমি তার সা্থে ক্যাথারিনার বিয়ের প্রস্তাব করছি। তারা দু’জনেই এখানে আছে। তারা একে অপরকে শুধু চেনেনেই না, জানেনও। এখানে এই আলোচনা হতে পারে।’ থামল অসরিক রেডওয়ার্ল্ড।

সংগে সংগে কেউ কথা বলল না। সবাই নীরব।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। গোটা দেহ মনে কেমন ভাবাবেশের সৃষ্টি হলো। ইদানীং ক্যাথারিনার সামনে পড়লে, তার সাথে যখন কথা বলেছি, সে

সময় মনের দুয়ারে পরিচিত যে শংকা, অস্বস্তির উদয় ঘটত, তা এখন নগ্নভাবে সামনে এসেছে। আসলে সেটা অস্বস্তি ও শংকা ছিল না, সেটা ছিল একটা আশা-সম্ভাবনার প্রকাশ চাপা দেয়ার সলজ্জ প্রয়াস। ক্যাথারিনাকে আপন করে পাওয়া বা আপন করে নেওয়ারই আশা সেটা। অলক্ষ্যে অবচেতনায় কখন থেকে যেন আমি ক্যাথারিনাকে চাইতে শুরু করেছিলাম। অসরিক রেডওয়ার্ল্ডের প্রস্তাব মনের সে চাওয়াকেই নগ্নভাবে সামনে এনে দিল। আমার মুখে কোন কথা সরল না।

ক্যাথারিনাও কোন কথা বলল না। ক্যাথারিনা কি ভাবছে, সেটাও এই মুহূর্তে আমার মনে বড় হয়ে উঠল।

কথা বললেন আমার মনিব। বললেন, 'হ্যাঁ, অসরিক রেডওয়ার্ল্ড, তুমি প্রস্তাব করতেই পার। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু আমার পরিবারের সিদ্ধান্তের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। দু'জনের ব্যক্তিগত মতামতটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তাদেরকে কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি, তারা এখন এখানে কিছু বলবে কি না?

'বাবা, তোমাকে ধন্যবাদ মতামত জিজ্ঞাসা করার জন্যে। কিন্তু বিয়ে পিতা-মাতারাই দেন। কোন কোন ক্ষেত্রে, ছেলে-মেয়েরা তাদের মতামত জানায় মাত্র। অতএব তোমাদের সিদ্ধান্তই এখনও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' বলল ক্যাথারিনা। নরম, সলজ্জ কন্ঠ তার।

'ধন্যবাদ ক্যাথারিনা। অসরিক বলেছে আমরা জানি, আলগার একা, তার পরিবার নেই, পিতা মাতা নেই। আলগার তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি ও গ্রিটা কি তোমার পিতা-মাতা হতে পারি না?' বললেন আমার অভিভাবক নরম ও স্নেহের সুরে।

কথাটার মধ্যে কি জাদু ছিল জানি না। অথবা আমার হৃদয়টাই স্নেহ বুভুক্ষু হয়েছিল কি না তাও জানি না। কথাটা শোনার সাথে সাথে আমার দুই গণ্ড অশ্রুতে ভরে গেল। সংগে সংগেই আমি বললাম, 'অবশ্যই পারেন জনাব, যদি আপনারা সবহারা একজনের পিতা মাতা হতে চান। তাহলে আমি বলছি, ক্যাথারিনার উপর আপনাদের যে অধিকার, আমার উপরও আপনাদের সেই অধিকার থাকবে।'

'ধন্যবাদ আলগার। তুমি ও ক্যাথারিনা একই কথা বলেছ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তোমাদেরকে বলছি, তোমরা যদি একে-অপরের হয়ে যেতে সম্মত হও

তাহলে তোমাদের বাবা-মা আমরাই সবচেয়ে খুশি হবো এবং খুশি হয়েছি তোমাদের মত পেয়ে। এটাই আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে, আমরা সম্রাটের ওখান থেকে এসেই বিয়ের কাজটা সারব। ইতোমধ্যে গ্রিটা ও তার ভাই বিয়ের প্রস্তাবক অসরিক রেডওয়ার্ল্ড বিয়ের আয়োজনে কাজ করতে থাকবেন। আলগার ও ক্যাথারিনা তোমাদের আর কোন কথা আছে?' বললেন ক্যাথারিনার বাবা আমার সাবেক মালিক।

একটা কথা কিছু আগে থেকে আমার মনে খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে, সেটা হলো, আমার মুসলিম পরিচয় সম্পর্কে ক্যাথারিনার মত কি? এ বিষয়ে তার মন বা মতামত জানা হলো না। তাই মনিবের কথা শেষ হতেই আমি বললাম, 'একটা কথা বাবা, ক্যাথারিনা জোসেফ জ্যাকব আলগার সম্পর্কে জানেন কিন্তু তার মুসলিম পরিচয় সম্পর্কে ক্যাথারিনার মত জানা হয়নি।'

ক্যাথারিনার বাবা কিছু বলার আগেই ক্যাথারিনা বলে উঠল, 'বাবা, ওকে বল, উনি যে মুসলিম এ বিষয়টা আজ উনি বলার আগেই আমি জানতাম।'

'তুমি কিভাবে জানলে মা, আমরা তো জানতে পারিনি।' বললেন ক্যাথারিনার বাবা।

'বাবা, আমি বেরুন বেকারের মাধ্যমে আমার বিভিন্ন বইয়ের কিছু কিছু অংশের ব্যাপারে ওর ব্যাখ্যা জানতে চাইতাম। উনি তা লিখে পাঠাতেন। তার এসব লেখার মধ্য দিয়ে আমার বিশ্বাস নিশ্চিত হয় যে উনি মুসলিম। তার আগে আমার চিকিৎসার সময় তিনি হাতের একটা বই ফেলে রেখে এসেছিলেন আমার ঘরে।

তার মধ্যে একখণ্ড কাগজ ছিল, তাতে ওর হাতের কিছু লেখা ছিল। সেটা পড়েই আমি প্রথমে বুঝতে পারি, উনি মুসলিম হতে পারেন।' বলল ক্যাথারিনা।

ক্যাথারিনার কথায় আমারও মনে পড়ে গেল, এ রকম ঘটেছে। খুশি হলাম এই ভেবে যে, আমি মুসলিম জেনেই সে আমার ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

ক্যাথারিনার বাবা বললেন, 'এক সময় মুসলমানদের প্রতি আমার দারুণ বৈরীভাব ছিল। সেটা এখন আর নেই। মুসলমানরা খৃষ্টানদের মতই একত্ববাদী এবং তারা ক্যাথলিক খৃস্টানদের চেয়েও ধর্ম পালনে বেশি নিষ্ঠাবান। ক্যাথারিনা

এখন কিংবা কখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও আমাদের আপত্তি নেই।'

'আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করছি বাবা। জীবন্ত ধর্ম ইসলাম আমার ভালো লেগেছে।' এ নিয়ে তোমার সাথে আলোচনা করব বাবা। বলল ক্যাথারিনা।

'ধন্যবাদ ক্যাথারিনা।'

বলে সবার দিকে তাকিয়ে ক্যাথারিকার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক বলল, তাহলে এবার সব কাজ আমাদের শেষ হলো। সত্যি আজ সর্বশ্রেষ্ঠ দিন আমারও জীবনে। উঠবো এবার আমরা। অসরিক রেডওয়ার্ল্ড ধন্যবাদ তোমাকে, একটা ভালো কাজ তুমি করলে।

না দুলাভাই, প্রতিদিনই আমি ভালো কাজ করি। তুমি দেখ না। শালা হওয়াই আমার অপরাধ।

ক্যাথারিনা ও ক্যাথারিনার মা মুখ টিপে হাসছিল।

শালার চেয়ে মধুর সম্পর্ক আর আছে নাকি, অপরাধ হবে কেন? বলে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক। সবাই উঠল। আমিও উঠে দাঁড়ালাম।''

পড়া থামিয়ে মাথা তুলল আহমদ মুসা। কাহিনীর মধ্যে সবাই ডুবে গিয়েছিল। পড়া বাদ দিয়ে থামতেই শোনার স্রোতটা একটা ধাক্কা খেল। সবাই মাথা তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

'থামলেন কেন স্যার? কাহিনী উপন্যাসের চেয়ে সুন্দর, কিন্তু তা একজন মানুষের হৃদয় নিংড়ানো এক বাস্তবতা। বাস্তবতাটা একদিকে যেমন মর্মন্তুদ, অন্য দিকে তেমনি সুন্দর ও গৌরবের। মহান পূর্বপুরুষের জন্যে আমার গর্বে বুক ফুলে উঠেছে। একজন ভালো মানুষ শত বিপর্যয়, শত সংকট সততার দ্বারা জয় করলেন। কাহিনীর শেষ শব্দ পর্যন্ত শুনতে চাই, প্লিজ স্যার।' বলল আদালা হেনরিকা।

'সত্যি বলেছ আদালা। আমার দাদু তাঁর নামের অনুকরণে আমার নাম রাখায় আমি গৌরব বোধ করছি। কিন্তু তাঁর ও আমার মধ্যে কি আকাশ পাতাল পার্থক্য। তাঁর উত্তরসূরি বলে পরিচয় দেয়ারও অনুপযুক্ত আমি।'

একটু থামল জোসেফ জ্যাকব আলগার। সোজা হয়ে বসে বলল, 'আদালা আমরা শেষ শব্দ পর্যন্ত শুনব, এখনো স্বর্ণমুকুটের প্রসঙ্গ তো আসেইনি। তবে নাস্তার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। সবাই ক্ষুধার্ত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে তুমি আদালাসহ আমাদের সম্মানিত মেহমানরা অনেক দূর থেকে এসেছেন সারারাত ধরে। তাদের বিশ্রাম তো হয়নি, সেজন্যে ভালো নাস্তা আরও বেশি প্রয়োজন।'

'ঠিক বলেছ বাবা, বইয়ের কাহিনী আমাদের মনোযোগের সবটুকু কেড়ে নিয়েছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথাও ভুলে গেছি। যাই বাবা দেখি, নাস্তা টেবিলে দিয়েছে কি-না!'

আদালা উঠেছিল। আহমদ মুসা বলল, 'আপনাকে অভিভূত করেছে তার কাহিনীটা। কাহিনীর মধ্যে দিয়ে সেই সময়কে দেখতে পাচ্ছি। তখনকার এই

ঘটনাগুলো কোন ইতিহাসে নেই। আরও কত যে এমন কাহিনী সে সময় সৃষ্টি হয়েছিল, তা অজানার অন্ধকারেই থেকে যাবে। ধন্যবাদ আপনাদের পূর্বপুরুষকে, তাঁর কাহিনীর গবাক্ষ দিয়ে সেই কালকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাকে বিস্মিত করেছে তার বিজ্ঞতা ও পরিমিতি বোধ। শুধু জ্ঞানী হওয়া নয়, উন্নত পর্যায়ের মানবিক বোধে উজ্জীবিত না হলে এমন কেউ পারে না। তাকে দিয়েই বুঝা যায় ইসলামী সভ্যতা জ্ঞানে, গুণে, চরিত্রে সমৃদ্ধ কেমন মানুষ তৈরি করেছিল।

আদালা আবার বসে বলল, 'স্যার, আমাদের গ্রান্ড গ্রান্ড দাদু তার মুসলিপ পরিচয় গোপন করেও তার ডাক্তার পরিচয় তিনি দিতে পারতেন।'

'না, পারা স্বাভাবিক ছিল না। তার সময়ে তার মত ডাক্তার ইউরোপে ছিল না। তেমন ডাক্তার হবার কোন বিদ্যালয়ও ইউরোপে ছিল না।তাছাড়া খৃস্টানরা তখনও ঐ ধরনের ডাক্তারী পড়ার সাহস করত না চার্চের ভয়ে। ডাক্তার হিসেবে পরিচয় দিলে সার্টিফিকেট দেখাবার প্রয়োজন পড়ত। এসব নান কারণেই সম্ভবত তিনি তার ডাক্তার হওয়ার পরিচয়টি দেননি।' আহমদ মুসা বলল।

পরিচারিকা এল সেখানে। বলল, 'নাস্তা দেয়া হয়েছে টেবিলে।'

'হ্যাঁ, আদালা মেহমানদের নিয়ে টেবিলে যাও। আমি আসছি। আজ নাস্তা তৈরিতেই দেরি হয়েছে। খেতে আর দেরি করো না।' বলল আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার।

আদালা উঠল। সবাই উঠল।

নাস্তা সেরে আধাঘন্টার মধ্যে সবাই এল আবার সেই স্টাডিতে।

আদালার বাবা বাক্স থেকে খাতাটা বের করে আহমদ মুসার হাতে দিয়ে বলল, 'কি অদ্ভুত কো-ইন্সিডেন্স। আজকেই ঘটনাটা ঘটল, আর আজকেই তুমি এলে। এসে শুধু আমাদের বাঁচালেই না, পরিবারের শতাব্দীর রহস্য উন্মোচনেও আমাদের সাহায্য করলে। কি অদ্ভুত! রহস্য উন্মোচনের জন্যে একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ও ভালো আরবি জানা লোকের প্রয়োজন ছিল, সে লোকও তুমিই। আমাদের পরিবারের এক চরম বিপদের দিনে আমাদের জন্যে এক পরম সৌভাগ্যও লেখা ছিল। দিনটি আমাদের পরিবারের জন্যে টার্নিং পয়েন্ট এবং নতুন এক শুভযাত্রার শুরু। আমার হৃদয়বিদারক দু:খের এই দিনে পরম আনন্দে

আমি আপ্লুত!’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার। শেষের কথা তার আবেগের আবেশে ডুবে গেল। তার ঠোঁটের কোণার স্বচ্ছ-সুন্দর হাসির স্ফুরণ, কিন্তু চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

আদালার বাবার কথা পরিস্থিতিকে ভারি করে তুলল।

‘আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল, সেটাই হয়েছে। আপনার পূর্বপুরুষ জনাব আল মানসুর যেদিন এই ডকুমেন্ট তৈরি করে বংশীয়দের জন্যে রেখে গিয়েছিলেন, সেদিনই এটা ঠিক হয়েছিল আজ আপনার দ্বারা এটা খোলা হবে এবং আমার দ্বারা পড়া হবে। আমরা সবাই একত্র হবো, এটাও পূর্বনির্ধারিত। আমরা সবাই আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার অধীন। সুতরাং আমাদের উচিত সব ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা আদায় করা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, আমরা সবাই আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার অধীন হলে যা ঘটছে, যা আমরা ঘটাচ্ছি, তা ঈশ্বর বা আল্লাহই ঘটাচ্ছেন?’ জিজ্ঞাসা আদালার।

আদালার কথা শেষ হতেই ব্রুনা বলে উঠল, ‘ভাইয়া, এ প্রশ্ন আমারও।’

‘ভালো কিন্তু জটিল প্রশ্ন। বিষয়টা পরিষ্কার করতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। মানুষ ছাড়া মহাবিশ্বের সব কিছুই শতকরা শতভাগ আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। গাছপালা, জীব-জন্তু, গ্রহ-তারা, বাতাস-আগুন কিছুই আল্লাহর বিধি-বিধান লংঘন করতে পারে না, সে সুযোগ, শক্তি কিছুই তাদের নেই। কিন্তু মানুষের বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের দেহ অন্যান্য সৃষ্টির মতই শতভাগ আল্লাহর বিধি-বিধানের অধীন নি:শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, হাড়, স্নায়ু, টিস্যু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ মানুষ নির্ধারণ করেনি, এটা আল্লাহর দ্বারা নির্ধারিত। শুধু মানুষের ইচ্ছা ও চিন্তার ক্ষেত্রে আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। মানুষ কি করবে, কি করবে না, কোন পথে চলবে, কোন পথে চলবে না, এসব মানুষের ইচ্ছা ও চিন্তাভিত্তিক সিদ্ধান্তের ফসল। শুধু আ...।’ কথা শেষ না করেই আহমদ মুসাকে থামতে হলো।

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে আদালা বলল, ‘তার মানে মানুষ ইচ্ছা ও চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীন। কিন্তু বাস্তবে তো স্রষ্টা, ঈশ্বর বা আল্লাহ বিভিন্ন বিধি-নিষেধ দিয়ে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা-চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করেছেন।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমি সে কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। আল্লাহ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করেননি। আল্লাহ যুগে যুগে তার বার্তাবাহক বা নবী-রাসূল (স.)-দের মাধ্যমে মানুষের শান্তি ও কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন। তিনি তাদের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েছেন, এই শান্তি ও কল্যাণের পথে চললে দুটি পুরস্কার মানুষ পাবে। এক, প্রত্যেক মানুষ, মানুষের সমাজ এবং সারা বিশ্ব ও বিশ্বের মানুষ ইহজগতের পুরস্কার হিসাবে শান্তি-কল্যাণের মধ্যে থাকতে পারবে। দুই, এই কল্যাণ ও শান্তির পথে চললেই যা চাই তা পাওয়া যাবে মানে চিরন্তন জান্নাত লাভ করা যাবে। কিন্তু এই পথে চলতে মানুষকে বাধ্য করা হয়নি। শুধু এই খবর জানিয়েছেন, সে শান্তি ও কল্যাণের পথে না চললে দুনিয়াতে যেমন অকল্যাণ ও অশন্তি সৃষ্টি করবে, তেমনি পরজগতে জান্নাত লাভের অনন্ত পুরস্কার সে হারাবে এবং অকল্যাণ ও অশান্তির আগুনে সে অনন্তকাল জ্বলবে।'

'মানুষকে স্বাধীনতা দেবার পর এ শাস্তির ব্যবস্থা কেন? তাহলে স্বাধীনতার কি মূল্য থাকল?' বলল আদালা।

'আল্লাহ চান মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছার মাধ্যমেই শান্তি ও কল্যাণের পথ বেছে নিক। এজন্যে আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে বিবেক দিয়েছেন এবং এই বিবেক সব সময় মানুষকে ভালো পথ, মন্দ পথ কোনট, কল্যাণ কোন পথে, অকল্যাণ কোন পথে তা বলে দেয়। এটা আল্লাহর তরফ থেকে মানুষকে সাহায্য করার একটা নিয়ম, যাতে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাতেই কল্যাণের পথে চলে বা অকল্যাণের পথে না চলে। আল্লাহর এই ব্যবস্থা তার সৃষ্টির মূল দর্শনের সাথে জড়িত। আল্লাহ মানুষের ভোগ ও ব্যবহারের জন্যে গোটা সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। গোটা সৃষ্টিজগৎ নানাভাবে মানুষের জন্যে, মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। কিন্তু মানুষ কোন সৃষ্টিজগতের কাজে লাগে না। এই জগৎ-সংসারে সৃষ্ট সব বস্তুর মধ্যে মাত্র মানুষেরই অন্য সৃষ্টির জন্য কোন কাজ নেই, মানুষ যা করে তার নিজের বা নিজেদের জন্যে করে। অন্য কোন সৃষ্টির জন্যে করে না। এই সীমাহীন দান, দয়া, ইহসানের বিনিময়ে আল্লাহ মানুষের কাছে শুধু এটাই চেয়েছেন যে, মানুষ যেন নিজ ইচ্ছাতেই শান্তি ও কল্যাণের পথে চলে তার নিজের, মানুষের আর দুনিয়ার উপকার করে এবং এর বিনিময়ে আখেরাতের অনন্ত পরস্কার লাভ করে। শাস্তির

যে ব্যবস্থা সেটা ব্যক্তি মানুষ, মানব সমাজ ও দুনিয়ার মঙ্গলের জন্যেই। মানুষের স্বাধীনতা এখানে অর্থহীন নয়। স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতার বদলে অর্থবহ করার জন্যেই প্রকৃত পক্ষে শাস্তির এই ব্যবস্থা।' আহমদ মুসা থামল।

আদালা, ব্রুনা সবাইকে চিন্তায় আত্মস্থ দেখাচ্ছে। আহমদ মুসা থামলেও কেউ কোন কথা বলল না। কিছু মুহূর্ত কেটে গেল এভাবে।

নীরবতা ভেঙে কথা বলল ব্রুনা, 'আপনি যে কথা বলেছেন, তা শুনতে সহজ হলেও পাহাড়ের মতই যেন ভারি।'

'শুধু পাহাড় কেন বলছেন মিস ব্রুনা, আমার কাছে হিমালয়ের মত ভারি মনে হচ্ছে। মানব-দর্শন, মানুষের জন্ম, জীবন ও পর-জীবন ও পর-জীবনের মত বিষয় নিয়ে তিনি যা বলেছেন তা একটা পরম বাস্তবতা যতটুকু বুঝেছি তাতেই। তাঁকে ধন্যবাদ।'

বলে আহমদ মুসার দিকে ঘুরে দাঁড়াল আদালা। বলল, 'স্যার, একটা কথা, মানুষকে পর-জীবনের পুরস্কার ও শাস্তির সাথে আল্লাহ মানুষকে না জড়ালে কেমন হতো?'

'পরীক্ষা না থাকলে, পাস-ফেল না থাকলে ছাত্র জীবনটা কেমন হতো, যদি পরীক্ষা, টেস্ট না থাকতো, কৃতকার্যতা-অকৃতকার্যতা না থাকতো তাহলে কি কর্মকর্তা-কমর্চারি রিক্রুট হতো? পরকালে জবাবদিহিতা তথা পুরস্কার-শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা, নীতিবোধ কিছুই থাকতো না, বন্যতায় ভরে যেত সমাজ-সম্পর্ক।' আহমদ মুসা বলল।

'অন্তহীন পুরস্কার ঠিক আছে, কিন্তু অনন্ত শাস্তির বিষয়টা অতি বেশি ভারি নয়?' বলল আদালা।

'পুরস্কার অনন্তই, কিন্তু শাস্তির মেয়াদের বিষয়টা হতে পারে আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভরশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ যা চান তাই করতে পারেন। তবে মানুষের সমাজে, সৃষ্টি জগতে মানুষের দায়িত্ব বিশাল বলেই তাদের পুরস্কার ও শাস্তির বিধানও বিশাল। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টিজগতের রাজা বানিয়েছেন। যাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয়েছে 'খলিফা। মানুষের পদ যেমন বড় তেমনি মানুষের দায়িত্বও খুব ভারি। মানুষ, পৃথিবী এবং এমনকি সব সৃষ্টির কল্যাণে

মানুষের সঠিক দায়িত্ব পালনকে নিশ্চিত করার জন্যেই পরম পুরস্কার ও চরম শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আল্লাহ এটা করেছেন সৃষ্টি ও মানুষের স্বার্থেই, তাঁর এতে কোন স্বার্থ নেই, তিনি বেনিয়াজ, অভাবমুক্ত ও মুখাপেক্ষীহীন। সমগ্র সৃষ্টি মিলে তাঁর কোন উপকারে আসতে পারে না, উপকার করতে পারে না, তেমনি গোটা সৃষ্টি মিলেও তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না।' আহমদ মুসা বলল।

আদালা, ব্রুনাসহ সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞাসার বদলে তাদের সারা মুখে এখন পরিতৃপ্তি। আদালা ব্রুনা দু'জনেই একসাথে উদ্ভাসিত কন্ঠে বলে উঠল, অনেক ধন্যবাদ স্যার, 'একটা অতি কঠিন বিষয় সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। সত্যিই মনে হচ্ছে স্যার, স্রষ্টা, সৃষ্টি ও মানুষ নতুন অর্থ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। ধন্যবাদ আপনাকে।'

'দেবার মত কিছু ধন্যবাদ আমাদের জন্যেও রাখ আদালা।'

বলে আহমদ মুসরা দিকে তাকিয়ে আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার বলল, 'গর্বে বুক ফুলে উঠেছে, মি. আহমদ মুসা এই ভেবে যে, আপনি মুসলমান, আমাদের পূর্বপুরুষও মুসলমান এবং এই বিশ্বাস মুসলমানদের।'

'এ বিশ্বাস কি শুধু মুসলমানদের, আর কারও হতে পারে না?' বলল ব্রুনা। তার কন্ঠে মিষ্টি প্রতিবাদের সুর।

'না, ব্রুনা, এ বিশ্বাস সকল মানুষের জন্যে, শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়। যে মানুষ এ বিশ্বাস ধারণ করে, তাকে মুসলমান বা আত্মসমর্পণকারী বলে। 'মুসলিম' মানুষের গুণবাচক পরিচয়জ্ঞাপক নাম মাত্র।' আহমদ মুসা বলল।

'এ বিশ্বাস আমার, আমাদের পছন্দ হয়েছে, আমরা গ্রহণ করেছি, তাহলে কি আমার নাম মুসলমান হয়ে গেছে। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসার মুখে গাম্ভীর্য নেমে এল। বলল, 'বিশ্বাস মনে মনে পোষণ করাই যথেষ্ট নয়, বিশ্বাসের ঘোষণা দেওয়াও প্রয়োজন। এই ঘোষণার পর একজন মানুষের গুণবাচক পরিচয় 'মুসলিম' হয়ে যায়। এখানেই শেষ নয়, বিশ্বাসের এই ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে যে গুণাবলিতে সে সমৃদ্ধ হয়, সে গুণাবলির প্রকাশও ঘটে কাজের মাধ্যমে। ফল, ফুলের মাধ্যমে যেমন গাছের পরিচয়, তেমনি কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে।'

‘বুঝেছি স্যার, প্র্যাকটিসিং মুসলিম না করে আপনি ছাড়বেন না।’ বলল ব্রুনা। হাসছে সে।

‘ব্রুনা, আমি নীতি ও বিধানের কথা বলেছি। এর মধ্যে মটিভ খুঁজে আমার উপর জুলুম করো না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যরি, ভাইয়া এমনি মজা করছিলাম। ব্রুনাদের মত মেয়েদের জন্যে যদি আহমদ মুসাকে মটিভের আশ্রয় নিতে হয়, তাহলে ব্রুনাদের জন্ম, জীবন ধন্য হতে পারে, তারা হতে পারে আকাশের চাঁদ।

‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা, সেই সাথে সকলকে। সুন্দর আলোচনা হয়েছে। আমরা সবাই অনেক উপকৃত হয়েছি। সত্যি বলতে কি, সারা জীবনে যা শুনিনি, যা বুঝিনি, খুব অল্প সময়ে তা শুনলাম, বুঝলাম। যা জীবনের এক মহাটার্নিং পয়েন্টের মূলধন হতে পারে।’

একটু থামল জোসেফ জ্যাকব আলগার। বলল মুহূর্ত পরেই, ‘এবার আমরা মূল কাজে ফিরে আসি। মি. আহমদ মুসা, প্লিজ আপনি শুরু করুন।’

‘ধন্যবাদ স্যার, আমাকে এই সুন্দর সুযোগ দেয়ার জন্যে।’

বলে খাতা খুলল আহমদ মুসা।

পড়া শুরু করল আবারঃ

‘সন্ধ্যার পর সম্রাট চতুর্থ অটোর পাঠানো রাজকীয় ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে আমরা যাত্রা করলাম।

আমরা নিজেদের ঘোড়ার গাড়িতে চড়েই যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সম্রাট নাকি বলেছেন, সম্রাটের ছেলেকে যিনি চিকিৎসা করবেন তিনি রাজকীয় সম্মান নিয়েই আসবেন।

দুইঘোড়ার গাড়ি। ৪টি সিট।

পেছনের দুই সিট প্রহরীদের জন্যে। দু’জন প্রহরী আগে থেকেই বসা ছিল সেখানে। সামনের দুটি ভিআইপি সিট। আমি ও আমার মালিক ক্যাথারিনার বাবা বাকি দু’টি আসনে বসলাম।

গেটে দাঁড়িয়ে আমাদের বিদায় জানাচ্ছিল বাড়ির সবাই। ক্যাথারিনাও হাজির ছিল।সকালের পর এই প্রথম দেখলাম ক্যাথারিনাকে। ছেলেকে জড়িয়ে

ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। বেরুন বেকার তার মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। সে তার নানাকে টাটা দেখালো, পরে আমাকেও। আমিও বেরুন বেকারকে হাত নেড়ে টাটা দিলাম।

গাড়ি নড়ে উঠে চলতে শুরু করেছে। আমরা তখনও গেটে দাঁড়ানো সবার দিকে তাকিয়ে আছি। সবশেষে দেখলাম ক্যাথারিনার হাত উঠল আমার উদ্দেশ্যে। হাত নাড়ল আমাকে লক্ষ্য করে। আমিও জবাব দিলাম হাত নেড়ে। মনট আমার খুব প্রসন্ন হয়ে উঠল। মনে হলো, ক্যাথারিনার এমন একটা সাড়া পাবার জন্যে আমার অবচেতন মনের একটা আকাঙ্খা যেন উন্মুখ হয়েছিল।

ঘোড়ার গাড়ি চলছিল বেশ দ্রুত। রাস্তাটাও সম্রাটেরই তৈরি।

ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক ও আমি দু'জনেই নীরব ছিলাম। আর কারও কথা বলার কথাও নয়। ঘোড়ার গাড়ি চলার শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই চারদিকে। নীরবতা ভেঙে ক্যাথারিনার বাবা এক সময় বলে উঠল, 'সম্রাট খুব আস্থা ও আশা নিয়ে তোমাকে ডেকেছেন, তাই ভয় হচ্ছে আমরা তার আস্থা রাখতে পারবো কি না।'

আমি বললাম আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব, এটুকুই আমরা বলতে পারি।'

'তা ঠিক। তোমার উপর আমার আস্থা আছে। তোমার আসল পরিচয় পেয়ে আমার আস্থা বহুগুণ বেড়েছে। আমার মনে হচ্ছে তুমি পারবে, এই আশাই আমি করব।' বলল ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক।

'দোয়া করুন। মানুষ চেষ্টার মালিক। ফল আল্লাহ দেন।' বললাম আমি।

'হ্যাঁ আরগার। ঈশ্বরই সব কিছুর মালিক, সব কিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।' বলল ক্যাথারিনার বাবা।

একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'আমরা প্রায় এসে গেছি আলগার। সম্রাটের সাথে দেখা হলে তো সম্মান দেখাতে হয়। তা খেয়াল রেখো।' বলল ক্যাথারিনার বাবা।

আমি বললাম, 'এই সম্রাটকে সম্মান দেখানোর কি কোন বিশেষ নিয়ম আছে? আমি কিন্তু সেজদা করে বা মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাতে পারি না।'

‘না, না আলগার। অন্য রাজা ও সম্রাটদের এই রীতি চালু আছে, কিন্তু স্যাক্সন সম্রাটরা, এমনকি স্যাক্সনরাও এটা করে না। তবে সম্রাটের শাসন ও শক্তির প্রতীক তার হাতের রাজদণ্ডকে চুমু খেতে হয়, এর বেশি কিছু নয়।’ বলল ক্যাথারিনার বাবা।

‘রাজদণ্ড মানে অলংকারখচিত সিংহ বা হাতি কিংবা ক্রস-এর মত কোন কিছুর প্রতীকসংবলিত সুশোভন লাঠি, এই তো?’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

‘ঠিক বলেছ আলগার। তবে অলংকারখচিত সুশোভন লাঠি বা রাজদণ্ডটি হাতি বা সিংহমুখো নয়, কিংবা ‘ক্রস’ মাথাও নয়, বরং লাঠির মাথাটা মিনার আকৃতির। তবে মিরারের সূচালো মাথায় ক্রস নেই, আছে পাঁচ মাথ তারকা।’ বলল ক্যাথারিনার বাবা।

আমি বিস্মিত হলাম। বললাম, ‘রাজদণ্ডের মাথায় বাঘ, সিংহ, হাতি না থাক, ক্রস থাকারই কথা, যেমন পোপের আছে। তার বদলে তারকা কেন?’

‘ও তুমি জান না। স্যাক্সনরা বিশেষ করে স্যাক্সন রাজারা খৃস্টান নয়। স্যাক্সনদের রাজা রোমানদের দখলে যাবার পর বাধ্য হয়ে অনেকেই খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে, অনেকেই আত্মপরিচয় গোপন করে ফেলে, আবার কেউ কেউ দেশ ত্যাগ করে। রোমান সম্রাট শার্লেম্যানের সময় খৃস্টানদের এই অত্যাচার ভয়াবহ আকারে শুরু হয় এবং চলতে থাকে। আমাদের সম্রাট চতুর্থ অটো রাজ্যহারা এক রাজকুমার। পরে নতুন এই স্যাক্সন ল্যান্ডে এসে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন। আমরা নাইটরা খৃস্টান হয়েও তাঁকে সমর্থন করি। কারণ তিনি অত্যাচারী নন, স্বৈরাচারীও নন। সম্রাট হয়েও তিনি জনগণের একজন। দু’বছর পর পর তিনি নাগরিক সম্মেলন ডেকে তাদের কথা শোনেন এবং তার শাসনের ব্যাপারে তাদের রায় নেন। তার ছেলে যুবরাজ হয়েছে, তাও নাগরিক সম্মেলনের রায় অনুসারে। সম্রাট যুদ্ধের মত বড় কোন সিদ্ধান্ত নিজে নেন না, নাগরিক সম্মেলন ডেকে নাগরিকদের রায় নিয়ে তা করেন।’

একটু হেসেছিলেন ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক। সেই সুযোগে আমি বলে উঠলাম, ‘স্যাক্সন সম্রাটরা তো দেখছি গণতান্ত্রিক, রোমান সম্রাটদের মত অত্যাচারী ও অটোক্র্যাট নয়।’

'এই ঐতিহ্য স্যাক্সন সম্রাটদের নয়, এই ঐতিহ্য স্যাক্সনদের। আদি স্যাক্সন সমাজ ছিল গণতান্ত্রিক সমাজ। খৃস্টান রোমানরা স্যাক্সন রাজ্য লণ্ডভণ্ড করার পরও সেই ঐতিহ্যের কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে।' বলল ক্যাথারিনার বাবা।

'ধন্যবাদ স্যাক্সন ও স্যাক্সন সম্রাটদের। আমাদের ইসলামী সমাজও গণতান্ত্রিক সমাজ।'

'হ্যাঁ, আমরা এসে গেছি। ঐ তো সম্রাটের প্রাসাদের উঁচু গেট দেখা যাচ্ছে।' বলল ক্যাথারিনার বাবা।

আমরা এসে গেলাম সম্রাটের প্রাসাদে। প্রাসাদের গেটে ছোট একটা ঘোড়সওয়ার দল ছিল আমাদের স্বাগত জানাবার জন্যে। তারা আমাদের স্বাগত জানাল। আমরা গেটে পৌঁছার সাথে সাথেই একজন ঘোড়সওয়ার ছুটল প্রাসাদে সম্রাটকে খবর দেয়ার জন্যে। কিছুক্ষণ পরেই প্রাসাদের একজন অফিসার এলেন আমাদের নেবার জন্যে। তার সাথে রাজপ্রাসাদের ভেতরে চললাম। অফিসারটি জানাল, সম্রাট আজ দরবারের কাজ মুলতবি করেছেন এবং প্রাসাদের রাজকীয় চিকিৎসা ও সেবা বিভাগে যুবরাজকে নিয়ে অপেক্ষ করছেন।

আমাদের সরাসরি রাজপ্রাসাদের চিকিৎসা ও সেবা বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলো।

সেখানে পৌঁছলে সম্রাট চতুর্থ অটো'র প্রধান স্টাফ অফিসার আমাদেরকে একটা বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে গেলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে হাত-পা ধুয়ে ফ্রেশ হবার পর আমাদেরকে ডিনারের টেবিলে নিয়ে যাওয়া হলো। ডিনারের টেবিলে খোদ সম্রাট এলেন। বিস্ময়ে হতবাক আমরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তার দিকে এগোচ্ছিলাম। সম্রাট হাত দিয়ে এগোতে নিষেধ করে আমাদের স্বাগত জানিয়ে বললেন, খাবার টেবিলে বসে উঠতে নেই। আসুন আমরা ডিনার সেরে নেই।

রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে সম্রাটের সাথে বসে ডিনার করলাম। মনে পড়ে গেল আমার দীন-দুনিয়ার বাদশাহ আমার রাসূলের (স.) কথা, সোনালি যুগের সোনার মানুষ খলিফা আবু বকর (রা.), খলিফা ওমর (রা.)-দের কথা। তাঁরা শাসক হয়েও

মানুষের সেবক ছিলেন। তাঁদের স্থান ছিল মানুষের কাতারে, ক্লান্ত হলে শয্যা হতো খেজুর গাছের নিচে বালির উপর, নাগরিকরা যখন ঘুমিয়ে, তখন তাঁরা মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতো তাদের অবস্থা জানার জন্যে, চাকরের সাথে পালা করে উটের পিঠে চড়েছেন, আবার রশি ধরে উটকে টেনে নিয়েছেন, তাঁদের সিংহাসন ছিল খেজুরের চাটাই। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা কম্পন জাগাতো রোম সম্রাট, গ্রীক সম্রাট ও পারস্য সম্রাটদের হৃদয়ে। তাঁদের সে আদর্শেরই কিঞ্চিত একটা রূপ দেখলাম স্যাক্সন সম্রাট চতুর্থ অটো'র মধ্যে। আমার চোখের কোণ ভিজে উঠছে। আমি বললাম সম্রাটকে লক্ষ্য করে, 'এক্সিলেন্সি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, আপনার সাথে বসে খাওয়ার সৌভাগ্য হলো।'

সম্রাট চতুর্থ অটো'র চোখে-মুখে একটা সূক্ষ্ম প্রসন্নতা ফুটে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ ডক্টর যে আপনি একে সৌভাগ্য বলছেন।

আসলে আমাদের স্যাক্সনদের জন্যে এটা স্বাভাবিক বিষয়। আমি সম্রাট, সেটা সামাজিক সিস্টেম হিসেবে। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছা আমার নেই।'

'ধন্যবাদ, এক্সিলেন্সি। এভাবে মানুষের মনের সম্রাট হওয়া যায়।

শাসক সম্রাটের চাইতে মনের সম্রাট অনেক বেশি শক্তিশালী। ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি।' আমি বললাম সম্রাটকে লক্ষ্য করে।

সম্রাট চোখ তুলে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, 'ডক্টর আপনি সাংঘাতিক কথা বলেছেন। সম্পূর্ণ নতুন পরিভাষা, সম্পূর্ণ নতুন প্রকাশ। আপনি কোথায় লেখাপড়া করেছেন?'

হঠাৎ আমার মুখ ফসকেই বেরিয়ে গেল, 'স্পেনে লেখাপড়া করেছি।'

'স্পেনে?' বলে সম্রাট উঠে দাঁড়ালেন। তার চোখে-মুখে বিস্ময়ের বিস্ফোরণ। তার দুই চোখের স্থির দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ। আমার জন্যে আশার কথা যে, তার সে দৃষ্টিতে বিদ্বেষ, ঘৃণা বা হিংসার প্রকাশ নেই। আছে সবিস্ময় অনুসন্ধান।

সম্রাটের সাথে সাথে আমরাও উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। সম্রাট ধীরে ধীরে বসলেন। আমরাও বসলাম।

বসার সাথে সম্রাট তাঁর দুই চোখ বন্ধ করেছেন। আত্নস্থ হওয়ার প্রকাশ তার চোখে-মুখে। অনেক মুহূর্ত পার হলো।

সম্রাট চোখ খুললেন। বললেন, 'ডক্টর, আপনার সাথে কি ওখানকার শাসকদের কারও কখনও দেখা হয়েছে? নিজ মুখে ওদের কথা-বার্তা শুনেছেন কখনও?' বললেন সম্রাট।

'হ্যাঁ, এক্সিলেন্সি। আমি তাঁদের দেখেছি, কথাও শুনেছি তাঁদের। বললাম আমি।

'ওরা মানুষ কেমন? শুনেছি, শাসন নাকি ওদের আগের মত নেই!' বললেন সম্রাট।

'এক্সিলেন্সি ঠিকই শুনেছেন। ওরা মানুষ হিসেবে এখনও ভালো। তবে শাসক হলে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে যে দোষ-ক্রটি ঢোকে তা তারা মুক্ত থাকতে পারেনি। এ কারণেই তাদের শাসনও আগের মত নেই। বিভেদ-বিতর্ক ও হানাহানি তাদের নিজেদের মধ্যে বেড়েছে। সে কারণে তারা দুর্বলও হয়ে পড়েছে। দুর্বলতার কারণে তাদের রাজ্যও সংকুচিত হয়ে পড়েছে।' বললাম আমি।

সম্রাট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, 'আমরা এক সময় ওদের উপর অনেক নির্ভর করেছিলাম, অনেক আশা করেছিলাম। আমাদের পূর্বপুরুষরা আশা করেছিলেন, তারা ও আমরা মিলে ইউরোপে একটা উদার ও মানবিক রাজ্যের প্রতিষ্টা করব। কিন্তু তা হয়নি।'

বিস্ময়ে আমার অবাক হয়ে যাবার পালা। সম্রাট এ কি বলছেন। স্পেনের মুসলিম সুলতানদের সাথে মিলে স্যাক্সন সম্রাটরা কিছু করতে চেয়েছিলেন? বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে আমি বললাম, 'এক্সিলেন্সি, দয়া করে কি বলবেন, স্পেনের মুসলিম সুলতানদের সাথে মিলে আপনাদের কিছু করার ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছিল, মাঝখানের বিশাল দূরত্ব ডিঙিয়ে?'

'ডক্টর, প্রয়োজনের তাকিদে আমার পূর্বপুরুষ প্রথম অটো, তারপর দ্বিতীয় অটো এই বিশাল দূরত্ব ডিঙিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। বলেছি, আমাদের প্রয়োজনেই আমরা এটা করেছিলাম। আমাদের স্যাক্সনদের

প্রথম সম্রাট অটো 'দি গ্রেট স্পেনের মুসলিম সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। যোগাযোগ ছিল একটা ঘটনা উপলক্ষ্যে। স্পেনের সুলতানের সৈন্যরা আলপস-এর অনেকগুলো আলপাইন গিরিপথ দখল করে নিয়েছিল। তার ফলে সওদাগরী কাফেলার যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুলতানের সৈন্যরা আলপাইনের গিরিপথগুলো ছেড়ে দেয় অথবা সওদাগরী কাফেলাকে নিরাপদে যাতায়াত করতে দেয়, এই অনুরোধ নিয়েই স্যাক্সন সম্রাট প্রথম অটো ৯৫৩ খৃস্টাব্দে সুলতান আবদুর রহমানের রাজধানী কর্ডোভায় একটা প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন। প্রতিনিধিদল এক মাস কর্ডোভায় ছিলেন। সুলতান তৃতীয় আব্দুর রহমান সম্রাট প্রথম অটো'র সম্মান রেখেছিলেন। একমাস পর প্রতিনিধিদলটি জার্মানীতে ফিরে এলে তাদের কাছে স্পেনের সুলতানদের কাহিনী শুনেছিলেন। এটা সম্রাট প্রথম অটোকে যারপরনাই আনন্দিত ও প্রভাবিত করেছিল। তিনি দেখেছিলেন মুসলমানদের সাথে স্যাক্সনদের অনেক মিল। স্যাক্সনদের মতই মুসলমানরা সরল জীবন যাপন করে। কোন আশরাফ-আতরাফের ব্যবধান তাদের মধ্যে নেই স্যাক্সদের মতই। সুলতান বা সম্রাটকে মুসলমানরা মনিব বা ঈশ্বরের মত করে ভাবে না, শাসককে সাথী বা ভাই মনে করে। স্যাক্সনদের রাজা-সম্রাটরাও তাই। স্যাক্সনদের মতই

মুসলমানরা কোন মূর্তি বা প্রতিকৃতিকে দেবতা মানে না।মুসলমানদের প্রার্থনা গৃহের মিনারগুলো স্যাক্সনদের মিনারের মতই আকাশচুম্বী উঁচু। আরও শুনেছিলেন প্রতিনিধিদলের কাছে যে, রোমান ও গ্রীক সম্রাটরা মুসলমানদের ভয় করে। মুসলিম সুলতানদের এই শক্তির কথা শুনে সম্রাট অটোর হৃদয়ে একটা পুরানো কথা মাথাচড়া দিয়ে উঠেছিল, সেটা হলো স্যাক্সনদের উপর রোমক খৃস্টানদের নৃশংস হামলা, আক্রমণ ও অবর্ণনীয় অত্যাচার। ৭৮২ সালে শার্লেম্যানের খৃস্টান বাহিনী একদিনে ৪ হাজার ৫শ' স্যাক্সনকে পশুর মত হত্যা করেছিল। শার্লেম্যানের এই বাহিনীর কাছে স্যাক্সনদের মৃত্যুর বিকল্প ছিল খৃস্টধর্ম গ্রহণ করা। রাজনৈতিক সম্রাটের পরিবারও সেই খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেই সূত্রে এখন তারা খৃস্টান। কিন্তু এই বীভৎস অতীতকে স্যাক্সনরা ভোলেনি। শার্লেম্যানের বাহিনী তাদের হত্যা ও খৃস্টীয়করণই শুধু নয়,

স্যাক্সনদের সমাজ, সংস্কৃতি সবই ধ্বংস করেছে। আইন করে মিনার তৈরি নিষিদ্ধ করেছে। অতীতের এই দু:সহ বেদনা-তাড়িত স্মৃতি আমার পূর্বপুরুষ সম্রাট প্রথম অটোকে এক প্রতিকার চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন, রোমানদের অত্যাচার-আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে স্পেনের সুলতানদের সাথে ঐক্য গড়া যায়। এই ঐক্য একটা বিরাট শক্তি হিসেবে দেখা দেবে। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি স্পেনের সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের কাছে আরও একটা প্রতিনিধিদল পাঠালেন। একটা চিঠি পাঠালেন তিনি সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের উদ্দেশ্যে। এবারও মাসখানেক পর প্রতিনিধিদল ফিরে এল সুলতান আবদুর রহমানের একটা চিঠি নিয়। চিঠিতে সুলতান আবদুর রহমান সম্রাট প্রথম অটোকে যা লিখেছিলেন তার সারকথা হলো, 'সম্রাটের বক্তব্য ও মতামতকে স্পেনের খিলাফত সাদরে গ্রহণ করেছে। আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর উত্তরসূরি এই খিলাফত জাতিগতসহ সকল অত্যাচার-অবিচারের বিরোধী। যে ঐক্য-সহযোগিতা মানুষের শান্তি, মর্যাদা ও সমৃদ্ধির স্বার্থে, আমরা তার পক্ষে। এ নীতির ভিত্তিতে সম্রাটের সাথে আমাদের ঐক্য ও সহযোগিতা হতে পারে। এই লক্ষ্যে সম্রাটের সাথে আমাদের আরও আলোচনা চলবে। ইতিমধ্যে আমরা একে-অপরের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখব।' এই চিঠি পেয়ে সম্রাট খুব খুশি হয়েছিলেন।

আলোচনা শুরু হয়েছিল এবং অনেক দূর এগিয়েছিল। কিন্তু ৯৬১ সালে সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের মৃত্যু হলে আলোচনায় ছেদ পড়ে। অন্য দিকে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের উত্তরসূরি দ্বিতীয় হাকামের কাছে লেখা কনডোলেন্স ও আবার আলোচনা শুরু সংক্রান্ত প্রথম অটোর একটা চিঠি পথে সম্রাটের প্রতিনিধিদলের কাছ থেকে চুরি হয়ে যায় এবং তা পোপের হাতে পড়ে। তারপর তা পোপের হাত থেকে ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়। সম্রাট অটো স্পেনের মুর সুলতানদের সাথে মিলে পোপ ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। হৈ চৈ শুরু করা হলো ইউরোপ জুড়ে। জার্মানীদের নাইটদের খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করা হলো। এই অবস্থায় সম্রাট অটো পরিস্থিতিকে শান্ত করার জন্যে চুপ হয়ে যান এবং স্পেনের সাথে যোগাযোগ আপাতত বন্ধ করে দেন। ক'বছর

পর আবার যখন যোগাযোগ শুরু করতে যাবেন, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে অসুখেই ৯৭৩ সালে তিনি মারা গেলেন। এভাবে সম্রাট প্রথম অটোর একটা স্বপ্ন একের পর এক ধাক্কা খেয়ে পেছনে পড়ে গেল, যা আর সামনে আনা যায়নি।'

থামলেন সম্রাট চতুর্থ অটো। উঠে দাঁড়ালো। পায়চারি করতে করতে বলল, 'আমার উত্তরসূরিদের সে স্বপ্ন সফল হয়নি, কিন্তু স্বপ্নটির কথা আমরা ভুলে যাইনি। আপনার ডাক্তারী শিক্ষা এবং বাড়ির ঠিকানা কর্ডোভায় শুনে সেই অতৃপ্ত স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেছে। যাক, আমি খুশি হয়েছি।'

'এক্সিলেন্সি, আমি খুশি হয়েছি আপনার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হওয়ায়। আমি আরও খুশি হয়েছি কর্ডোভা ও স্পেনের সুলতানদের সাথে আপনাদের পুরানো সম্পর্কের ইতিহাস শুনে। দুই পক্ষের এই স্বপ্ন সফল হলে আমার মনে হয় দুই পক্ষই উপকৃত হতো।' আমি বললাম।

'উপকৃত মানে? ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতে পারতো। অটো'দের সাম্রাজ্য তাহলে অত তাড়াতাড়ি ধ্বংস হতো না এবং প্রায় দু'শ বছর অটো পরিবারকে রাজ্যহারা অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে হতো না।

অন্য দিকে স্পেনের সুলতানরাও খৃস্টান রাজাদের অনেক জ্বালাতন থেকে বাঁচতেন।' বলল সম্রাট চতুর্থ অটো।

থামলেন সম্রাট। ঘুরে তাকালেন ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিকের দিকে। বললেন, 'আসুন, যুবরাজ অপেক্ষা করছেন।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসুন ডক্টর।'

বলে চলতে লাগলেন তিনি। আমরা তার পিছু পিছু চললাম। বড় একটা সুসজ্জিত ঘর। দুগ্ধফেনা সদৃশ শয্যায় শুয়ে আছে এক সুদর্শন যুবক। চোখ বুজে শুয়ে আছে সে।

তার মাথার পেছনে একজন নার্স দাঁড়িয়ে আছে এ্যাটেনশন অবস্থায়। দরজায় ছিল দু'জন পরিচারিকা। সম্রাট ও আমাদেরকে দেখেই কুর্নিশ করে দু'পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল তারা।

সম্রাটের পেছনে আমরাও ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম।

‘সম্রাট যুবকটিকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, ‘ডক্টর এই আমার একমাত্র ছেলে, যুবরাজ পঞ্চম অটো।’

আমি এগিয়ে গেলাম বিছানার দিকে।

যুবরাজ উঠতে যাচ্ছিলেন। দু’জন নার্স ছুটে এসে যুবরাজকে ধরে বসিয়ে দিতে গেল।

আমি দ্রুত কন্ঠে বললাম ‘প্লিজ এক্সিলেন্সি, যুবরাজ। প্লিজ, আপনি উঠবেন না।’ বলে আমি ধরে তাকে আস্তে আস্তে করে শুইয়ে দিলাম।

.আমি উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাটের দিকে চেয়ে বললাম, ‘এক্সিলেন্সি, আমি কি যুবরাজকে দেখতে পারি?’

সম্রাট চতুর্থ অটো সুশোভিত একটা চেয়ারে গিয়ে বসেছেন। বললেন, ‘হ্যাঁ ডক্টর, প্লিজ শুরু করুন।’

ক্যাথারিনার বাবাও সম্রাটের পেছনে আরেকটা চেয়ারে গিয়ে বসেছেন সম্রাটের নির্দেশে।

আমি যুবরাজের পাশে গিয়ে বসলাম। বললাম নরম স্নেহের সুরে, ‘এক্সিলেন্সি যুবরাজ, আমি একজন ডাক্তার। আপনার প্রতি অসীম শুভেচ্ছা নিয়ে আল্লাহর নামে আমি আমার কাজ শুরু করতে চাই। প্লিজ যুবরাজ আমাকে অনুমতি দিন, আপনার সহযোগিতা আমি চাই।’

যুবরাজ ম্লান হাসলেন। বললেন, ‘আপনাকে ওয়েলকাম, যদিও চিকিৎসার প্রতি আমার আগের সেই আস্থা নেই। তবু সব সহযোগিতা আমি করব। আমার জন্যে কষ্ট করার জন্যে আপনাকে আগাম ধন্যবাদ।’

‘ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি। আমি প্রথমে দুই চোখ ভালো করে দেখবো। তারপর দরকার হলে কিছু জিজ্ঞাসা করব। তারপর সব অবস্থা দেখে সামনে এগোবো।’

পরীক্ষা শুরু করলাম আমি। আমি যুবরাজের দুই চোখের ভেতরের অবস্থা দেখলাম। আমি বিস্মিত হলাম দেখে যে, যুবরাজের দুই চোখের দুই আইবলসহ চোখের সব অবস্থা স্বাভাবিক। একটাই অস্বাভাবিকতা দেখলাম। সেটা হলো, দুই চোখেরই আইবলসহ ভেতরটা শুকনো এবং চোখের আইবলে কোন রিফ্লেকশন

নেই। আমি নার্সকে একটা সুচ আনতে বললাম। নার্স দৌড়ে গিয়ে সুচ এনে আমাকে দিল। আমি সুচটা দেখে নার্সকে সেটা আগুনে জীবাণুমুক্ত করে দিতে বললাম। নার্স সুচটা পুড়িয়ে নিয়ে এল। আমি যুবরাজকে বললাম, প্লিজ যুবরাজ, চোখে যতবার আঘাত পাবেন, কথা বলবেন প্লিজ। চোখের আইলিডসহ চোখের ভেতরটায় প্রযোজনীয় অনুভুতিপ্রবণ অংশগুলোতে সুচের আগা দিয়ে আঘাত করে দেখলাম যুবরাজ প্রতিটাতেই রেসপন্স করছেন। আমি বিস্মিত হলাম চোখের স্নায়ুগুলো সব জীবিত আছে! তাহলে দুই চোখ শুষ্ক কেন? চোখের আইবলে রেসপন্স নেই কেন? তাহলে চোখের কালেকটিভ টিস্যু এবং দৃশ্য প্রবাহ মণিকে বহন ও বিতরণকারী গ্রন্থিগুলোতেই কি সমস্যা? কিন্তু পরীক্ষাটা একটু কঠিন ও কষ্টকর। আমি নার্সদের দিকে চাইলাম। বললাম এর চেয়েও সূক্ষ্ম সুচ কি পাওয়া যাবে? নার্স বলল, স্যার, এ ধরনের সুচ নেই, তবে আকুপাংচারের সুচ আছে। আকুপাংচারের কতকগুলো সুচ অনেক লম্বা, খুবই সূক্ষ্ম।

আমি খুশি হয়ে বললাম , 'ধন্যবাদ নার্স। ওগুলো আরও ভালো, বেশি কাজের। নিয়ে এস, দ্রুত।' নার্স নিয়ে এল সুচ। সুচগুলোকে আগুনে সেঁকে জীবাণুমুক্ত করে নিয়ে এসেছে নার্স। আমি ধন্যবাদ দিয়ে সুচ হাতে নিলাম। যুবরাজের দুই চোখের উপরের দিকটায় মাপজোখ করে দুই চোখের তিনটি করে জায়গা ঠিক করলাম পরীক্ষার জন্যে। চোখের আইবলের গোড়ার দিক থেকে যে সূক্ষ্ম সেলের অংশ মস্তিষ্কের সাথে সংযুক্ত, সেগুলো চোখে প্রতিবিম্বিত হওয়া ইনফরমেশনকে

মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং মস্তিষ্ক সে ইনফরমেশনকে দৃশ্যে পরিণত করে চোখে পাঠায়। সুতরাং এই সেলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে চোখ ও মস্তিষ্কের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় চোখ ও আইবল ভালো থাকলেও চোখ কিছুই দেখতে পায় না। আমি এই সেলগুলো পরীক্ষারই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রস্তুত হয়ে আমি যুবরাজকে বললাম, 'এক্সিলেন্সি, যুবরাজ, আপনি রোমে সামরিক ট্রেনিং নিয়েছেন। ট্রেনিং-এ শারীরিক ও মানসিক সহ্য-শক্তিরও পরীক্ষা নেয়া হয়। দেহে সুচ ফোটানোর কোন ট্রেনিং কি আপনার হয়েছে?' যুবরাজ হাসলেন। বললেন,

‘ডক্টর নিশ্চয় কোথাও সুচ ফোটাতে চাচ্ছেন। যাই করুন ডক্টর আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।’

‘ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি।’ বললাম আমি। কাজ শুরুর আগে আবার আমি বললাম, ‘এক্সলেন্সি, এবার আপনার আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা চাই। সুচ চামড়া ভেদ করার সময় ব্যথা লাগবে, অবশ্যই, কিন্তু তারপর সুচের আগা যে দিক দিয়ে এবং যেখানে গিয়ে থামছে সে স্থানগুলোতে ব্যথা লাগছে কি না সেটা আমি জানতে চাই। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।’

যুবরাজ বললেন, ‘ইয়েস ডক্টর, গড ব্লেস আস।’

প্রত্যেক চোখের আইবলের পেছনে নির্দিষ্ট স্থান বরাবর উপরে তিনটি ডট ঠিক করে নিলাম। প্রথমে দুই চোখের মাঝের দুই ডটে সুচ প্রবেশ করালাম। যুবরাজ বললেন, ‘চামড়ার অংশ ফুটো হবার সময় সামান্য কিছু অংশে ব্যথা বোধ করেছি, তারপর আর কোন ব্যথা লাগেনি।‘ আমি যুবরাজকে ধন্যবাদ দেবার পর ভেতরে ঢুকে যাওয়া সুচের দৈর্ঘ্য পরখ করে বুঝলাম চোখ ও মুস্তষ্কের সংযোগবিধানকারী সেলগুলোতে কোন অনুভূতি নেই। যুবরাজের অন্ধত্বের কারণ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। নিশ্চিত হবার পরও অবশিষ্ট চার পয়েন্টে আমি সুচ প্রবেশ করালাম। রেজাল্ট একই হলো। তবে একটা সুখবরও মিলল।সেটা হলো, ডান চোখের ডানের ডটে এবং বাম চোখের বামের ডটে সুচ ঢোকানোর সময় সুচের আগা সামান্য গেলেও যুবরাজ কিছু ব্যথা অনুভব করেছেন।এর অর্থ চোখ ও মস্তিষ্কের যোগাযোগ মাধ্যম সেল সবটাই সম্পূর্ণ মরে যায়নি। এটা আমার জন্যে বিরাট সুখবর। স্নায়ু ও সূক্ষ্ম সেল শীতলকারী সেই সাথে এ্যান্টিসেপটিক একটা ভেষজ নির্যাস যুবরাজের চোখের উপরের অংশের আহত স্থানগুলোতে মালিশ করে দিয়ে আমি বললাম, ‘এক্সিলেন্সি, আমি শুনেছিলাম আপনি কিছুই দেখতে পান না, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি সামান্য কিছু দেখতে পান। বিশেষ করে বাম চোখের বাম দিক এবং ডান চোখের ডান দিক দিয়ে কিছুটা দেখতে পান আপনি।’

'হ্যাঁ ডক্টর, খুব সামান্য দেখতে পাই। কোন কিছুর ধোঁয়াটে একাংশ। কিন্তু ডক্টর আপনি এটা জানলেন কি করে? খুব উল্লেখযোগ্য নয় বলে কাউকে আমি জানানোর প্রয়োজন বোধ করিনি।' বলল যুবরাজ।

'এক্সিলেন্সি যুবরাজ, আমি যে পরীক্ষা করলাম তাতে আমি এটা বুঝতে পেরেছি।'

বলে উঠে দাঁড়িয়ে আমি সম্রাটের দিকে ফিরলাম। দেখলাম চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে তিনি তাকিয়ে আছেন। আমি তার দিকে ফিরতেই তিনি বললেন, 'ডক্টর আপনি সুচ দিয়ে ফুঁড়েই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। কিভাবে?'

আমি বললাম, 'এক্সেলেন্সি সম্রাট, এটা আমি পরে বলছি। তার আগে একটা কথা বলি, এক্সিলেন্সি যুবরাজের চোখের আঙ্গিকে কোন ক্ষত আমি দেখতে পাচ্ছি না। চোখের দৃশ্যমান সব অঙ্গই সেনসেটিভ। চোখ দু'টি শুকনো এবং আইবলে রিফ্লেকশান নেই এটাই শুধুমাত্র ব্যতিক্রম। এক্সিলেন্সি, আসল সমস্যা, চোখের পেছন থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত সংযোগকারী সেলগুলোতে। এই সেলগুলো রেসপন্স করছে না, সাড়া দিচ্ছে না। এক্সিলেন্সি, আপনার প্রশ্নের উত্তর হলো, সাড়া না দেয়া এই সেলগুলোর মধ্যে বাঁ চোখের বাঁ দিকের এবং ডান চোখের ডান দিকের সেলের একটা অংশ সাড়া দিচ্ছে। সুচ দিয়ে যখন এ সেলগুলোতে আঘাত করা হয়েছে, তখন যুবরাজ কিছুটা ব্যথা অনুভব করেছেন।'

সম্রাট অটো দাঁড়িয়ে গেছেন। বললেন, 'এর দ্বারা কি বুঝা যাচ্ছে ডক্টর? যুবরাজের চোখ ভালো হবে কি না?'

'এক্সিলেন্সি আমি চোখের অবস্থা জানার চেষ্টা করছি। চোখের অসুবিধাটা কোথায়, কি কারণে চোখ কিছু দেখতে পায় না, সেটা আমার কাছে বোধ হয় পরিষ্কার। চোখ ও মস্তিষ্কের সংযোগকারী সূক্ষ্ম সেলের কণিকাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটাই চোখে না দেখার কারণ।

একটা আশার কথা হলো যে, সেলগুলোর কিছুটা এখনও সক্রিয় রয়েছে।' আমি বললাম।

'ধন্যবাদ ডক্টর। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। যুবরাজের অনেক চিকিৎসা আমি করিয়েছি, কিন্তু কেউ চোখের এমন পরীক্ষা করেনি এবং চোখে কেন দেখতে

পায় না তার কারণ কি তা কেউ বলেনি। আপনিই প্রথম একটা কারণের কথা বললেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর। আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আপনার কথা আমাকে আনন্দিত ও আশান্বিত করেছে।' বলল সম্রাট অটো।

'এক্সিলেন্সি যুবরাজকে আমার আরও কতকগুলো প্রশ্ন আছে। আমার খুব অবাক লাগছে চোখ ও মাথার সংযোগকারী মাঝের সেলগুলো এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো কি করে?' আমি বললাম।

'হ্যাঁ ডক্টর, কি জানতে চান আপনি জিজ্ঞাসা করুন। আমাদের উপস্থিতিতে তো সমস্যা নেই?' বললেন সম্রাট চতুর্থ অটো।

'না, না এক্সিলেন্সি, আপনাকেও দরকার। আমি যা জানতে চাই তা আপনি জানতে পারেন।'

বলে একটু থেমেই আবার বললাম, 'এক্সিলেন্সি সম্রাট এবং যুবরাজ, আমার মনে হয় প্রচণ্ড একটা শক-এর কারণে চোখ ও মস্তিষ্কের মাঝের সেলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যুবরাজ চোখে এ ধরনের কোন শক পেয়েছিলেন কি না?'

যুবরাজই দ্রুত বললেন, 'ডক্টর, চোখে কিসের শক, কি ধরনের শক?'

আমি বললাম, 'তীব্র আলোর শকেই এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।'

'আলোর শক? এ ধরনের বড় কোন ঘটনা তো ঘটেনি। যুবরাজ দু'বছর রোমে ছিলেন। এ সময় কি এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেছে যুবরাজ?' বললেন সম্রাট চতুর্থ অটো।

যুবরাজ বললেন, 'এমন কোন ঘটনার কথা তো মনে পড়ছে না।'

আমি বললাম, 'যুবরাজ আপনি কি বিদ্যুৎ চমকের দিকে কখনও পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন?'

'না ডক্টর, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি।'

'কখন থেকে আপনি চোখের অসুবিধা অনুভব করে আসছেন যুবরাজ?' বললাম আমি।

'গত বছরের নভেম্বরের দিক মানে প্রায় এক বছর আগে থেকে চোখের অসুবিধা অনুভব করছি ডক্টর।' বলল যুবরাজ।

‘গত বছরের নভেম্বর থেকে।’ কথা শুনেই আমার মনে পড়ে গেল অক্টোবর মাসের সূর্যগ্রহণের ঘটনার কথা। আমি দ্রুত কন্ঠে বললাম, ‘যুবরাজ, গত বছর অক্টোবর মাসে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। আপনি কি ঐ সূর্যগ্রহণ দেখেছিলেন?’

আমার প্রশ্ন শুনেই যুবরাজ উঠে বসলেন। বললেন, ‘ঠিক ডক্টর, আমি সূর্যগ্রহণ দেখেছিলাম। তখন চোখে সামান্য অসুবিধা হয়েছিল। পরে তা ঠিক হয়ে যায়।’

‘কি ঘটেছিল?’ বললাম আমি।

‘একটা মাটির বড় প্লেটে পানি নিয়ে সবার মত আমিও সূর্যগ্রহণ দেখছিলাম। দেখার পর আমার চোখটা ঝাপসা হয়ে যায়। তবে সন্ধ্যার মধ্যেই আবার চোখ ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়।’ বললেন যুবরাজ।

‘ঠিক হয়ে যায়নি যুবরাজ। প্রাথমিক আঘাতের পর যে ঝাপসা ভাবটা ছিল, তা অল্প সময়ে কেটে যায়। কিন্তু আলোর যে প্রচণ্ড আঘাত চোখের উপর পড়েছিল, সেটাই ক্ষতি করেছে চোখের পেছনের সেলগুলোর। সেলগুলোকে আপাতত প্রাণহীন করে ফেলেছে।’ আমি বললাম।

‘ডক্টর, আপনি বললেন, চোখের সামনের সেল মোটামুটি ভালো আছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চোখের পেছনের সেলগুলো। প্রচণ্ড আলোর কারণে ক্ষতি হয়ে থাকলে চোখের সামনের সেল ক্ষতি হলো না, পেছনের সেল হলো কেন?’ সম্রাট চতুর্থ অটো বললেন।

আমি বললাম, ‘এক্সিলেন্সি, চোখ অনেক অনেক প্রশস্ত। কিন্তু তার পেছনে মস্তিষ্কের সাথে সংযোগকারী সেল-এর চ্যানেলটা অনেক ন্যারো। যে পরিমাণ আলো যে তীব্রতা নিয়ে চোখের উপর এসে পড়েছিল, সেই আলো সেই তীব্রতা নিয়ে যখন চোখের পেছনের সেল-এর ন্যারো চ্যানেলে প্রবেশ করে, তখন স্বল্প পরিসরের চাপে আলোর আঘাতের প্রচণ্ডতা বহুগুণ তীব্রতর হয়ে উঠে। সেই আঘাতে টিস্যুগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।’

সম্রাট চতুর্থ অটো’র মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘ডক্টর, আমি যেমনটা ভাবছিলাম তার চেয়ে আপনি অনেক বড় ডাক্তার। আপনি যে পরীক্ষা করলেন, সে ধরনের পরীক্ষার কথা অন্য কোন ডাক্তার বোধ হয় চিন্তাই

করতে পারেনি। আপনি রোগের যে কারণ ধরেছেন, সে কারণও কেউ ধরতে পারেনি। সত্যি আমি দারুণ বিস্মিত হয়েছি, আপনি এইমাত্র চোখের পেছনের সেল নিষ্ক্রিয় হওয়ার যে কারণ বললেন, তা শুধু বড় ডাক্তার হওয়া নয়, শারীরিকবিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনার দেখা এভাবে আমরা পেয়েছি। এখন বলুন ডক্টর, রোগের কারণ তো জেনেছেন, এখন চিকিৎসা সম্পর্কে বলুন। যে কোন কিছুর বিনিময়ে আমার একমাত্র ছেলে যুবরাজ তার চোখের আলো ফিরে পাক।'

সম্রাটের শেষের কথা ভারি হয়ে উঠেছিল।

'মানুষের কাজ মাত্র চেষ্টা করা ফল দেন স্রষ্টা। ডাক্তাররা সবসময় আশাবাদী হয়। আমিও আশাবাদী সম্রাট। আজ যুবরাজকে আমার দেখা হয়ে গেছে। কাল আমি চিকিৎসা শুরু করব।' আমি বললাম।

পরদিন চিকিৎসা আমি শুরু করলাম। রাতভর আমি ভেবেছি। চোখের পেছনের সেলগুলোকে যদি তাজা না করা যায়, তাহলে যুবরাজের চোখ ভালো হবে না। আর মনে মনে ভাবলাম মরে যাওয়া সেল ভালো করার ট্রেডিশনাল কোন ওষুধ বর্তমান ওষুধ বিজ্ঞানে নেই। ভরসা যে কিছু সেল এখনও জীবন্ত আছে। সেলগুলোতে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী স্টিমুলেটিং কিছু ওষুধ প্রয়োগ করলে জীবন্ত সেল থেকে একটা চাঞ্চল্য মৃত টিস্যুগুলোর উপর ছড়িয়ে পড়তে পারে। তার সাথে সেলগুলোকে ভিজিয়ে রাখার ব্যবস্থা ভালো ফল দিতে পারে। এজন্যে যুবরাজের মাথায় সর্দি সৃষ্টি করতে হবে যাতে নাকের সাথে চোখ দিয়েও প্রচুর পানি গড়ায়। এই চিন্তা মাথায় আসায় আমি খুব খুশি হলাম। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

সকালেই আমি প্রথমেই সম্রাটের বাগান ঘুরে প্রয়োজনীয় ওষুধের গাছ ও সম্রাটের ভাণ্ডার থেকে কিছু অনুপান যোগাড় করলাম। দুই ধরনের ওষুধ তৈরি করলাম। এক, খাবার ওষুধ ও চোখে ফোঁটা আকারে প্রয়োগের জন্যে টিস্যুর উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী স্টিমুলেটিং ওষুধ এবং দুই, মাথায় সর্দি সৃষ্টির জন্যে কপালে লাগানোর জন্যে প্রলেপ। ক্যাথারিনার বাবা সব সময় আমার সাথে থেকে আমাকে সাহায্য করলেন। সেই সাথে সম্রাটের লোক ও চিকিৎসকরাও চাহিদা মোতাবেক সব কিছু সরবরাহ করলেন।

সেদিন বেলা দশটায় সম্রাটের উপস্থিতিতে যুবরাজের চিকিসা শুরু হলো। আল্লাহর কাছে যুবরাজের শেফা প্রার্থনা করে যুবরাজকে ওষুধ খাওয়ালাম এবং চোখেও কয়েক ফোঁটা ওষুধ ফেললাম। পরদিন দুপুরের পর ভাটি বেলা শুরু হলে যুবরাজের কপালে প্রলেপ লাগালাম। এর পরদিন দুপুর থেকেই যুবরাজের ভীষণ সর্দি এল। নাক ও চোখ দিয়ে প্রচুর পানি পড়তে লাগল। সেই সাথে শুরু হলো হাঁচি। ওষুধ খাইয়ে চললাম নিয়ম মত। সর্দিতে বাধা দিলাম না।

উত্তেজনার মধ্যে কাটল সাত দিন। আমি আল্লাহর উপর ভরসা হারাইনি। সাত দিন পর সর্দি কমতে শুরু করল। হাঁচি থাকল না। নাক ও চোখ দিয়ে পানি পড়া বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু অপার আনন্দের মধ্যে দেখলাম চোখ দু'টি আর আগের মত শুকনো নয়। চোখে সজীব-সজলতা ফিরে এসেছে। চোখের পেছনের সেই টিস্যুগুলো জীবন্ত হওয়ার লক্ষণ নিশ্চয় এটা। আমি সম্রাটকে বললাম, এক্সিলেন্সি, আগামী তিন দিন কালো কাপড় দিয়ে যুবরাজের চোখ ঢেকে রাখতে হবে এবং পরবর্তী সাত দিনে সরাসরি আলো প্রবেশ করে না এমন একটা আলো-আঁধারী ঘরে যুবরাজকে রাখতে হবে।

এই ব্যবস্থা করা হলো। দশ দিনের তিন দিন যাবার পর কালো কাপড় চোখ থেকে সরাবার সময় দেখা গেল আলো-আঁধারী ঘরের সব কিছু দেখতে পাচ্ছে, তবে ঝাপসা। সম্রাট আনন্দে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'তুমি অসম্ভব একটা বাঁধনে আমাকে বেঁধে ফেললে। তুমি...।'

আমি সম্রাটকে বাধা দিয়ে বললাম, 'এক্সিলেন্সি, যুবরাজের সামনে এসব কথা আর নয়। তাকে একেবারে শান্ত হতে হবে।' এরপর যুবরাজের কাছে গিয়ে বললাম, 'যুবরাজ আনন্দের কিংবা দু:খের কোন চিন্তাই মনে আনবেন না। মনকে আত্মস্থ করে শুধু ঈশ্বরের কথা ভাবুন।'

'স্যরি ডক্টর। আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি। আপনি ঠিকই বলেছেন। যুবরাজের স্নায়ুতে কোন প্রকার প্রেসার আনা যাবে না। আমি এবং ওর মা-সহ আমরা বরং কেউ এখানে আর না আসি। মি. ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক কোন খবর আপনার তরফ থেকে থাকলে আমাদের জানাবেন।' বলল সম্রাট চতুর্থ অটো।

‘হ্যাঁ, সেটাই ভালো সম্রাট। আমি ঠিক ১১তম দিনে যুবরাজকে আধো অন্ধকার ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যাব। ঐ দিন আপনারা সকলে আসুন।’ বললাম আমি।

এগারতম দিনে সম্রাট এলেন, সম্রাজ্ঞীও এলেন। রাজপরিবারের সবাই এলেন। আগে থেকেই আমি ও ক্যাথারিনার বাবা ছিলাম। আগের দিন আমরা যুবরাজকে ট্রায়াল দিয়েছিলাম তার চোখের ইনডিউর‍্যান্স লেভেল দেখার জন্যে। ঘরের সব জানালা-দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল। আলোতে ঘর ভরে গিয়েছিল। যুবরাজের চোখ সবকিছুই ভালোভাবে দেখেছিল। চোখে তার অসুবিধা হয়নি। যুবরাজকে শোয়া থেকে বসাচ্ছিলাম, তখন সে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, ‘স্যার, আমাকে এক্সিলেন্সি বলবেন না। আপনি আমার কাছে ঈশ্বরের মত। আমার নতুন জন্ম হয়েছে আপনার হাতে।’

আমি যুবরাজকে সান্ত্বনা দিয়ে তার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, যুবরাজ, এসব কথা এখন নয়। আপনাকে আবেগ থেকে মুক্ত ও সম্পূর্ণ শান্ত থাকতে হবে। আমি সামান্য ডাক্তার মাত্র। আমি চেষ্টা করেছি, স্রষ্টা ফল দিয়েছেন, সব সময় তাঁর কথা স্মরণ করুন এবং তাকে ধন্যবাদ দিন।’

এগারতম দিন সকাল ১০টা। সম্রাট, সম্রাজ্ঞীসহ পরিবারের সকল সদস্য ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিল উদগ্রীবভাবে।

আমি যুবরাজকে নিয়ে ঘর থেকে বেরুলাম। আমার পাশে ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক।

ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। ঘরের বাইরে বিশাল একটা লাউঞ্জ, কার্পেটে মোড়া, সোফায় সাজানো। সম্রাট-সম্রাজ্ঞীসহ সকলে লাউঞ্জের মাঝখানে ঘরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমরা দরজায় এসে যুবরাজকে বললাম, আপনি গিয়ে পিতা-মাতা ও সবার সাথে মিলুন। যুবরাজ ওদিকে ওগোলেন।

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর যুবরাজ একে-একে পরিবারের সবার সাথে মিশলেন।

এরপর সকলে মিলে হাঁটু গেড়ে বসে হাত উপরে তুলে প্রার্থনা করতে লাগল। আনন্দে স্রষ্টার অসীম শ্রদ্ধায় সবাই শিশুর মত কাঁদল।

প্রার্থনা শেষে সম্রাট আমাদের ডাকলেন। আমি ও ক্যাথারিনার বাবা সেখানে গেলাম। সম্রাট আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আবেগে কেঁদে ফেলে বললেন, 'ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন আমার এ সন্তানের জন্যেই। তা না হলে আমাদের স্বপ্নের দেশ কর্ডোভার ডাক্তার আমাদের ঘরে আসবেন কি করে! ডক্টর আপনাকে ধন্যবাদ দেবার কোন ভাষা আমার জানা নেই। বিস্ময়কর আপনার রোগের কারণ অনুসন্ধান, আরও বিস্ময়কর আপনার চিকিৎসা!' বলে সম্রাট আমাকে ছেড়ে দিয়ে হাততালি দিলেন।

সুশোভিত এক বড় ট্রে নিয়ে প্রবেশ করল একজন খাস পরিচারিকা এসে বাউ করে সম্রাটের পেছনে দাঁড়াল। সম্রাটের পিএস এসে ট্রের উপরের কাপড় তুলে নিল। ট্রে'তে সোনার উপর হীরকখচিত একটা মুকুট। তার পাশে সম্রাটের ফরমান দণ্ডে লাল কাপড়ে জড়ানো কিছু।

সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা গিয়ে সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম।

সম্রাট ট্রে থেকে প্রথমে ফরমান আকারের বান্ডেলটা খুললেন। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে ঘোষণা দিচ্ছি এখানে, তা আমি দরবারেও দিতে পারতাম। কিন্তু বিষয়টা আমার পারিবারিক। তাই পারিবারিকভাবেই ঘোষণা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

একটু থামলেন সম্রাট। তারপর আবার শুরু করলেন, 'ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তিনি দয়া করে আমার যুবরাজকে নতুন চক্ষু দান করেছেন। আমি ঈশ্বরকে আরও ধন্যবাদ দিচ্ছি এই কারণে যে, যার উপলক্ষে আমি আমার সন্তানের চোখ ফিরে পেলাম, সেই মহান ডক্টর কর্ডোভার মানুষ। কর্ডোভার সুলতানরা ছিলেন আমাদের স্যাক্সন রাজবংশের ঐতিহাসিক মিত্র, যদিও সে সময়ের অবস্থা ও ষড়যন্ত্রের কারণে আমরা দুই মিত্র মিলে বড় কিছু করতে পারিনি। কর্ডোভার এই মহান ডাক্তার যে ঋণে আমাকে এবং স্যাক্সন রাজবংশকে

আবদ্ধ করেছেন তা শোধ করার সাধ্য আমার নেই। তবে তাঁর এই অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে কিছু একটা করার সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি।'

বলে তিনি হাতের ফরমান মোড়কটা খুললেন। পড়লেন ফরমানটা। সম্রাটের সে ফরমানের সারাংশ হলো, 'সালজওয়াডেল অঞ্চলে আমার বিশেষ অমাত্য ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিকের জমিদারির পাশে ৪১ মৌজার মনোরম ভূখণ্ডটি আমি ডাক্তারকে লাখেরাজ হিসেবে দান করলাম। বংশ পরম্পরায় তিনি স্থায়ীভাবে তা ভোগ-দখল করবেন। দু'একদিনের মধ্যে আমি সেখানে নিজে গিয়ে তাকে দখল বুঝিয়ে দেব।'

বলে তিনি এগিয়ে এসে আমার হাতে ফরমানটি গুঁজে দিয়ে বললেন, 'প্লিজ ডক্টর গ্রহণ করুন। আমি ও আমার পরিবার খুশি হবো।'

এরপর সম্রাট ট্রে থেকে মুকুটটি তুলে নিলেন। তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন, আমি মুকুটটি তৈরি করেছিলাম যুবরাজের জন্যে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনেক মাপজোখ করে তৈরি করা সত্ত্বেও মুকুটটি বড় হয়েছে যুবরাজের মাথায়। হয়তো ঈশ্বর সম্মানিত ডক্টরের মাথার জন্যেই এটা তৈরি করিয়েছিলেন। আমি যুবরাজের রোগমুক্তির মহাস্মৃতি হিসেবে মুকটটি ডাক্তারের মাথায় পরিয়ে দিতে চাই।'

সম্রাট এটা বলে-আমি সব কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুকুটটি আমার মাথায় পরিয়ে দিয়ে আমার দু'টি হাত ধরে বললেন, 'ডক্টর আপনাকে সম্মানিত করার জন্যে এ মুকুট নয়, আমরা সম্মানিত বোধ করব যদি দয়া করে এটা নেন। এ মুকুট যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষের ভয়াবহ এক অন্ধত্ব ও বিস্ময়কর এক নিরাময়ের কথা মানুষ স্মরণ করবে। কর্ডোভার মহান জাতি এবং জার্মানীর স্যাক্সনদের সম্পর্কেরও ঐতিহ্যবাহী এক স্মারক হবে এটা।'

এভাবেই আমি একটা জমিদারি ও স্যাক্সন সম্রাটের অকল্পনীয় মূল্যের একটা মুকুটের মালিক হয়ে গেলাম।

যুবরাজের জন্যে সাত দিনের ওষুধের ব্যবস্থা করে সাত দিন পর আবার আসব বলে আমি ক্যাথারিনার বাবার সাথে সালজওয়াডেলে চলে এলাম সম্রাটের দেয়া ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে।

আমি ও ক্যাথারিনার বাবা পাশাপাশি বসেছিলাম। বিভিন্ন কথার ফাঁকে এক সময় বললেন, 'তোমার অনুমতি ছাড়াই একটা আয়োজন করে ফেলেছি। তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

'কি আয়োজন জনাব?' আমি বললাম।

'সেদিন বিয়ের কথা হয়েছিল। আগামী কাল তারই আয়োজন করা হয়েছে। তুমি চিকিৎসার চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত ছিলে তাই তোমাকে কিছু বলিনি।'

বিয়ে হবে এবং খুব শীঘ্রই হবে, সেটা সেদিনের আলোচনায় আমি বুঝেছিলাম। সুতরাং বিষয়টা আমার কাছে বিস্ময়ের ছিল না। তবু আমি বললাম, 'ক্যাথারিনার সুস্পষ্ট মত নেয়া দরকার ছিল, সেটা হয়েছে কি না?'

'আমি ক্যাথারিনাকে জানি বেটা। আমার শ্যালক অসওয়ার্ল্ড তার ভাগ্নিকে না জানিয়ে এ প্রস্তাব পেশ করেনি। তুমি ভেবো না। ক্যাথারিনার মা তার সাথে আলোচনা করেই দিন ঠিক করেছে।'

আমি আর কোন কথা বললাম না। একটা অস্বস্তির ভাব আমার মনকে আচ্ছন্ন করে তুলল। প্রেমময়ী স্ত্রীর স্মৃতি ডিঙিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্যেই কি এই অস্বস্তি? না, মন তা বলছে না। নতুন স্ত্রী যে নেই তার স্মৃতির প্রতিদ্বন্ধী হতে পারে না।

আমার চিন্তায় ছেদ টেনে ক্যাথারিনার বাবা বলে উঠলেন, 'একটা সমস্যা হয়েছে আলগার। ক্যাথারিনা বলেছে, 'বিয়ে ইসলাম ধর্মের বিধান মতে হবে। কিন্তু...।'

তাঁর কথার মাঝখানেই আমি বলে উঠলাম, ক্যাথারিনা বলেছেন একথা?'

'হ্যাঁ আলগার, তার মায়ের কাছে শুনেছি সে ইসলাম ধর্ম মোতাবেক চলার চেষ্টা করছে।' বললেন ক্যাথারিনার বাবা।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই কথা শোনার সাথে সাথেই আমার মনের অস্বস্তি কোথায় যেন চলে গেল। মনটা আমার স্বচ্ছ হাসিতে হেসে উঠল।

ক্যাথারিনার বাবা একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'কিন্তু সমস্যা হয়েছে বিয়ের ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের বিধান তো আমরা কেউ জানি না। শেষে এটাই

আলোচনা হয়েছে। তুমি যেভাবে বলবে সেভাবেই বিয়ে হবে। আচ্ছা বলত, ইসলাম ধর্মের বিয়েতে আনুষ্ঠানিক জটিলতা কিছু আছে?

'জটিলতার কিছু নেই। তবে বর ও কনেকে তাদের স্বীকৃতি জিজ্ঞাসা করার জন্যে বিয়ের পরিচালক একজন লোকের দরকার হয়। বর-কনের স্বীকৃতি জানার জন্যে উভয় পক্ষের তিনজন করে মোট ছয়জন সাক্ষী উপস্থিত থাকতে হয়। প্রথমে কনের স্বীকৃতি আসার পর তা সবার সামনে ঘোষণা করে তারপরে সবার সামনে বরের স্বীকৃতি নেয় হয়। এরপর বিয়ের পরিচালক ব্যক্তি বর-কনের শুভ কামনা করে সবাইকে নিয়ে দোয়া করেন। বিয়ের মূল অনুষ্ঠান এতটুকুই।' আমি বললাম।

'দুই পক্ষের সাক্ষীর তো অভাব হবে না, কিন্তু পরিচালক ব্যক্তিটি কে হবেন, কে স্বীকৃতি নেবেন, কে দোয়া করবেন। এটা সমস্যা হবে না?' বললেন ক্যাথারিনার বাবা।

'এ সমস্যাগুলো মৌলিক নয়। বর-কনের স্বীকৃতি নেয়ার কাজ আপনিও করতে পারবেন। স্বীকৃতি নেয়ার কথাগুলোও খুব সাধারণ। আমি বলে দেব। দোয়া নিজেরা করলেও চলে, আর সকলের শুভেচ্ছা কামনাটাই তো দোয়া।' আমি বললাম।

'তাহলে আর কোন সমস্যা নেই। ধন্যবাদ আলগার। আমি চিন্তায় পড়েছিলাম এসব নিয়ে।'

আমরা বাড়ি পৌঁছে গেলাম। পরদিন বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দিন সকালে ক্যাথারিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অজু করার নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছিলাম আমি আগেই। মাথায় রুমাল বেঁধে ও হাতাওয়ালা পবিত্র পোশাক পরে পরিবারের সবার উপস্থিতিতে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল ক্যাথারিনা। হঠাৎ কি হয়ে গেল। পরিবারের কর্তা ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক ঘোষণা দিলেন তিনিও ইসলাম গ্রহণ করবেন। তারপর পরিবারের সবাই ঘোষণা দিল তারাও সবাই ইসলাম গ্রহণ করবে। আমার সামনে ঘোষণা দিয়ে সবাই ইসলাম গ্রহণ করল ক্যাথারিনার মতই। সবাই ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'ইহুদি, খৃস্টানসহ অতীতের সব

একত্ববাদী ধর্মকে ইসলাম স্বীকার করে, অতীতের সব নবী-রাসূলকে ইসলাম সম্মান করে। অতীতের এই ধর্মগুলোকে যারা পালন করে চলতে চায়, তাদের সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই। তবে ইসলাম নীতিগত ও স্বাভাবিক কারণেই মনে করে, অতীতের ধর্মগুলোর কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে। সর্বকনিষ্ঠ ও সামনের সর্বযুগের জন্যে পরিকল্পিত ধর্ম হিসেবে ইসলাম মানুষের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক দুই জীবনের জন্যেই অপরিহার্য একটা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা ইসলাম আল্লাহর কোন কল্যাণ করে না, এই ব্যবস্থা ইসলাম গ্রহণকারী ও সব মানুষের কল্যাণের জন্যেই। এই কল্যাণ মানুষের ইহকাল ও পরকাল দুই কালের জন্যেই। এই মূল বিষয়টা বুঝে নিলে ইসলাম ও মানুষ, ইহজীবন ও পরজীবন সবকিছুকেই ভালোবাসা যাবে, জীবন সুন্দর হবে, সহজ হবে।'

আমার কথা শেষ হলে ক্যাথারিনার বাবা সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'নানা কারণে আমাদের ইসলাম গ্রহণের এই কথা এখন গোপন রাখতে হবে। সবাই যেন আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকি।'

বিয়ের পর যখন আমার ঘরে এসে বসলাম, তখন মাথাটা নুয়ে এল আল্লাহর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায়। স্বাধীন মানুষ ছিলাম, খ্যাতিমান ডাক্তার ছিলাম। সেখান থেকে পেশা, পরিবার, দেশ সব হারিয়ে হলাম ক্রীতদাস। আবার ক্রীতদাস থেকে হলাম এক জমিদার এবং একজন জমিদার কন্যার স্বামী। মহান আল্লাহর বাণী, 'ফাইন্নামা'আল উসরে ইউসরা, ইন্নামা'আল উসরে ইউসরা' অর্থাৎ 'দু:খের পর সুখ আসে'।

বিয়ের পর স্ত্রী ক্যাথারিনার সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় নানা কথার ফাঁকে তাকে বললাম, 'ক্রীতদাসের সাথে বিয়ের পর মালিক-কন্যার প্রতিক্রিয়া কি?'

ক্যাথারিনা বলল, 'যে ক্রীতদাস তার মালিকদের দাস বানিয়ে ফেলেছে, তার সাথে বিয়ে তো সৌভাগ্যের ব্যাপার।'

'মালিকদের কিভাবে সে দাস বানাল?' আমি বললাম।

'আল্লাহ বলেছেন, যে মুমিন হয়, আল্লাহ তার জান, মাল সব কিনে নেন। আপনি সবাইকে মুমিন বানিয়ে তাদেরকে আল্লাহর ক্রীতদাস করে ফেলেছেন।' বলল ক্যাথারিনা।

আমি হাসলাম। বললাম, 'আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথার অর্থ ঠিক এতটুকু নয়। যাক তুমি ভালো বলেছ।'

ক্যাথারিনা বলল, 'আমার কথা শেষ নয়। আমার উত্তরের মাত্র একাংশ বলেছি।'

'আচ্ছা। বল বাকি অংশ কি?' জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'ক্রীতদাসকে আমি বিয়ে করিনি। ক্রীতদাসের সাথে আমার বিয়ে হয়নি। একজন স্বাধীন মানুষ এবং একজন জমিদারের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে।' বলল ক্যাথারিনা।

সেদিন আমার স্ত্রী ক্যাথারিনার কাছ থেকে শোনা কথা দিয়েই আমার এই ছোট্ট আত্মকথা শেষ করব। আমি দাস হিসেবে বিয়ে করিনি, দাস হিসেবে আমার পরিবার-জীবনের যাত্রা শুরু হয়নি, হয়েছে স্বাধীন মানুষের স্বাধীন পরিবার হিসেবে। এই কথাগুলো এভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। বলতে হলো এই কারণে যে, অন্ধকার ইউরোপের অন্ধ-কূপমণ্ডুকতা কাটতে আরও অনেক শতাব্দীর প্রয়োজন হবে। সেই অন্ধকারে আমার পরিবারও নিজেদের হারিয়ে ফেলতে পারে। তারাও কূপমণ্ডুকতার শিকার হয়ে হীনমন্যতায় ভুগতে পারে। এমন সব দিনের কথা ভেবেই আমি আমার জীবনের কথা লিখে গেলাম যাতে তাদের আবার আলোকিত হয়ে ওঠার পথ তৈরি হয়, নিজের পরিচয় নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার তারা সুযোগ পায়।'

পড়া শেষ করলো আহমদ মুসা।

খাতার উপর থেকে মুখ তুলল সে। তাকাল চারদিকে। দেখল, সবার মুখ নিচু। চোখ বন্ধ আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগারের। সবাই আত্মস্থ।

ধীরে ধীরে চোখ খুলে গেল আদালার বাবা আলগারের। সে সোজা হয়ে বসল। বলল, 'আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি এই মুহূর্তে ঘোষণা দিতে চাই-।'

উপস্থিত সবাই তাকাল আদালার বাবার দিকে। তাদের চোখে-মুখে ঔৎসুক্য।

আদালার বাবা বললেন, 'ঈশ্বরের অসীম দয়া যে, আমরা আমাদের রুটের সন্ধান পেলাম, পূর্বপুরুষকে জানলাম। আমরা জানলাম আমরা দাসবংশের লোক নই। হলেও ক্ষতি ছিল না। সোনালি সভ্যতার স্বর্ণযুগের মানুষ, সেরা ডাক্তার ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুরের বংশধর হয়ে দাসবংশ নাম নিতেও আমার আপত্তি নেই। সবাইকে আমি জানাচ্ছি, আমার মহান পূর্বপুরুষ যে আলোকিত পথের দিকে তাঁর পথহারা বংশধরদের আহবান জানিয়ে তার কাহিনী শেষ করেছেন, তাঁর সে আহবানে সাড়া দিয়ে আমি ঘোষণা করছি, আমি আমার পূর্বপুরুষের ধর্মে এই মুহূর্তে ফিরে যেতে চাই এবং ঘোষণা দিচ্ছি আজ থেকে আমার নাম জোসেফ জ্যাকব আলগার নয়, আমার নাম ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর।'

বলে আদালার বাবা ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্লিজ আহমদ মুসা আমাকে আপনি ইসলাম ধর্মের দীক্ষা দিন। কোন ফর্মালিটি থাকলে প্লিজ আমাকে বলুন। আমি তা করছি।'

'ইসলাম গ্রহণে তেমন কোন ফর্মালিটি নেই। বিষয়টা একটা বিশ্বাস ও স্বীকৃতির ঘোষণা। শুধু বিশ্বাসের সাথে এই ঘোষণা দিলেই হলো।'

'ঘোষণাটা কি?' বলল আদালার বাবা ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর।

'বিশ্বাসের সাথে এই ঘোষণা দেয়া যে, 'আল্লাহ ছাড়া উপাস্য কেউ নেই, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বার্তাবাহক।' এই ঘোষণা এভাবেও দেয়া যায়, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া উপাস্য কেউ নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর প্রেরিত বার্তাবাহক (রাসূল) ।'

আদালার বাবা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই আদালা বলে উঠল, 'বাবা শুধু আপনার কথা বললেন কেন? আমাদেরও সাথে রাখুন। আমাদের মহান পূর্বপুরুষের ডাক আমাদের কাছেও পৌঁছেছে। আমরাও সেই আলোকিত মানুষ হতে চাই।'

‘ঠিক বলেছ আদালা। রক্তের সম্পর্কে আমার পূর্বপুরুষ তারা নন বটে, কিন্তু আমার স্বামী ও সন্তানের তারা পূর্বপুরুষ। তাই তাঁরাও আমার পূর্বপুরুষ। যেভাবে ক্যাথারিনার বাবা, ক্যাথারিনারা আমাদের ডক্টর পূর্বপুরুষের ধর্মকে ভালোবেসে ফেলেছিল, সেভাবে আমিও ভালোবেসে ফেলেছি। বিশ্বাসের ঘোষণা দিতে আমি প্রস্তুত।

আদালা, আদালার বাবা এবং আদালার মা একসংগেই বিশ্বাসের ঘোষণা দিয়ে নিজেদের ধর্মে ফিরে এল।

ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডের চোখে-মুখে বিমুগ্ধ ভাব। বলল আলদুনি সেনফ্রিড, আদালার পূর্বপুরুষের যে কাহিনী শুনলাম তা রূপকথার মত সুন্দর, কিন্তু ইতিহাসের মত বাস্তব। আহমদ মুসাকে দেখার পর ডক্টর ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুরকে বিস্ময়কর মনে হয়নি, কিন্তু তার কাহিনী ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরও পূর্ণ ও মজবুত করেছে। ধন্যবাদ আপনাদের, যারা বিশ্বাসের ঘোষণা দিলেন।’

‘আমিও ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাদের। আমরা আপনাদের সাথে শামিল আছি। আমরা একটা সংকটে রয়েছি। আমাদের পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মহাবিপদে আছেন। তার সাথে আমাদের পরিবারের গোটা অস্তিত্ব ধ্বংসের মুখে পড়েছে। আজ আপনাদের পরিবারে মিলনমেলার মত আনন্দের দিন, আমরাও তেমন দিনের অপেক্ষা করছি। সেদিন আমরা সকলে মিলে এই ঘোষণা দেব ইনশাআল্লাহ। মহাআনন্দের বিষয় হলো, আহমদ মুসা আজ আপনাদের জন্যে আনন্দের দুয়ার উন্মুক্ত করলেন। আমাদের আশা তিনি আমাদের জন্যেও এমন সুদিন ডেকে আনবেন।’ বলল ব্রুনা।

‘মাফ করবেন, আপনারা আমাদের অসীম উপকার করেছেন। প্লিজ আমরা কি জানতে পারি, এতবড় বিপদের ঘটনাটা কি?’ বলল আদালার বাবা ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর।

আলদুনি সেনফ্রিড তাকালো আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বুঝল এখন করনীয় কি, কি বলা যায় এটাই জানতে চাচ্ছে ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড।

দায়িত্বটা আহমদ মুসাই গ্রহণ করল। বলল, 'অনেক বড়, অনেক জটিল ঘটনা মি. আল মানসুর।'

বলে আহমদ মুসা সংক্ষেপে ঘটনা তাদেরকে জানাল। এ কথাও বলল যে, তারা ব্রুনার মা কারিনা কারলিনের সন্ধানে ব্ল্যাক লাইট , ব্ল্যাক বার্ডের আস্তানার খোঁজেই অ্যারেন্ডসীতে যাচ্ছে। কাহিনী শুনে আদালা, আদালার মা ও আদালার বাবা সবার চোখে-মুখে মুষড়ে পড়া ও বিব্রত ভাব ফুটে উঠল। আদালার মা বলল, 'এতবড় সংকট মাথায় নিয়ে আপনারা এতটা শান্তভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আল্লাহ এর উত্তম বিনিময় দিন।'

আদালার বাবা আল মানসুরের চোখে-মুখে অস্থির একটা ভাবনা। কিছু যেন খুঁজছে সে। হঠাৎ কিছু খুঁজে পাওয়ার মত চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার।

'কি বললেন, ব্ল্যাক লাইট?' বলল আদালার বাবা আল মানসুর।

'হ্যাঁ, ব্ল্যাক লাইট, আর দলের নেতা 'ব্ল্যাক বার্ড।' এমন নাম কি কোথাও শুনেছেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'হ্যাঁ, মি. আহমদ মুসা আমার মনে পড়ে গেছে। বেশ অনেক দিনই মানে এক বছর আগে বড়দিনের ছুটির পরদিনই নিওর্যালজিক পেইন নিয়ে হামবুর্গ হাসপাতালে নিওর্যালজিক বিভাগে ভর্তি হয়েছিলাম। আমার কেবিনের পাশের কেবিনে আরেকজন মহিলা ভর্তি ছিলেন। আমার কেবিনটা সারির একদম দক্ষিণ মাথায় ছিল। সারির পুব পাশ বরাবর দীর্ঘ করিডোর। করিডোরটা ঘুরে এসে আমার কেবিনের দক্ষিণ পাশে একটা বারান্দার সৃষ্টি করেছিল। কেবিনের একটা জানালাও দক্ষিণ দিকে ছিল। এয়ারকন্ডিশনের কারণে জানালা বন্ধই থাকে। কিন্তু দিনের বেলা আমি মাঝে মাঝে জানালা খুলে দিতাম ফ্রেশ বাতাসের জন্যে। এতে আমার খুব ভালো লাগত। মহিলাটির কেবিন আমার পরেই, মানে দক্ষিণ দিক থেকে দ্বিতীয়। মহিলাটির কেবিনের অ্যাটেনড্যান্ট কিংবা যারা ভিজিটর আসত, তারা প্রায়ই দক্ষিণের উন্মুক্ত বারান্দাটায় আসত। তাদের কারো কথোপকথনের মধ্যে 'ব্ল্যাক লা্ইট' শব্দটা আমার কানে গিয়েছিল।' বলল আদালার বাবা ইউসুফ আল মানসুর।

‘ধন্যবাদ স্যার। কথোপকথনগুলোর কিছু কি আপনার মনে আছে?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘মনে আছে মি. আহমদ মুসা। রোগশয্যায় শুয়েছিলাম। মাথার কোন কাজ ছিল না। আর জানালার ওপাশেই কথা হচ্ছিল, যদিও নিচু স্বরে কথা বলছিল তারা। কিন্তু নীরব পরিবেশে কথা শুনতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি।’ বলল আদালার বাবা।

‘কি কথা বলছিল তারা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি যখন কথাগুলোর দিকে মনোযোগ দিয়েছিলাম, তখন একজন বলছিল, ‘...ব্যাপারটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। নকল একজনকে এনে রাখতে হবে, আসলকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আসলের আত্নীয়-স্বজনের কাছে ধরা পড়ে যাবার আশংকাই বেশি। চেহারা এক রকমের হলেই হবে না, স্বামী-ছেলে-সন্তানরা কথা বললে, গায়ে হাত দিলেই বুঝতে পারবে আসল-নকল। ম্যাডাম কারলিন বনেদী জমিদার ঘরের একজন। ধরা পড়লে আস্ত থাকবে না।’ এ কথা শোনার পর আরেকটা কন্ঠ সংগে সংগে বলে উঠল, ‘ব্ল্যাক লাইটকে আপনি চেনেন না। তাদের কাজে কোন খুঁত থাকে না। যাকে নকল বলছেন, সে আসলের চেয়েও আসল। তাকে পঁচিশ বছর ধরে তৈরি করা হয়েছে।’ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথ শেষ করলে প্রথম ব্যক্তি আবার বলল, ‘যাই বলুন, কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ। আমি মনে করেছিলাম বিষয়টা একজনকে কিডন্যাপের। এটা কঠিন নয়। একজনকে কিডন্যাপ করে তার জায়গায় আরেকজনকে বসানো খুব কঠিন, খুব ঝুঁকিপূর্ণ। বিষয়টা পুরোপুরি আমাকে আপনারা জানাননি।’ প্রথম জনের এই কথার উত্তরে দ্বিতীয়জন বলল, ‘দেখুন ব্ল্যাক লাইট কাউকে অনুরোধ করে না, নির্দেশ দেয়। আমি যা করতে চাই তা করব। আপনাকে যা করতে বলা হয়েছে আপনি তা করবেন। সামান্য অসহযোগিতা যদি করেন তাহলে আপনিসহ আপনার গোটা গোষ্ঠীকে আমরা শেষ করে দেব। মনে আছে তো কি করতে হবে। আবার শুনুন, রুমের সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল করতে হবে, নার্স আসলকে প্রেসক্রাইবড ইনজেকশন দেয়ার নামে বেহুসের ইনজেকশন দেবে। এরপর আপনি আসলকে কাপড়ে মুড়ে রুম ড্রেসিং-এর ট্রলি গাড়িতে তুলে স্টোরে নিয়ে রাখবেন। সেখান থেকে লন্ড্রিখানার

গাড়িতে করে আসলকে আপনি হাসপাতালের পেছনে এক তলায় নিয়ে যাবেন। সেখান থেকে তাকে গার্বেজের গাড়িতে তুলে হাসপাতালের বাইরে নেবেন। তার পরের দায়িত্ব ব্ল্যাক লাইটের।' দ্বিতীয় জন থামলেও প্রথম জনের কন্ঠ শোনা গেল না। মনে হয় সে ভয়ে তার কথায় রাজি হয়ে গেছে।' থামল আদালার বাবা।

'এসব কথা কার ব্যাপারে বা কোন কক্ষের রোগীর ব্যাপারে তা কি আপনি বুঝতে পেরেছিলেন?' জিজ্ঞাসা আলদুনি সেনফ্রিডের। তার চোখে-মুখে বিস্ময় উত্তেজনা।

'তা আমি নিশ্চিত বুঝতে পারিনি। প্রথমে আমার পাশের কক্ষের রোগীর সাথে তাদের কথার সম্পর্ক আছে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা অন্য কক্ষের রোগীর ব্যাপারেও হতে পারে।' বলল আদালার বাবা আল মানসুর।

'হামবুর্গের হাসপাতাল বিরাট। কয়েকটা 'রো' রয়েছে সেখানে। আপনি কত নাম্বার কক্ষে ছিলেন?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'আমার রুম নাম্বার ছিল চারশ' এক। 'বলল আদালার বাবা আল মানসুর।

'আর ঐ সময় আমার ওয়াইফ ব্রুনার মা ভর্তি ছিলেন ৪০২ নাম্বারে। তার মানে এই ষড়যন্ত্রটা আমার ওয়াইফ কারিনা কারলিনাকে নিয়ে। তাহলে...।'

কথা শেষ করতে পারল না আলদুনি সেনফ্রিড। তার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল আবেগ জড়িত এক বেদনার উচ্ছ্বাসে।

'হ্যাঁ, মি. সেনফ্রিড, এতে এখন আর কোন সন্দেহ নেই ষড়যন্ত্রটা ব্রুনার মাকে নিয়েই হয়েছে। একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল মি. সেনফ্রিড যে, ব্রুনার মাকে সরিয়ে সেখানে নকল একজন ব্রুনার মায়ের ছদ্মবেশে সেট করা হয়েছিল। আর নকল একজনকে ২৫ বছর ধরে তৈরি করা হচ্ছিল এই কাজের জন্যে। আর ২৫ বছরের কথায় এটাও এখন পরিষ্কার যে, ব্রুনার মায়ের জায়গায় বসানো নকল মহিলাটিকে ক্লোন করে তৈরি করা হয়। ক্লোন করে তৈরি করা বলেই তার ক্লোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছে।' বলল আহমদ মুসা।

'পঁচিশ বছর আগে কার ক্লোন করে তাকে তৈরি করা হয়? ব্রুনার মায়ের?' জিজ্ঞাসা আলদুনি সেনফ্রিডের। বিস্ময়ে তার চোখ যেন কপালে উঠেছে।

‘ব্রুনার মায়ের ক্লোন না হলে সে হুবহু ব্রুনার মায়ের মত হতো না, এটা তো সত্য।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্ত কিভাবে? এটা অসম্ভব একটা ব্যাপার!’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘হতে পারে সেটা আরেক ষড়যন্ত্র।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ষড়যন্ত্রটা ব্রুনার মাকে নিয়ে হলো কেন?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘কারণ, ব্রুনার মা জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা এস্টেট-এর মালিক।’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ, সেটা তো ওরা দখল করেছে মি. আহমদ মুসা।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

বলেই সে আবার প্রশ্ন করল, ‘কিন্তু ক্লোন কিভাবে করেছে?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটু চুপ করে থেকে আহমদ মুসা বলল, ‘মি. সেনফিড, আপনি কিংবা ব্রুনা বলেছিলেন অনেক বছর আগে ব্রুনার মা আরও একবার ঐ হামবুর্গ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তখন তিনি বন বিশ্ববিদ্যালয়ে সবে প্রবেশ করেছেন। বয়স আঠার উনিশ ছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগেই ব্রুনা বলে উঠল, ‘আমিই আপনাকে বলেছিলাম ভাইয়া। কথাটা মা আমাকে নিজে বলেছিলেন।’

‘ধন্যবাদ ব্রুনা। এখন ওদের ২৫ বছরকে যদি তোমার মায়ের সেই ১৮ বছরের সাথে যোগ দেয়া হয়, তাহলে যোগফল পাওয়া যাচ্ছে ৪৩ বছর, সেটাই তোমার মায়ের আসল বয়স কি না?’ বলল আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ, ঠিক তাই।’ ব্রুনা ও তার বাবা একসংগে বলে উঠল।

‘তাহলে আমি নিশ্চিত, ব্রুনার মা আঠার-উনিশ বছর বয়সে যখন হামবুর্গ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, তখনই কিছু ঘটেছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি ঘটেছিল মি. আহমদ মুসা?’ বলল ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড।

‘আমার মনে হয়, ক্লোন করার ঘটনাটা তখনই ঘটানো হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আবারও সেই প্রশ্ন করছি মি. আহমদ মুসা। চিকিৎসার জন্য ভর্তি হওয়া একটা মেয়ের ক্লোন করা কিভাবে সম্ভব?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘কিভাবে করেছে, সেটা আমি জানি না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, একটা মেয়ের ডিম্বাণু, এমনি তার বিশেষ টিস্যু যদি কোনভাবে সংগ্রহ করা যায়, তাহলে বিশেষ প্রসেসের মাধ্যমে অন্য কোন গর্ভাশয়ে ফেলে ক্লোন তৈরি করা সম্ভব। গোপনে হয়তো বিজ্ঞান আরও এগিয়ে থাকতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা থামলেও কথা বলল না ব্রুনা, কিংবা ব্রুনার বাবা। বিস্ময়ে বিমূঢ় তাদের চোখ-মুখ।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল, ‘হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কেউ অথবা ডাক্তার বা সংশ্লিষ্ট কেউ ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকলে সহজেই ডিম্বাণু ও টিস্যু সংগ্রহের কাজটা করা যায়। আমার মনে হয় সেটাই ঘটেছে।’

‘টিস্যু সংগ্রহ সহজ, ডিম্বাণু সংগ্রহ তো সহজ নয়।’ আলোচনায় যোগ দিয়ে বলল আদালার বাবা আল মানসুর।

‘অজ্ঞান বা আধা অজ্ঞান করে, বা কোন মাদক খাইয়ে চেতনা ও বুদ্ধি একদম ভোঁতা করে দিয়ে, অথবা কোন ওষুধ খাইয়ে চেতনা ও বুদ্ধিকে বিকৃত বা অস্বাভাবিক করে দিয়ে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা সম্ভব। আমরা জানি না, চিকিৎসাবিজ্ঞানের হয়তো আরো কৌশল আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক বলেছেন মি. আহমদ মুসা। এ রকমটা হতে পারে। থাক এ প্রসংগ, এখন আমাদের করনীয় কি দাঁড়াচ্ছে?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘আমি ভাবছি মি. সেনফ্রিড, অ্যারেন্ডসীতে এখনি না গিয়ে আগে আমাদের হামবুর্গ যাওয়া দরকার।’

থামল একটু আহমদ মুসা। একটু ভাবল। আদালার বাবার দিকে চেয়ে কিছু দ্রুত কন্ঠে বলল, ‘আপনি জানালার ওপারে যাদের কথা শুনেছিলেন, তাদের প্রথম লোক তা হাসপাতাল প্রশাসনেরই কেউ। আপনি কি চিনতে পেরেছিলেন তাকে?’

‘আমি তখন চিনতে পারিনি। কিন্তু তার কথা শুনে আমি তাকে পরে চিনতে পেরেছিলাম। তিনি হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলোর চীফ সুপার। নাম আলদুস আলারী। হাসপাতালের খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি। ডাক্তাররাও তাকে সমীহ করে চলে।’ বলল আদালার বাবা আল মানসুর।

'বয়স কেমন? কত বছর তিনি হাসপাতালে আছেন?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'তার বয়স বলা কঠিন। তার আড়ালে সবাই বলে, লোকটা কোন দিন বুড়ো হবে না। আঠার বছর বয়সে ওয়ার্ডক্লার্ক হিসেবে হাসপাতালে যোগ দেন, তারপর ৩২ বছর ধরে সে আছে হাসপাতালে। এই হিসেবে তার বয়স দাঁড়ায় ৫০ বছর। কিন্তু দেখলে মনে হয় ৪০ বছরও হবে না।' বলল আদালার বাবা আল মানসুর।

'উনি কি ক্যাম্পাসেই থাকেন?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'না, হাসপাতাল ক্যাম্পাসে কোন রেসিডেন্স নেই, সবাই বাইরে থাকেন।' বলল আদালার বাবা।

'ধন্যবাদ মি. আল মানসুর। আপনার কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য আমরা পেলাম।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা তাকাল ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে। বলল আহমদ মুসা, 'মি. সেনফ্রিড আমাদেরকে অ্যারেন্ডসী নয়, প্রথমে হামবুর্গ যেতে হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'হামবুর্গ? আলদুস আলারীর সন্ধানে? আপনি যেটা বলবেন সেটাই হবে আহমদ মুসা।' বলল ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড।

'ধন্যবাদ!' বলে ব্রুনার বাবার দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিল আদালার বাবা আলা মানসুরের দিকে। বলল, 'স্যার, এবার আপনার অনুমতি চাই, আমাদের উঠতে হবে।'

সংগে সংগে উত্তর দিল না আদালার বাবা। আহমদ মুসার কথার সাথে সাথে গভীর একটা ম্লান ভাব ফুটে উঠেছিল তার চোখে-মুখে। একটুক্ষণ নীরব থেকে সে বলল, 'আমার এতক্ষণ মনেই হয়নি যে, আপনারা চলে যাবেন। আপনার সামনেই, বলা যায়, আপনার হাতেই আমার পরিবারের নবজন্ম হলো্। এই নবজন্মের এই মুহূর্তে আপনি আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। আপনাকে আমরা ছাড়ব কি করে?' ভারি হয়ে উঠেছিল আদালার বাবা আল মানসুরের গলা।

‘স্যার, আমারও মনে হয়নি, আমরা আপনাদের থেকে আলাদা কেউ। এখনও তাই মনে করছি। কিন্তু স্যার, আপনি জেনেছেন, আমরা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা মিশনে আছি। প্রতি মুহূর্ত আমাদের জন্যে মূল্যবান।’ আহমদ মুসা বলল।

‘অবশ্যই আহমদ মুসা। অবশ্যই একটা মুহূর্তও আপনাদের নষ্ট করা ঠিক নয়। কিন্তু এটাই কি আমাদের শেষ দেখা? এটা তো আমরা সহ্য করতে পারছি না।’ বলল আদালার বাবা আল মানসুর।

‘আর দেখা হবে না, কিংবা আবার দেখা হবে কোনটাই বলা যাবে না মি. আল মানসুর। এটা আল্লাহর হাতে যিনি আমাদের সকলকে পরিচালনা করেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘প্লিজ স্যার, আপনি এসব কথা বলবেন না। বলুন আবার দেখা হবে। মানুষ আশা নিয়ে বাঁচে। আমরাও আমাদের জন্যে আশা চাই। স্যার, আমরা হয়তো আপনার চলার পথের ক্ষণিকের দৃশ্য। কিন্তু আমি, আমরা আপনাকে সে রকম ভাবতে পারছি না। সারাজীবন দেখেও অনেক দেখা হৃদয়ে দাগ কাটে না, কিন্তু সামান্য সময়ের অনেক দেখা চিরদিনের জন্যে হৃদয়ে দাগ কেটে বসে। যদি বলেন ইনশাআল্লাহ দেখা হবে, তাহলে আশার সান্ত্বনা আমাদের বেদনায় একটা প্রলেপ হয়ে দাঁড়াতে পারে।’ বলল আদালা। তার কথায় গভীর আবেগ।

‘তুমি ঠিক বলেছ আদালা। বিদায়ের সময় ‘আবার দেখা হবে’ বলাই সঙ্গত। আর বান্দাহ আশা করুক আল্লাহ এটাই চান। ধন্যবাদ আদালা।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে হঠাৎ একটা ভাবান্তর দেখা দিল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মুখ নিচু করে তৎক্ষণাৎ আবার মুখ তুলে আলদুনি সেনফ্রিডকে বলল, ‘আমি একটা কথা ভাবছি মি. সেনফ্রিড। আমি মনে করছি, আপনি ও ব্রুনা এখানে থেকে যান, আমি হামবুর্গ থেকে ঘুরে আসি।’

সংগে সংগে উত্তর দিল না ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড। একটু ভেবে নিয়ে বলল, ‘এতে ভালো দিক কি মি. আহমদ মুসা।’

‘ভালো দিক তেমন কিছু নেই। আমার ওখানে যে কাজ, আর তাতে যে সময় লাগবে-ততক্ষণ আপনারা এখানে অপেক্ষা করতে পারেন। এর একটা

ভালো দিক আছে, সেটা হলো আপনাদের নিয়ে বিপদের বাড়তি একটা চিন্তা আমার থাকবে না। আমরা যদি সেখানে ব্ল্যাক লাইট-এর নজরে পড়ে যাই, তাহলে তো সর্বশক্তি নিয়ে আমাদের উপর ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। আপনারা এখানে অপেক্ষা করলে আমাদের বিপদের পরিধি কমবে।' আহমদ মুসা বলল।

'কমবে! তার মানে বিপদের সবটুকু আপনার উপর নিতে চান?' বলল ব্রুনা ভারি গলায়।

'না ব্রুনা, ওখানে আমার উপর যে বিপদ আসবে, তোমরা ওখানে না থাকলে সে বিপদ আমার বাড়বে না।' আহমদ মুসা বলল।

'আমার স্ত্রী হামবুর্গ হাসপাতালে ছিল। আমি তাকে অ্যাটেন্ড করেছি। আপনার যে কাজ, তাতে আমিও কাজে হয়তো লাগতে পারি।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'মি. আলদুনি সেনফ্রিড, আপনি ঠিক বলেছেন। এ দিকটা আমার মাথায় আসেনি। ধন্যবাদ আপনাকে। তাহলে ব্রুনা থেকে যাক এখানে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমার থাকতে আপত্তি নেই, যেহেতু ভাইয়া বলছেন। কিন্তু আপনাদের বা কারও বিপদ হলে জানব কি করে? এ দিকটার কারণে আমি এখানে যে টেনশনে থাকব, তার কষ্ট ওখানে থাকার কষ্টের চেয়ে কম নয়। আর একটা কথা ভাইয়া, বহুদিন পর বাবার সাথে মিলেছি। আবার আলাদা হতে আমার ভয় করছে।'

আহমদ মুসা বলল। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে ব্রুনা।'

বলেই আহমদ মুসা তাকাল আদালার বাবা আল মানসুরের দিকে। বলল, 'স্যার। এবার তাহলে আমরা উঠি।'

'আপনাদের সবকিছু শুনেছি। আমাদের কিছু বলার নেই। শুধু অসীম কৃতজ্ঞতা আপনাদের প্রতি। দুনিয়াটা যদিও চলার পথ, ফেরার পথ নয়। কিন্তু চলার পথেও তো বার বার দেখা হয়। তাই আশা করব, আমার মা আদালা যেমন আশা করেছে, আবার আমাদের দেখা হবে।' বলল আদালার বাবা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

তার সাথে উঠে দাঁড়াল সবাই।
নিচে সিঁড়ির মুখেই আহমদ মুসাদের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল।
সবাইকে সালাম দিয়ে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠল আহমদ মুসারা।

৪

‘৪০২’ নাম্বার কক্ষটিই আপনাদের চাই?’ বলল ডেস্ক এ্যাসিস্টেন্ট।

‘হ্যাঁ, ঐ কক্ষটাই চাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু ঐ সারির সবই ভিভিআইপি কক্ষ। ৪০২-এর চেয়ে ৪০১ নাম্বার কক্ষ তো লোকেশনের দিক থেকে আরও ভালো।’

‘কিন্তু কক্ষটা লাকি। আমার একজন আত্নীয় ওখানে ছিলেন। তার নিরাময় হওয়া ছিল মিরাকল। তাই কক্ষটার প্রতি আমাদের এত টান।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার পরনে খৃস্টান সন্ন্যাসীর পোশাক। মুখ ভরা তার কাঁচা-পাকা দাড়ি। দাড়ির মত গোঁফও তার প্রচুর, ঠোঁটের অস্তিত্বই তা ঢেকে ফেলেছে।

ডেস্কের পাশে এসে দাঁড়াল একজন। ডেস্ক এ্যাসিস্টেন্ট একটু এ্যাটেনশন হয়ে লোকটিকে গুড মর্নিং জানাল ‘স্যার’ বলে সম্বোধন করে।

‘কি বোয়ার, কি সমস্যা?’ বলল এসে দাঁড়ানো লোকটি, উত্তরে গুড মর্নিং বলার পর।

‘না স্যার, তেমন কিছু না। ইনি তার ঐ যে প্যাশেন্ট বসে আছেন তার জন্যে ৪০২ নাম্বার রুমটি চাচ্ছেন। আরেকজনের নামে রুমটি লিখেছিলাম।’ বলল ডেস্ক এ্যাসিস্টেন্ট বোয়ার।

‘দক্ষিণ পাশের রুমটাও তো খালি আছে। ওটা দিয়ে দাও।’ বলল এসে দাঁড়ানো লোকটি।

‘না স্যার। তা নিচ্ছে না। তাদের ধারণা ৪০২ নং কক্ষটি লাকি, তাই ওটাই চায় তারা। ওদের কেউ নাকি একবার এখানে ছিল।’ ডেস্ক এ্যাসিস্টেন্ট বোয়ার বলল।

সাধারণ কৌতূহলবশেই আহমদ মুসা তাকিয়েছিল এসে দাঁড়ানো লোকটির দিকে।

ডেস্ক এ্যাসিস্টেন্টের কথা শুনে লোকটি হাসল। হাসিটা সোজা ও স্বচ্ছ নয়। বলল সে, 'ঘরটা খুব লাকি, এটা ঠিক আছে। তারা যখন চাচ্ছে দিয়ে দাও না। ঐ পক্ষকে পাশের কক্ষটা দিয়ে দিতে পার।'

কথা শেষ করেই সে 'ওকে, বাই বোয়ার' বলে চলে গেল।

লোকটির হাসি এবং কক্ষটি সম্পর্কে তার কথার মধ্যে একটা মিল আছে তা আহমদ মুসার নজর এড়াল না। হাসি ও কথা উভয়ের মধ্যেই একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপও আছে। কিন্তু কেন? বিষয়টি আহমদ মুসার কাছে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা তাকাল ডেস্ক এ্যাসিস্টেন্ট বোয়ার দিকে। বলল, 'লোকটি কে? আপনাদের বস নাকি?'

বোয়ার হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, সবারই বস সে। হাসপাতালে তার মত পুরানো আর কেউ নেই। তিনি হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলোর চীফ সুপার।'

'ওয়ার্ডগুলোর চীফ সুপার? নাম কি?' বলল আহমদ মুসা। মনে মনে সে বলল, ওয়ার্ডগুলোর চীফ সুপারকেই তাদের দরকার।

'উনি আলদুস আলারী।' বলল বোয়ার।

'আলদুস আলারী? তাকে ধন্যবাদ। তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

আলদুনি সেনফ্রিড মাথা ও হাত-পায়ের প্রবল স্নায়ুবিক ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেল। তার সাথে এ্যাটেনডেন্ট হিসেবে থাকল ব্রুনা। আর আহমদ মুসা রোগীর প্রয়োজনের দিকটা দেখ-ভাল করার জন্যে মাঝে মাঝে হাসপাতালে আসবে। এ ধরনের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

রুম সার্ভিসের লোকরা রুমের ড্রেসিং এবং রুমের সবকিছু ঠিকঠাক করে দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর হাসপাতালের বেডে শুয়ে পড়ে আলদুনি সেনফ্রিড বলল, 'মি. আহমদ মুসা, আপনি চমৎকার বুদ্ধি বের করেছেন। আমি মনে করি, আমাদের কাজের জন্যে এর চেয়ে কোন ভালো ব্যবস্থা আর হতো না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

‘ইতিমধ্যে তাকে চেনাও তো হয়ে গেছে। এখন তার সাহায্য পেলেই হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সাহায্য কি করবেন? কেন করবেন? যা তিনি করেছেন সেটা শুধু ভয়ে নয়, টাকার বিনিময়ও নিশ্চয় ছিল।’ বলল ব্রুনা।

‘হ্যাঁ, ব্রুনা ঠিক বলেছ। তাছাড়া সে অবশ্যই স্বীকার করতে চাইবে না যে সে ভয়ানক কাজটিতে জড়িত ছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে? তাকে কেন্দ্র করেই তো আমাদের একটা বড় আশা ছিল।’ বলল ব্রুনা। তার কন্ঠে হতাশার সুর।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ভবিষ্যৎ নিয়ে আগাম হতাশা ঠিক নয়। আর ভাবনার সময় এখনও আসেনি ব্রুনা।’

‘ধন্যবাদ ভাইয়া।’ বলল ব্রুনা হাসতে হাসতে। একটু থামলেও কথা শেষ করল না ব্রুনা। বলে উঠল আবার, ‘একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। আপনি খৃস্টান সন্ন্যাসীর পোশাক কেন নিয়েছেন?’

‘এখানে আমার দু’টি ভূমিকা। খৃস্টান সন্ন্যাসীর কাজ হলো হাসপাতালে তোমাদের খোঁজ-খবর নেয়া। আর আহমদ মুসার কাজ ভিন্ন, যে কাজ নিয়ে আমরা এখানে এসেছি সেই কাজ করা। এক চেহারায় দুই কাজ হতো না ব্রুনা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝেছি। সে কাজ কি তাহলে হাসপাতালের বাইরে?’ বলল ব্রুনা। তার মুখ এবার গম্ভীর। কিছুটা উদ্বেগও তাতে।

‘সেটা ঠিক বলা যাবে না। শুধু বাইরে নয়, হাসপাতালের ভেতরেও আহমদ মুসা কাজ করতে পারে। সেটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি বাইরে থাকবেন কোথায়?’ জিজ্ঞাসা ব্রুনার।

‘এখনও ঠিক করিনি। বাইরে বেরিয়ে একটা কিছু ঠিক করে নেব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে আপনি থাকার ব্যাপারটাই আগে ঠিক করে আসুন। আপনার রেস্ট দরকার।’ বলল ব্রুনা।

'কিন্তু ব্রুনা, এই মুহূর্তে আমার প্রধান কাজ হলো আলদুস আলারী কোথায় থাকেন, তা জানা। তারপর আমার ব্যাপারটা ঠিক করব।' আহমদ মুসা বলল।

'কি করে জানবেন? জিজ্ঞাসা করলেই তো সন্দেহ জাগবে।' বলল ব্রুনা।

'আমি ইতিমধ্যেই খোঁজ নিয়েছি উনি ২টা পর্যন্ত হাসপাতালে থাকেন, তারপর চলে যান। সন্ধ্যার পরে একবার আসেন পরের দিনের সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখার জন্যে। উনি হাসপাতাল থেকে আর কিছুক্ষণের মধ্যে বের হবেন। এরপর আমি কিছু খোঁজ-খবর নেব।

বেলা ২টা বাজার পর আহমদ মুসা তার ব্যাগটা নিয়ে ড্রেসিং রুমে ঢুকল। ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসার বেশে। আগের আহমদ মুসা থেকে এতটাই পার্থক্য যে, আগে গোঁফ ছিল না এখন গোঁফ আছে।

আহমদ মুসা বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। ব্রুনা বলল, 'ভাইয়া, আপনি হাসপাতাল থেকে কোথাও যাচ্ছেন?'

'না। বাইরে বেরুবো তো সন্ন্যাসী সেজে। আসছি অল্পক্ষণ পর।'

বলে আহমদ মুসা রুম থেকে বেরিয়ে গেল। আধা ঘন্টা পরে ফিরে এল আহমদ মুসা।

এসেই আহমদ মুসা পোশাক পাল্টে সন্ন্যাসীর পোশাক পরে পিঠে গেরুয়া একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে তৈরি হলো যাবার জন্যে। আলদুনি সেনফ্রিড রোগীর বেডে এবং ব্রুনা পাশের এ্যাটেনডেন্ট কক্ষে শুয়েছিল।

আহমদ মুসার সাড়া পেয়ে ব্রুনা এ ঘরে চলে এসেছিল। আহমদ মুসাকে তৈরি দেখে বলল সে, 'ভাইয়া, এবার নিশ্চয় হাসপাতালের বাইরে যাচ্ছেন, আসছেন কখন?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি? তুমি এদিকটা দেখ।' আহমদ মুসা বলল।

'খুব কৌতুহল লাগছে। নিশ্চয় কোন বিশেষ কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। হলো কাজ?' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'বলতে পারবো প্রথম মিশনটা সফল হলে।'

'মনটা যদিও আকুলি-বিকুলি করছে, তবু জানতে চাইবো না মিশনটা কি?' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ধন্যবাদ ব্রুনা। পরে অবশ্যই জানবে। আসি।'

বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

রাত ৯টা।

টনডর্ফ বাস স্টেশনে এসে আহমদ মুসা গাড়ি ঘুরিয়ে আবাসিক এলাকার দিকে চলল।

টনডর্ফ আবাসিক এলাকা ছোট, ওস্টেনডার হ্রদের সামনে। হামবুর্গের অন্যতম অভিজাত আবাসিক এলাকা এটা। বাড়িগুলো একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বেশ স্পেস আছে একটি বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির মধ্যে।

রাত ৯টাতেই নীরবতায় ছেয়ে গেছে আবাসিক এলাকার সামনের রাস্তাটা।

এই রাস্তার শেষ প্রান্তের দিকে লেকের ধারে আলদুস আলারীর বাসা।

দিনের বেলা হাসপাতাল থেকেই আহমদ মুসা কৌশলে আলদুস আলারীর বাসার ঠিকানা জেনে নিয়েছিল। আলদুস আলারী তখন ডিউটি শেষে বাসায় ফিরে এসেছিল। আহমদ মুসা পারসোনাল সেকশনের ডিলিং অফিসারকে বলেছিল, 'তার সাথে আমার জরুরি কাজ আছে, এখনই তার সাথে দেখা করা প্রয়োজন। আমার আসতে একটু দেরি হয়েছে, উনি চলে গেছেন।'

'জরুরি হলে টেলিফোনে কথা বলতে পারেন। টেলিফোন নাম্বার নেই?' বলেছিল ডিলিং অফিসার।

'টেলিফোনে সব কথা হয় না, বলা যায় না।' আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে তার বাড়িই যেতে হবে আপনাকে। কয়েকদিন হলো উনি বাসা বদলেছেন। টনডর্ফ এলাকায় তার নিজের বাসা। এ বাসার ঠিকানা নিশ্চয় আপনার কাছে নেই। দাঁড়ান দিচ্ছি।’ বলেছিল অফিসার।

এভাবেই আহমদ মুসা আলদুস আলারীর বাসার ঠিকানা পেয়ে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা বাড়ির ঠিকানা পাওয়ার পর পরই একবার আলদুস আলারীর বাড়ি দেখার জন্যে এসেছিল এখানে।

হ্রদের তীরে অভিজাত এক আবাসিক এলাকায় সুন্দর বাড়ি। তার মত চাকুরের এমন বাড়ি হবার কথা নয়। ব্ল্যাক লাইটের টাকায় কি তাহলে বাড়িটা করেছে সে।

আহমদ মুসা জেনেছে আলদুস আলারী শুধুমাত্র স্ত্রী নিয়ে এ বাড়িতে থাকে। তার ছেলেমেয়েরা সবাই হামবুর্গের বাইরে থাকে।

বাড়ি কিংবা রাস্তাতেও আলদুস আলারীর সাথে কথা বলা যেত, কিন্তু আহমদ মুসা বাড়িকেই বেছে নিয়েছে। জার্মানরা অফিস বা রাস্তায় কোন হট্টগোল পছন্দ করে না। এ রকম হলে তারা সোজা পুলিশ ডেকে বসে।

আহমদ মুসা রেন্ট-এ-কার থেকে ভাড়া করা গাড়িটা আলদুস আলারীর বাড়ির কাছাকাছি রাস্তার পাশে একটা গাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। আহমদ মুসার পরণে কালো প্যান্ট, কালো জ্যাকেট এবং মাথায় একটা কালো হ্যাট।

আহমদ মুসা রাস্তার পাশ ধরে দ্রুত হেঁটে চলল আলদুস আলারীর বাড়ির দিকে।

বাড়িটা সাড়ে তিন ফুটের মত উঁচু ওয়াল দিয়ে ঘেরা। এখানে কোন বাড়ির বাউন্ডারি ওয়াল এর চেয়ে উঁচু হয় না। অনেক বাড়িতে বাউন্ডারি ওয়ালই নেই।

আলদুস আলারীর বাড়ির বাউন্ডারি ওয়ালের সাথে যে গেটটা, সেটা গ্রিলের। গেটটা লক করারও ব্যবস্থা আছে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে বের করে ল্যাসার কাটারটা হাতে নিল। কিন্তু ল্যাসার কাটার ব্যবহার করতে হলো না। হাত দিয়ে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। আহমদ মুসা কিছুটা বিস্মিতই হলো। জার্মানরা তো এমন করে না সাধারণত। তারা কোন সিস্টেম করলে তা তারা রক্ষা করে। তাহলে আলদুস আলারী গেট লক করল না কেন?

আহমদ মুসা গেট খুলে ভেতরে ঢুকল।

একটা প্রশস্ত লাল পাথুরে রাস্তা এগিয়ে গেছে বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত।

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। ভেতরে কোন সাড়া নেই। মিনিট দুয়েক অপেক্ষার পর আহমদ মুসা আস্তে আস্তে দরজার নবের উপর চাপ দিল। নব ঘুরল না। দরজায় তালা, এটাই স্বাভাবিক।

দরজায় নক করল আহমদ মুসা। এক দুই তিনবার নক হলো।

তৃতীয় নকের পরেই দরজা খুলে গেল।

দরজায় দাঁড়ানো লোকটির উপর নজর পড়তেই বুঝল আহমদ মুসা ইনিই আলদুস আলারী। শক্ত গড়ন, মেদহীন ভরাট মুখ, মাথাভরা সোনালি চুলের সমারোহ দেখে বুঝার উপায় নেই তার বয়স পঞ্চাশের কোঠায়।

আহমদ মুসা আলদুস আলারীর প্রতিক্রিয়ার ধরনে মনে মনে খুবই বিস্মিত হলো। আহমদ মুসা মনে করেছিল এত রাতে অপরিচিত, অনাহূত এবং কোন প্রকার খবর ছাড়া আসা এক অতিথিকে দেখে বিস্মিত, বিরক্ত হবেন আর এটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তার দৃষ্টিতে এ সবের কিছুই ছিল না। কারও জন্যে অপেক্ষা করে থাকলে যে রকম প্রতিক্রিয়া হয় আলদুস আলারীর প্রতিক্রিয়া সে রকমের। তার ও প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবতে গিয়ে বিস্ময়ের সাথে সন্দেহেরও উদয় হলো তার মনে।

'কে আপনি? কি চাই? আসুন ভেতরে।' বলল আলদুস আলারী। তার কথার মধ্যে কোন উদ্বেগ-আশংকার ভাব নেই। পরিচয় ও প্রয়োজন জানা ছাড়াই নি:সংকোচে ভেতরে নিয়ে চলল। আহমদ মুসা আলদুস আলারীর এই আচরণের কারণ বুঝতে পারল না। আলদুস আলারী কি খুব সাহসী? কিংবা হতে পারে সে এ ধরনের অতিথি আপ্যায়নে অভ্যস্ত।

আহমদ মুসাকে নিয়ে ড্রইং রুমে বসাল।

আলদুস আলারী আহমদ মুসার সামনের সোফায় মুখোমুখি বসল। বলল, 'আমরা পরস্পরকে বোধ হয় চিনি না। বসুন কি জন্যে কষ্ট করে এত রাতে এসেছেন?'

'আমি আপনার সাহায্য চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'সাহায্য? কি সাহায্য?' বলল আলদুস আলারী।

আহমদ মুসা একবার স্থির দৃষ্টিতে আলদুস আলারীর দিকে তাকাল। বলল, 'গত বছর ঠিক এই সময় আপনাদের হাসপাতালের একটা বেড থেকে একজন রোগিনী হারিয়ে যায়, তার জায়গায় আসে হুবহু তারই মত আরেকটি মেয়ে। আপনার হাসপাতালের এক বা একাধিক লোক এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত আছে। এদের সন্ধান পেলেই হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির সন্ধান পাওয়া যাবে। এই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। হাসপাতালের সবচেয়ে পুরানো একজন কর্মকর্তা আপনি। আপনিই এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।'

আহমদ মুসা আলদুস আলারীর চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বলছিল। আহমদ মুসা মনে করেছিল তার কথা শুনে আলদুস আলারী নিশ্চয় চমকে উঠবেন, চেহারা পাল্টে যাবে তার। কিন্তু কিছুই ঘটল না। তার মুখটা এমন দেখা গেল যেন এসব কথা শোনার জন্যে সে প্রস্তুতই ছিল। আহমদ মুসার অভিজ্ঞতর ঘন্টায় যেন এলার্ম বেজে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে হেসে উঠল আলদুস আলারী। আর আহমদ মুসা তার মাথার পেছনে স্টিলের শক্ত নলের স্পর্শ অনুভব করল। সামনে, ডান ও বাম থেকে দেয়াল ফুঁড়েই যেন তিনজন রিভলবার বাগিয়ে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে এল। সামনের লোকটা হাতের রিভলবারটা নাচিয়ে নাচিয়ে হো হো করে হেসে বলল, 'তুমিই তাহলে সেই নকল আহমদ মুসা। তুমি খুব বুদ্ধিমান শুনেছি। কিন্তু আজ এতটা বোকামি করলে কি করে? কেমন করে তুমি ধরে নিলে যে, হাসপাতাল থেকে আলদুস আলারীর ঠিকানা জেনে নেবে আর সহজেই পেয়ে যাবে আলদুস আলারীকে? একজন এশিয়ান তার ঠিকানা যোগাড় করেছে, এটা জানতে পেরেই সে ব্ল্যাক লাইটের লোকদের জানিয়েছে। আমরা অনেক দিন ধরে হামবুর্গ ও

অ্যারেন্ডসী'তে তোমার অপেক্ষায় জাল পেতে বসে আছি। আজ জালে ধরা পড়েছ।' বলে আবার হো হো করে হেসে উঠল লোকটা।

সামনের লোকটা থামতেই ডান পাশের লোকটা বলল, 'ভাগ্যিস আমরা আলদুস আলারীকেও সব ব্যাপারে জানিয়ে রেখেছিলাম।'

'বেচারা নকল আহমদ মুসা সেজে অতি আত্মবিশ্বাসের কারণে আজ সহজেই জালে আটকে গেছে।' বলল বাম পাশের জন।

'তোমরা তাড়াতাড়ি আমার বাড়িকে ঝামেলা মুক্ত কর।' আলদুস আলারী বলল।

'কার্ল ওর পকেটগুলো সার্চ কর। আর নকল আহমদ মুসা তুমি হাত তুলে দাঁড়াও এখনি, গুলি না খেতে চাইলে।'

আহমদ মুসা এটাই চাচ্ছিল। আহমদ মুসা মাথার উপর হাত তুলতে তুলতে দাঁড়িয়ে গেল সংগে সংগেই।

পেছনের লোকটা আহমদ মুসার মাথা থেকে রিভলবার সরিয়ে নিয়ে সামনে এসে গিয়েছিল আহমদ মুসাকে সার্চ করার জন্যে।

আহমদ মুসা দাঁড়াবার সময়ই হাত উপরে তুলতে গিয়ে ডান হাত দিয়ে মাথার পিছনে জ্যাকটের আড়াল থেকে ছোট, কিন্তু ভয়ংকর রিভলবারটা নিয়েই ডান দিকের লোকটাকে গুলি করল। সেই একই সময়ে আহমদ মুসার বাম হাত সাঁড়াশীর মত দ্রুত সামনে এগিয়ে তাকে সার্চ করতে আসা লোকটিকে টেনে নিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরেছিল। ডান হাত প্রথম গুলিটা ছুড়েই বিদ্যু গতিতে সরে গিয়ে দ্বিতীয় গুলি করেছিল সামনের রিভলবারধারীকে। এই সময় বামের লোকটির নিক্ষিপ্ত গুলি এসে বিদ্ধ করল আহমদ মুসার বাম হাতকে। আহমদ মুসার বাম হাত শিথিল হয়ে পড়েছিল। আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে লোকটিকে ধরে রেখে পেছন দিকে সোফার উপর আছড়ে পড়ল। আর সেই সাথে আহমদ মুসা লোকটিকে ধরে রাখা অবস্থাতেই ডান হাত একটু ঘুরিয়ে নিয়ে গুলি করল বাম দিকের লোকটিকে।

বাম দিকের লোকটি তাদের লোকের সাথে জড়াজড়ি করে পড়ে যাওয়ায় গুলি করার সুবিধা পাচ্ছিল না। আহমদ মুসা তাদের লোকের নিচে পড়ে যাওয়ায়

আরও অসুবিধায় পড়েছিল। এটাই আহমদ মুসাকে সময়ও দিয়েছিল, সুযোগও দিয়েছিল। বাম দিকের লোকটিও মাথায় গুলি খাবার পর আগের দু'জনের মতই চিৎকার করার সুযোগটুকুও পেল না, ভূমি শয্যা নিল।

আহমদ মুসা তৃতীয় গুলি করার সময় তার সাথে পড়ে যাওয়া লোকটি তার হাত থেকে খসে গিয়েছিল এবং সোফার পাশে পড়ে যাওয়া তার রিভলবারটি খুঁজে পেয়েছিল। তার রিভলবার সে আহমদ মুসার দিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছিল।

আহমদ মুসা তৃতীয় গুলি করার পর মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করল না, তার হাতটা সামনের দিকে ঘুরে আসতে যা সময় নিল। লোকটির রিভলবার ঘুরে আসছিল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু আহমদ মুসার রিভলবার আওতায় ততক্ষণে লোকটির মাথা এসে গিয়েছিল। ট্রিগার টিপল আহমদ মুসা। আধা দাঁড়ানো লোকটি সেই অবস্থাতেই বসে পড়ল মেঝের উপর। বিমূঢ়, কম্পমান আলদুস আলারী আতংকগ্রস্ত হয়ে এক পা দু'পা করে সরছিল ঘর থেকে বের হওয়ার জন্যে। পায়ের উপর শক্তি নিয়ে যেন সে দাঁড়াতে পারছিল না।

আহমদ মুসা তার দিকে রিভলবার তাক করে বলল, 'আর এক পা এগোলে আমি গুলি করব।'

আলদুস আলারী ডুকরে কেঁদে উঠে বসে পড়ল। এই সময় তার স্ত্রী ঘরে ঢুকল। প্রথমে সাদা চুলের মেয়েটাকে আলদুসের স্ত্রী বলে আহমদ মুসার মনে হয়নি। কিন্তু আহমদ মুসার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে যখন স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইল, তখনই বুঝল সে আলদুসের স্ত্রী। সে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, 'আমার স্বামীর কোন দোষ নেই। সে যেটুকু করেছে বাধ্য হয়ে করেছে।'

মহিলাটা ঘরে ঢুকলে আহমদ মুসা সোফার উপর রাখা হ্যাট মাথায় পরেছিল চেহারা কিছুটা আড়াল করার জন্যে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আপনার স্বামীকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। সে যদি আমাদের ভালো কাজে সহযোগিতা করে, তাহলে তার কোন ক্ষতি হবে না।'

'নিয়ে যাবেন কেন? কি সহযোগিতা চান বলুন। সে সহযোগিতা করবে।' আলদুসের স্ত্রী বলল।

‘কিছু লোক অন্যায় করেছে। সেটা আপনার স্বামী জানে। সেই ব্যাপারে আমরা কিছু জানতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিছু জানলে সে বলবে। এখানেই তাকে জিজ্ঞেস করুন।’ আলদুসের স্ত্রী বলল।

‘আমি কিছু বললে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। বলতে পারবো না আমি।’ বলল আলদুস আলারী।

‘আর না বললে আমি মেরে ফেলব। এখন বল কোনটা চাও?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি বাঁচতে চাই।’ বলে ডুকরে কেঁদে উঠল আলদুস আলারী।

‘ঠিক আছে ম্যাডাম, আপনার স্বামীকে আমি নিয়ে গেলাম। এটাই তার বাঁচার পথ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেমন করে?’ কান্না জড়িত কন্ঠে বলল আলদুসের স্ত্রী।

‘অত কথা বলার সময় আমার নেই। আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ম্যাডাম।’ আহমদ মুসা বলল।

সজল চোখে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আলদুসের স্ত্রী আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার কন্ঠের কি যেন আকর্ষণ তাকে দারুণভাবে বিমোহিত করল। তার মানে হলো, এই কন্ঠকে বিশ্বাস করা যায়। এ কন্ঠ যেন মিথ্যা বলতে পারে না বলে তার মনে হলো।

আলদুসের স্ত্রী আহমদ মুসার সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, ‘আমি আপনাকে বিশ্বাস করলাম বেটা। আমার স্বামী করে ফেরত আসবে? আজই ফেরত আসবে তো?’

‘তার ফিরে আসা নির্ভর করছে সে আমাদের সহযোগিতা করছে কি না তার উপর।’ বলল আহমদ মুসা।

বলেই সে আলদুসের স্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে চলা শুরু করল।

আলদুসের স্ত্রী ছুটে গিয়ে স্বামীর কাছে বসল। বলল, তুমি যা জান সব বলে দেবে। এরা ভালো মানুষ। দেখ না আমাকে ‘ম্যাডাম’ বলেছে। আর ওরা তো মানুষ জ্ঞান করে না। তুমি যাও এর সাথে।’

উঠে দাঁড়াল আলদুস আলারী। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমার বাঁচার কোন উপায় নেই।'

আহমদ মুসা লোকটির মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে বলল, 'চোখের পানি মুছে ফেল। এটা কান্নার কোন সময় নয়। স্বাভাবিকভাবে রাস্তায় হাঁটবে। অন্যথা হলে জানবে, আমার রিভলবারের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।'

আলদুস আলারী হাঁটতে লাগল। আহমদ মুসা পেছনে তাকিয়ে আলদুস আলারীর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আসি ম্যাডাম।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।' বলল আলদুসের স্ত্রী কম্পিত গলায়।

আহমদ মুসা পেছনে না তাকিয়ে মনে মনে বলল, তাহলে দুনিয়ার সব স্ত্রীরা একই রকম। কিন্তু আমরা স্বামীরা কতটুকু তা বুঝি।

রা্স্তায় আলদুস আলারী অস্বাভাবিক কিছু করল না।

আলদুস আলারীকে পাশে বসিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল আহমদ মুসা। বাম হাতটা তুলতে পারছে না আহমদ মুসা। এতক্ষণ পরিস্থিতির উত্তেজনায় আহত হাতের দিকে মনোযোগ দিতে পারেনি সে। এখন খুব ভারি মনে হচ্ছে হাতটা। বাহুর যেখানে গুলিটা লেগেছে, একটা মাংসপিণ্ড তুলে নিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। বাহুর লাগোয়া পাঁজরের পেশীতেও যন্ত্রণা হচ্ছে। তাহলে বুলেটটা বাহু থেকে বেরিয়ে সে পেশীকেও আহত করেছে?'

আহমদ মুসা শহর ছাড়িয়ে একটা নির্জন ফার্মল্যান্ডে এনে গাড়ি থামাল। পেছন থেকে ব্যাগ টেনে নিয়ে মেডিকেটেড ব্যাণ্ডেজ বের করল। আলদুস আলারীকে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে বলে গা থেকে জ্যাকেট খুলে ফেলল। ওষুধে ভেজানো তুলা দিয়ে যতটা সম্ভব আহত স্থানটা এক হাতের সাহায্যে ব্যাণ্ডেজ করল। পাঁজরের আহত স্থানটারও এভাবে এক হাত দিয়ে নার্সিং করল।

রক্ত ভেজা জ্যাকেট গাড়ির পেছনে রেখে আরেকটা শার্ট পরে নিয়ে আহমদ মুসা আলদুস আলারীকে সোজা হয়ে বসতে বলল।

মি. আলদুস আলারী চিন্তা করে কিছু কি ঠিক করলেন? আপনি আমাদের সহযোগিতা করবেন, না ওদের মত গুলি খেয়ে মরবেন?' বলল আহমদ মুসা আলদুস আলারীকে লক্ষ্য করে।

'স্যার, ওরা আমাকে আমার পরিবার সমেত মেরে ফেলবে।' বলল আলদুস আলারী কম্পিত গলায়।

'আমাকে সহযোগিতা না করলে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব, এটা কে বলল?' আহমদ মুসা বলল।

'আমি বাঁচতে চাই স্যার। আমি তাহলে কি করব?' বলল আলদুস আলারী।

কি করতে হবে, সেটা বলবো। কিন্তু তার আগে আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দাও।' আহমদ মুসা বলল।

'কি জানতে চান স্যার?' বলল আলদুস আলারী।

'যে মেয়েটিকে তারা হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে, তাকে তারা কোথায় রেখেছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার

'স্যার, ওদের সব কাজ অত্যন্ত গোপনীয়। আমার সব কিছু ওরা জানে, কিন্তু আমি ওদের কিছুই জানি না।' বলল আলদুস আলারী কম্পিত গলায়।

ড্যাশ বোর্ডের উপর থেকে রিভলবার হাতে তুলে নিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'জানি না, কথাটা আর বলবে না। কি জান সেটা বল।'

'ওদের একটা টেলিফোন নাম্বার জানি স্যার।' বলল আলদুস আলারী।

'মোবাইল, না ল্যান্ড টেলিফোন?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'একটা মোবাইল, অন্যটা ল্যান্ড টেলিফোন স্যার। মোবাইল নাম্বারটা আমাকে ওরা দিয়েছে এবং ল্যান্ড টেলিফোন নাম্বারটা টেলিফোনে একজনকে দিচ্ছিল সেটা আমি শুনেছি।' বলল আলদুস আলারী।

আহমদ মুসা নাম্বার দু'টি নিজের মোবাইলে সেভ করে নিল।

মোবাইল পকেটে রেখে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এরপর বল। আর কি জান?'

'স্যার, যেদিন মেয়েটাকে সরিয়ে নেয়, সেদিন ওদের একজন আরেকজনকে মেয়েটিকে '৪৯০-এর সি'-তে তুলতে বলেছিল। কিন্তু ওদের টীম

লিডার যে ছিল সে শুনতে পেয়ে বলেছিল, না 'সি' তে নয়, 'এ'-তে তোলার নির্দেশ হয়েছে। এ ছাড়া তাদের মুখে কয়েকবার 'অ্যারেন্ডসী'র নাম শুনেছি। কয়েকদিন আগে যখন ওরা আমার কাছে আসে পরিস্থিতি সম্পর্কে সাবধান করার জন্যে। একজন আরেকজনকে বলতে শুনেছি, 'হ্যাটটপ ট্যানেল প্যালেস' ও 'লেক প্যালেস' এর সাথে বাড়িকে জুড়ে দিয়ে আরও নিরাপদ করা হয়েছে-চিন্তার কিছু নেই।' থামল আলদুস আলারী।

'তারপর মি. আলদুস?' আহমদ মুসা বলল।

আলদুস দু'হাত জোড় করে আহমদ মুসাকে বলল, 'ওদের সম্পর্কে আমি আর কিছুই জানি না স্যার। যা জানি সব বলেছি। স্যার, ওরা আমাকে ব্যবহার করেছে। পরিবার সমেত শেষ করে দেবার হুমকি দিয়ে আমাকে ওরা কাজ করতে বাধ্য করেছে।'

আদালার বাবা আলগার মানে আল মানসুরের কথা মনে পড়ল আহমদ মুসার। সত্যিই আলদুস প্রথমে রাজি হয়নি। তাকে বাধ্য করা হয়ে ভয় দেখিয়ে। বেচারা আলদুস আর কিছুই জানে না সেটা বিশ্বাস হলো আহমদ মুসার। তাহলে আলদুসের কাছে কি পাওয়া গেল? নিজেকে নিকেই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। দু'টো টেলিফোন নাম্বার ও নাম্বারসত কয়েকটা ক্লু পাওয়া গেছে। ক্লুগুলো গুরুত্বপূর্ণ কি না অ্যারেন্ডসীতে গেলেই তা বুঝা যাবে। দু'টো টেলিফোন নাম্বার, একটা বাড়ি বা স্থানের নাম ও নাম্বার সামনের অন্ধকারে আলোকবর্তিকার মত মনে হচ্ছে তার কাছে। নিকষ অন্ধকারে দাঁড়ানো তার কাছে এটা একটা বড় পাওয়া।

আহমদ মুসা আলদুস আলারীকে বলল, 'দশ পনের দিন তোমার লুকিয়ে থাকার মত কোন জায়গা আছে?'

'কেন স্যার?' জিজ্ঞাসা আলদুস আলারীর।

'এখন বাড়ি গেলে ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। দশ পনের দিন তোমাকে সরে থাকতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আলদুস আলারীর। বলল, 'আমাকে ছেড়ে দেবেন স্যার?'

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, ‘এর বেশি কিছু জানই না যখন বলছ , তখন আর কি করব।’

‘আপনি খুব ভালো স্যার। ওরা মানুষ নয় স্যার। ‘ব্ল্যাক লাইট’ নামের খুব ভয়ংকর একটা দল ওরা স্যার। আরও কিছু জানলে অবশ্যই বলতাম স্যার।’

‘আচ্ছা গত দু’দিনে ওদের কয়টা টেলিফোন পেয়েছ?’ আহমদ মুসা বলল।

‘দু’বার স্যার’। বলল আলদুস আলারী।

‘নাম্বারগুলো কি আছে তোমার মোবাইলে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘না, স্যার। ওদের টেলিফোনের নাম্বার, নাম কিছুই শো হয় না আমার মোবাইলে।’ বলল আলদুস।

‘বুঝেছি। এখন বল তোমার সরে থাকার মত সে রকম জায়গা আছে কি না?’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ, আছে স্যার। লোনবার্গে আমার ফুফু থাকেন। সেখানে আমি কিছু দিন থাকতে পারি। তিনি একাই থাকেন একটা ফ্লাটে।

‘গুড, জায়গাটা শহর থেকে বেশ দূরে। তাহলে এখন তুমি কিভাবে যাবে সেখানে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘অসুবিধা নেই স্যার। বাসেও যাওয়া যায়। ট্যাক্সি নিয়েও যেতে পারি।

কিন্তু স্যার টাকা তো নেই পকেটে, বাড়ি কি যেতে পারি?’ বলল আলদুস আলারী।

‘না, ব্ল্যাক লাইটের হাতে পড়ে যেতে পার। ওদের কাছে এতক্ষণে খবর পৌঁছে গেছে। ওরা তোমাদের ওখানে এসেও থাকতে পারে। সাথীদের লাশ তারাই সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে, হাসপাতালে যেতে পারি? ওখানে গেলে টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।’ বলল আলদুস আলারী।

‘না, বাড়ি, হাসপাতাল কোনটাই তোমার জন্যে নিরাপদ নয়। তোমার কত টাকা হলে চলে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘যাতায়াতের জন্য শ’পাচেক মার্ক হলেই চলবে স্যার।’ বলল আলদুস আলারী।

আহমদ মুসা তার হাতে এক হাজার মার্ক তুলে দিয়ে বলল, ‘সাবধানে যাবে। তোমার স্ত্রীকে কিছুই জানাবে না। আমি জানাবার ব্যবস্থা করবো, যদি দরকার হয়।’

আহমদ মুসা আলদুস আলারীকে একটা বাস স্ট্যান্ডে নামিয়ে দিল।

গাড়ি থেকে নেমেই আহমদ মুসার পায়ের কাছে বসে পড়ল আলদুস আলারী। বলল, ‘আপনি খুব ভালো মানুষ স্যার। ঈশ্বর আপনাদের সাহায্য করুন।’

‘ধন্যবাদ আলদুস আলারী। চলি।’ বলে আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিল।

গাড়িতে বসেই পোশাক পাল্টে আহমদ মুসা হোটেলে এল।

পরদিন সকাল আটটার দিকে আহমদ মুসা হাসপাতালে পৌঁছল।

কক্ষের দরজায় নক করতেই দরজা খুলে দিল ব্রুনা। তার মুখ শুকনো।

উদ্বেগে কাতর চেহারা। আহমদ মুসাকে দেখে আকাশের চাঁদ হাতে পেল। কথাই বলতে পারল না ব্রুনা। তার ঠোঁট দু’টো অবরুদ্ধ আবেগে কাঁপছিল। আহমদ মুসাকে দরজা খুলে দিয়ে এক পাশে দাঁড়াল সে। আহমদ মুসা বিস্মিত হলো ব্রুনার অবস্থা দেখে।

‘তোমরা ভালো আছ ব্রুনা?’ বলে ঘরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। ঘরে ঢুকে আলদুনি সেনফ্রিডকেও দেখল জড়োসড়ো হয়ে সোফায় বসে থাকতে। আহমদ মুসাকে দেখে প্রাণ পাওয়ার মত সে যেন জেগে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বলল, ‘আপনি ঠিক আছেন মি. আহমদ মুসা?’

‘হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। কিন্তু আপনাদের কি হয়েছে?’

ব্রুনা দরজা বন্ধ করে ফিরে এসেছিল। বলল, ‘স্যার, গত দু’ঘন্টায় আমরা প্রায় অর্ধেক মরে গেছি।’

‘কেন কি হয়েছে? কিছু ঘটেছে?’ আহমদ মুসা বলল। তার কন্ঠে উদ্বেগ।

‘বসুন স্যার, বলছি।’ বলে ব্রুনা আহমদ মুসাকে বসার পথ করে দেবার জন্যে সরতে গিয়ে আহমদ মুসার বাম হাতের সাথে একটু ধাক্কা খেল।

আহমদ মুসা 'আহ!' বলে উঠল। অনেকটা অনিচ্ছাতেই তার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেছে।

থমকে দাঁড়িয়েছে ব্রুনা। তার চোখে-মুখে অপার প্রশ্ন। আলদুনি সেনফ্রিডও চমকে উঠেছে।

ব্রুনা দুই ধাপ সরে এসে বলল, 'দেখি ভাইয়া, আপনার হাতটা।'

বলেই ব্রুনা হাতের উপর থেকে সন্ন্যাসীর আলখেল্লার হাতা তুলে ফেলল। দেখতে পেল বাহুর ব্যান্ডেজ।

চমকে উঠল ব্রুনা। তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডও উঠে দাঁড়িয়েছে।

তাঁরও প্রশ্ন, 'মি. আহমদ মুসার হাতে কি হয়েছে?' তার কন্ঠে ঝরে পড়ল রাজ্যের উদ্বেগ।

'বলছি মি. সেনফ্রিড। কিন্তু তার আগে বলুন আপনাদের কি হয়েছে। আমার খুব উদ্বেগ বোধ হচ্ছে।' আহমদ মুসা বলল।

'বসুন ভাইয়া আপনি। বলছি আমি। জানি আমি, আমাদের কথা না বললে আপনার কথা জানতে পারবো না।' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসা বসল।

আলদুনি সেনফ্রিড শুরু করল। বলল, 'আজ সকাল ৬টায় আমরা খবর পেলাম, হাসপাতালের চীফ সুপার আলদুস আলারীর বাড়িতে চারজন অপরিচিতের গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেছে। সেই সাথে মি. আলারীকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। আমরা এই খবর শুনে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আপনার ঐ বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। অত..।'

আলদুনি সেনফ্রিডের কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'অতএব আপনারা মনে করলেন চারজনের মধ্যে আমি...।'

আহমদ মুসাকে কথা শেষ করতে দিল না ব্রুনা। ব্রুনা হাত দিয়ে আহমদ মুসার মুখ চেপে ধরে বলল, 'প্লিজ, এমন শব্দ মুখেও আনবেন না। এই দুই ঘন্টায় আমাদের আশংকা-আতংক মন ঝাঁজরা হয়ে গেছে। শুধু আপনার কথা নয়, ভাবীর কথা মনে পড়ছিল, মনে পড়ছিল আপনাদের চোখের মণি আহমদ আবদুল্লাহর কথাও।' শেষের কথাগুলো ব্রুনার কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

‘ব্রুনা, এত তাড়াতাড়ি এভাবে ভেঙে পড়লে যুদ্ধে জিতবে কি করে? তোমাদের আরও সাহসী হতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাইয়া, আমরা সাধারণ মানুষ। যে শক্তি আমাদের নেই, তা আমাদের কাছে আশা করা উচিত নয়।’

একটু থেমে চোখ-মুখ মুছে নিয়ে বলল ব্রুনা, ‘ভাইয়া, এখন আমাদের প্রশ্নের জবাব দিন এবং আলদুস আলারীর বাড়ির সাংঘাতিক ঘটনা সম্পর্কে প্লিজ সব বলুন।’

‘ঘটনা জানবো না কেন? ঐ চারজনের একজনের গুলিতেই আমার বাহু আহত হয়েছে। আমাকে ধরার জন্যে ওরা আগে থেকেই আলদুস আলারীর বাড়িতে লুকিয়েছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওরা জানল কি করে যে, আপনি আলদুস আলারীর বাসায় ঐ সময় যাচ্ছেন?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আলদুস আলারীর ঠিকানা কিভাবে আহমদ মুসা হাসপাতাল থেকে নিয়েছিল, সেটা জানিয়ে বলল, ‘সম্ভবত হাসপাতাল থেকেই আলদুসকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, কে একজন ঠিকানা নিয়ে তার বাড়িতে যাচ্ছে।’

‘কিন্তু সে লোক যে আপনি তা কি করে জানল এবং ঐভাবে প্রস্তুত থাকল আপনার জন্যে?’ বলল ব্রুনা।

‘যে আলদুসের বাড়িতে যাচ্ছে সে এশিয়ান, এটা জেনে নেয় আলদুস আলারী হাসপাতাল থেকে। এশিয়ান শুনেই সে সন্দেহ করে। কারণ, ব্ল্যাক লাইট আগেই আলদুস আলারীকে সাবধান করে দিয়েছিল। তাই এশিয়ান শুনেই সে ব্ল্যাক লাইটকে খবর দেয় এবং ব্ল্যাক লাইটের চারজন তার বাড়িতে আমার জন্যে ওঁৎ পেতে বসেছিল। আমি যখন আলদুস আলারীর বাড়িতে গিয়ে হাসপাতাল থেকে তোমার মাকে সরিয়ে নেয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম, তখন ওরা চারজন আমাকে ঘিরে ফেলে।’

‘সর্বনাশ, তারপর?’ বলল ব্রুনা।

‘তারপরের খবর তো শুনেছ। ওরা চারজনই মারা গেছে। তারা না মরলে আমাকেই মরতে হতো।’ আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনা কিংবা আলদুনি সেনফ্রিড কেউই কোন কথা বলল না। তারা নির্বাক চোখে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। জীবন-মৃত্যুর কি ভয়ংকর খেলা সে খেলছে। এ পর্যন্ত তাদের সামনেই আহমদ মুসা অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে। প্রতিবারই মারতে না পারলে আহমদ মুসাকেই হয়তো জীবন দিতে হতো। অনেক স্থানেই প্রতিপক্ষ সবাইকে মরতে হয়েছে আর প্রতিবারই ঈশ্বর আহমদ মুসাকে জয়ী করেছেন, সে বেঁচে গেছে। কিন্তু সব সময় যদি ঈশ্বরের সাহায্য না আসে! স্ত্রী কোথায়, ছেলে কোথায়, সংসার কোথায়, আর কোথায় সে! তার কিছু হলে কেউ তো জানতেও পারবে না! এটা আহমদ মুসা জানে, তার পরিবারও জানে। তাহলে কেমন করে ওরা সহ্য করছে এটা্ নিজেদের স্বার্থ তো কিছু নেই। একটা অচেনা, অজানা বিদেশি এক পরিবারের জন্যে এ কত বড় এক আত্নত্যাগ! ব্রুনা ও আলদুনি সেনফ্রিড দু'জনেরই চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

'কি হলো আপনাদের? চোখে অশ্রু কেন? আমাদেরই তো জয় হয়েছে। আলদুস আলারীর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি। এতদিন অন্ধকারে ঘুরছিলাম, তার কাছ থেকে কিছু আলো পেয়েছি। অশ্রু কেন এ সময় আপনাদের চোখে?' আহমদ মুসা বলল।

'মি. আহমদ মুসা, কাল রাতে আপনার যদি কিছু হতো, তাহলে কিভাবে খবরটা দিতাম আপনার স্ত্রীকে, আপনার পরিবারকে! খুব অপরাধী মনে হচ্ছে আমাদের। আমাদের মত এক অনাত্নীয়ের জন্যে বার বার কেন মৃত্যুর মুখে গিয়ে দাঁড়াবেন?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।অশ্রু ভেজা তার কথাগুলো।

'ও, এই কথা! আপ্নারা আমার অনাত্নীয় কে বলল?' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার সাথে আমাদের কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, অন্য ধরনের কোন পারিবারিক সম্পর্কও নেই, কেন আপনি আমাদের জন্যে বার বার মৃত্যুর মুখে গিয়ে দাঁড়াবেন?' বলল সেনফ্রিড।

হো হো করে হেসে উঠল আহমদ মুসা। বলল, 'রক্তের সম্পর্ক নেই? বলন তো আদম হাওয়া মানে অ্যাডাম-ইভ আপনাদের কে? বাব-মা নয়? হ্যাঁ, বাবা-মা। আর ওরা আমারও বাবা-মা।'

‘মি. আহমদ মুসা, এটা দার্শনিক যুক্তির কথা। বাস্তবে এটা আমরা কেউ মানি না।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘মি. আলদুনি সেনফ্রিড, মানা না-মানা ভিন্ন কথা, সম্পর্কটা তো সত্য। সম্পর্কটা যদি কেউ মানে তাহলে তো কারও আপত্তি থাকার কথা নয়।’

চোখ ভরা পানি থাকলেও ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল ব্রুনার। বলল, ‘আপনার যুক্তি-বুদ্ধির অভাব নেই। আপনি ও ভাবী দু’জনেই সাধারণের অবস্থান থেকে অনেক উপরে। কিন্তু ভাইয়া, আমরা অসাধারণ নই। আমাদের নিজেদেরকে খুবই স্বার্থপর, অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। আমরা যখন রাতে নরম বিছানায় সুখনিদ্রা উপভোগ করছিলাম, তখন আপনি মৃত্যুর মুখে লড়ছিলেন এবং তা আমাদের জন্যে।’

গাম্ভীর্য নেমে এল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল, ‘নিছক আবেগের কথা বলছ ব্রুনা, বাস্তবতা এটা নয়। মানুষ মানুষের জন্যে কাজ করবে, এটাই মানুষের সংস্কৃতি। একজন অভাবগ্রস্ত হবে, আরেকজন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে-এটাই মানুষের আবহমান সংস্কৃতি। একজন বিপদগ্রস্ত হবে, আরেকজন বিপদ উত্তরণে সাহায্য করবে, মানুষের এই সংস্কৃতি চলে আসছে মানুষ এই পৃথিবীতে আসার সময় থেকে। কত মানুষ মানুষের জন্যে, মানুষের কল্যাণে বিনিদ্র রজনী কাজ করছে, অন্য মানুষরা তা জানেই না। এটাই হলো মানুষের স্বত:প্রবহমান সংস্কৃতি। মানুষ অকাতরে মানুষের জন্য জীবন দেয়। মানুষের এই সংস্কৃতি চলে আসছে মানুষের গোটা ইতিহাস ধরে। এই সংস্কৃতি যদি পাল্টে দাও, মানুষের সমাজ নামে কোন কিছু আর থাকবে না। প্রকৃত বিষয় হলো আমি ব্রুনাকে সাহায্য করছি না, আমি মি. সেনফ্রিডকেও সাহায্য করছি না। আমি সাহায্য করছি মানুষকে। এটা আমার অধিকার। আবার মানুষের স্রষ্টা যিনি তার দেয়া দায়িত্বও এটা।’

আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনা দু’জনেরই চোখ আবার অশ্রুতে ভরে গেছে, কিন্তু সেই সাথে তাদের মুখ আনন্দের রঙে উজ্জ্বল। আলদুনি সেনফ্রিড কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, কিন্তু তার আগেই ব্রুনা কথা বলে উঠল। বলল, ‘আপনি ঠিক

বলেছেন স্যার। কিন্তু এই মানুষকে বড় বেশি তো দেখা যায় না। তাই ভুল হয়, আমরা ভুল করি।'

'না, ব্রুনা, মানুষের প্রতি আস্থাহীন হয়ো না। প্রতিটি মানুষই এই মানুষ। পরিবেশ-পরিস্থিতি, অন্যায়-অবিচার, অনাদর-অবহেলা অনেক সময় তাদের গায়ে অমানুষের পোশাক পরায়। কিন্তু এরাও ঠিক সময়ে জেগে ওঠে। এরাও মানুষের কল্যাণে কাজে লাগে। মানুষকে রক্ষার কাজে জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে মানুষ করেই সৃষ্টি করেছেন।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যরি মি. আহমদ মুসা। আমরা স্রষ্টার পরিচয় যেমন ভুলে গেছি, তেমনি মানুষের পরিচয়ও আমি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ধন্যবাদ আপনাকে। এখন প্লিজ বলুন, আলদুস আলারীর কাছে আপনি কি তথ্য পেয়েছেন। তাকে কি আপনিই বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, মি. সেনফ্রিড। তার কাছ থেকে কয়েকটা মূল্যবান ক্লু পেয়েছি। আসলেই বেচারা ওদের সম্পর্কে কিছু জানে না। ব্ল্যাক লাইট তাকে ব্যবহার করেছে মাত্র।'

'কেমন ক্লু পাওয়া গেছে?' বলল সেনফ্রিড।

'দু'টো টেলিফোন নাম্বার পাওয়া গেছে। সম্ভবত 'অ্যারেন্ডসী'র একটা বাড়ির নাম্বার পাওয়া গেছে। আর 'হ্যাটটপ ট্যানেল প্যালেস', 'লেক প্যালেস' নামে দু'টো বা একটা বাড়ির নাম পাওয়া গেছে। বাড়ির নাম্বারটা এই বাড়িরও হতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'তথ্যগুলো তো ভালো মনে হচ্ছে মি. আহমদ মুসা।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'খুবই গুরুত্বপূর্ণ মি. সেনফ্রিড। আমি মনে করি, তথ্যগুলো আমাদের খুবই সাহায্য করবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ঈশ্বর সহায় হোন।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'ভাইয়া, আপনি নাস্তা করেছেন?' বলল ব্রুনা।

‘হ্যাঁ, আজ ৭টার মধ্যে নাস্তা সেরেছি। এসব তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।’

ব্রুনাকে কথাগুলো বলে আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে চেয়ে বলল, ‘তাহলে হসপিটালের বেডে রোগী হয়ে শুয়ে থাকার সময় আপনার শেষ মি. সেনফ্রিড। আজ ১২টার মধ্যেই হাসপাতাল ছাড়বেন।’

খুশি হলো ব্রুনা ও ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড দু’জনেই।

‘এবার কোথায় আমরা যাচ্ছি মি. আহমদ মুসা?’ জিজ্ঞাসা আলদুনি সেনফ্রিডের।

‘সেই অরিজিন্যাল ডেস্টিনেশন, অ্যারেন্ডসীতে, মি. সেনফ্রিড।’

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘ওদিকে একটু যাই, ১২টার মধ্যেই রিলিজের ব্যবস্থা করতে হবে।’ উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।আহমদ মুসা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আহমদ মুসার বেরিয়ে যাওয়ার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়েছিল আলদুনি সেনফ্রিড। এক সময় সে বলে উঠল, ঈশ্বর মন ভালো মানুষ এখনকার দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন, না দেখলে বিশ্বাস হতো না ব্রুনা।’

‘শুধু ভালো মানুষ নন বাবা, ওর ব্যাক্তিত্ব পাথরের চেয়েও শক্ত বাবা। তোমাকে বলি বাবা, প্রথম দিনের ঘটনা থেকেই ওকে আমার ভালো লাগে। তারপর ওকে চাইতে শুরু করেছিলাম। একদিন গভীর রাতে বাবা আমি ওর ঘরে গিয়েছিলাম। ওকে প্রপোজ করেছিলাম। তিনি খুব কঠোর হয়েছিলেন আমার প্রতি। বকেছিলেন আমাকে। আমি খুব কেঁদেছিলাম। পরে উনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, ‘আমি তোমার বড় ভাই হলে খুশি হতে পার না ?’ সত্যি বড় ভাইয়ের মতই কথাগুলো ছিল। আমার মনের দুঃখ , বেদনা সব মুছে গিয়েছিল। সেই থেকেই আমি ওকে ভাইয়া বলে ডাকি বাবা।’ বলল গম্ভীর ভারি কন্ঠে ব্রুনা।

‘আমি শুনেছি, মুসলমানরা সাধারণভাবে চরিত্রবান হয়। আহমদ মুসা আরও বড় ব্যাতিক্রম।’

বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

ব্রুনা উত্তরে কোন কথা আর বলল না। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজেছে সে। আলদুনি সেনফ্রিডও উঠে তার বিছানায় গেল।

অনেকক্ষণ সবর থাকার পর নীরবতায় ছেয়ে গেল ঘরটা।

'চারজন মারা গেছে, সেটা জানি ডরিস ডুগান। আমি জানতে চাচ্ছি কে মারল তাদের, কেমন করে মারল। কেন এটা ঘটল? ঐ চারজন তো ছিল আমাদের এলিট বাহিনীর অংশ। ওরা এভাবে বেঘোরে মারা যাবার কথা নয়।' বলল ব্ল্যাক লাইটের প্রধান ব্ল্যাক বার্ড।

তার সামনে মাথা নিচু করে বসেছিল ডরিস ডুগান। ব্ল্যাক লাইটের অপারেশন চীফ।

আর টেবিলের অন্য পাশে ব্ল্যাক বার্ডের ডান দিকে বসেছিল গেরারড গারভিন। সে ব্ল্যাক বার্ডের বহুদিনের বিশ্বস্ত একজন উপদেষ্টা। সে জার্মানীর একজন শীর্ষস্থানীয় সিচুয়েশন এ্যানালিষ্ট। আজ ব্ল্যাক বার্ডের যে সফলতা ও সমৃদ্ধি, তার সাথে জড়িয়ে আছে গেরারড গারভিনের অবদান। ব্ল্যাক বার্ড থামলে ডরিস ডুগান মাথা নিচু রেখেই বলল, 'আমরা হামবুর্গে যথেষ্ট নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম এবং আলদুস আলারীকে ভালোভাবে সাবধানও করা হয়েছিল। আলদুসের স্ত্রী বলেছেন, আমাদের ওঁৎ পেতে থাকাও সঠিক ছিল। আলদুসের সন্ধানে আসা লোকটিকে ঠিক সময়ে ঘেরাও করেছিল আমাদের লোকেরা। কিন্তু গুলিতে আহত হয়েও আমাদের চারজন লোককে হত্যা করে লোকটা আলদুস আলারীকে ধরে নিয়ে পালাতে সমর্থ হয়। এটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা।' বলল ডুরিন ডুগান।

'ডরিন ডুগান, ওরা এ পর্যন্ত যা ঘটিয়েছে, সবই ছিল অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিক ঘটনা তাহলে ঘটেই চলবে? গতকাল হামবুর্গ ঘটেছে, আগামীকাল কি অ্যারেন্ডসীতেও এটা ঘটবে? কি আশ্চর্য, একজন মানুষ কিভাবে এই অসাধ্য সাধন করে চলেছে? সে কি করে আলদুস আলারীর সন্ধান পেল, ভাবতেও তো আমার বিস্ময় বোধ হচ্ছে।' বলল ব্ল্যাক বার্ড। তার চোখে-মুখে হতাশা ও উদ্বেগের চিহ্ন।

‘ব্যর্থতা নিয়ে মন খারাপ করার সময় এটা নয় লিডার। ডরিন ডুগান ঠিকই বলেছে, আপনাদের চেষ্টা ও সাবধানতায় কোন ত্রুটি ছিল না। আসলেই সে অস্বাভাবিক অসাধারণ মানুষ। যে কোন পরিস্থিতিতে সে জয়ী হয়ে চলেছে।’ বলল গেরারড গারভিন।

‘তাহলে বল কি করনীয়? তাকে ঠেকানোর উপায় কি?’ ব্ল্যাক বার্ড বলল।

‘তার আলদুস আলারীর সন্ধান পাওয়া সত্যিই বিস্ময়ের। এই ঘটনা বলে দিচ্ছে, হামবুর্গ হাসপাতালে আলদুনি সেনফ্রিডের স্ত্রী কারিনা কারলিনকে কিডন্যাপ করে তার জায়গায় একই চেহারার আরেকজনকে সেট করা হয়েছে, এটা তারা জেনে ফেলেছে। তার মানে সবচেয়ে বড় তথ্যই তারা জেনে ফেলেছে। ক্লোন করার বিষয়টাও তারা জেনে ফেলতে পারে। আর...।’

গেরারড গারভিনের কথার মাঝখানেই ব্ল্যাক বার্ড বলে উঠল, ‘কিন্তু এটা কি করে সম্ভব? আমরা কয়েকজন এবং আলদুস আলারী ছাড়া আর কেউ এটা জানে না। প্রমাণ হলো, আলদুস আলারীর কাছ থেকে তারা কিছু জানেনি, জানলে এখন তাকে তাদের ধরে নিয়ে যাবার দরকার হতো না। তাহলে কি করে জানবে। অলৌকিকত্ব বলতে কোন জিনিস নিশ্চয় নেই?’

‘তা ঠিক। কিন্তু যেভাবেই হোক জানতে পেরেছে। এখন প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় হামবুর্গের হাসপাতালের সন্ধান পেলে তারা অ্যারেন্ডসীর সন্ধান পাবে না কেন? আচ্ছা, আলদুস আলারীকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে, তার কাছ থেকে নিশ্চয় কথা আদায় করতে চায়। সে আপনাদের মানে অ্যারেন্ডসী সম্পর্কে কতটুকু জানে?’ বলল গেরারড গারভিন।

‘অ্যারেন্ডসী’ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। তার সামনে কখনও এসব বিষয়ে কোন আলোচনাই হতো না। হসপিটালের ঐ ঘটনা ছাড়া সে কিছুই জানে না, এমনকি কারও নামও সে জানে না।’ বলল ডরিস ডুগান।

‘গুড। তাহলে তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে তারা কোন লাভ করতে পারবে না। সে যাই হোক, আমি মনে করি, এখন ধরে নিতে হবে যে, তারা অ্যারেন্ডসীকেও জেনে ফেলেছে এবং অ্যারেন্ডসী’তে তারা আসবে। এটা ধরে নিয়েই আমাদের যা করা দরকার করতে হবে।’ বলল গেরারড গারভিন।

‘আমি মনে করি আসল কাজটা দ্রুত সেরে ফেলা দরকার। কারিনা কারলিন বেঁচে থাকাটাই আমাদের জন্যে উদ্বেগের। কিন্তু আমরা চাচ্ছিলাম তার স্বামী ও মেয়েকে হাতে পাওয়ার পর এক সাথে সব শেষ করব। সব ঝামেলা চুকে যাবে। কিন্তু তার স্বামী ও ছেলে তো এখন নকল আহমদ মুসার আশ্রয়ে। তাদের তো আমরা পাচ্ছি না। এই অবস্থায় ঐ দু’জনের আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। আমাদের বিন্দী ব্রিজিটি মানে নকল কারিনা কারলিনকে দিয়ে স্টেট হস্তান্তরের ব্যবস্থাটা অবিলম্বে করতে হবে। তারপর আসল কারিনা কারলিনকে সরিয়ে দিলে আমাদের বড় উদ্বেগ কেটে যায়।’ বলল ব্ল্যাক বার্ড।

‘এই কাজের কত দূর কি হলো? যে সব প্রস্তুতির কথা বলেছিলেন তা শেষ হয়েছে কি না?’ গেরারড গারভিন বলল।

‘হস্তাক্ষর মোটামুটি হয়েছে। কিন্তু ফিংগার প্রিংটের প্রস্তুতি শেষ হয়নি, আরও কিছুদিন দরকার। এই জন্যে ঠিক করেছি, আসল কারিনা কারলিনের ফিংগার প্রিন্ট নেয়া হবে দলিলে। সেটাকেই জজ সাহেব তার সামনে টিপসই দেয়া হয়েছে বলে মেনে নিবেন। জজ সাহেবকে টাকার লোভ এবং প্রাণের ভয় দু’টোই দেখানো হয়েছে। তাঁর মত আজ জানা যাবে। উনি রাজি হলে দু’দিনের মধ্যে দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে যাবে।’ বলল ব্ল্যাক বার্ড।

‘গুড, কাজ তো সহজ করে ফেলেছেন। দলিলটা হয়ে গেলেই আমরা কারিনা কারলিনকে শেষ করে অ্যারেন্ডসী’র পাঠ চুকিয়ে সবাই সরে পড়তে পারব।’ গেরারড গারভিন বলল।

‘হ্যাঁ, গারভিন, জজ সাহেবের সম্মতি পেলেই কাজটা সম্পন্ন হবে। কারিনা কারলিনের স্টেটটা তো আগেই হাতে এসে গেছে। এখন দলিল সম্পন্ন ও কারিনা কারলিনের সদগতি করেই লম্বা ছুটিতে যাব আমরা। তারপর সব অনুসন্ধান ও গন্ডগোল মিটে গেলে মানে নকল আহমদ মুসার উপদ্রব শেষ করে ফিরে আসব। এভাবে এ পর্যন্ত সাতটা স্টেট আমাদের দখলে এসেছে। দক্ষিণ জার্মানীর লোভনীয় সব স্টেট আমি চাই।’ বলল ব্ল্যাক বার্ড।

এ সময় ব্ল্যাক বার্ডের বাম পাশের সাদা টেলিফোনটা থেকে নীল সংকেত আসতে লাগল।

পিএস হিংগিস্টের টেলিফোন।

ব্ল্যাক বার্ড ইন্টারকমের বোতাম টিপে বলর, ‘হ্যাঁ, হিংগিস্ট বল কি খবর? বরিস ফ্রেডম্যান কোন খবর দিয়েছে?’

‘জি স্যার, এই মাত্র টেলিফোন করে তিনি জানালেন, জজ সাহেব বিষয়টা মেনে নিয়েছেন। পরশুদিন সকাল ১০টায় দলিলের কাজ করার সময় ঠিক হয়েছে।’ বলল হিংগিস্ট ওপার থেকে।

‘ধন্যবাদ হিংগিস্ট।’ বলে ইন্টারকম অফ করে দিল ব্ল্যাক বার্ড।

‘আপনার বড় কাজ তো হয়ে গেল লিডার। এখন নিখুঁতভাবে কাজটা গুটিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করুন।’ বলল গেরারড গারভিন ব্ল্যাক বার্ড কিছু বলার আগেই।

‘হ্যাঁ গারভিন। দলিলটার খসড়া হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি বনে দলিলটা চুড়ান্ত করার জন্যে। কাল সকালে ফিরেই ওতে দস্তখত ও টিপসই নিয়ে নেব কারিনা কারলিনের। তুমি কি যাবে আমার সাথে গারভিন?’ ব্ল্যাক বার্ড বলল।

‘অসুবিধা নেই। বললে অবশ্যই যাব। আমি চাই তাড়াতাড়ি হোক কাজটা।’ বলল গেরারড গারভিন।

‘ধন্যবাদ!’ বলল ব্ল্যাক বার্ড ডরিন ডুগানের দিকে চেয়ে বলল, ‘তুমি ঘন্টাখানেক পরে এস। আমাদের ইস্টাবলিশমেন্টের সিকুরিটি নিয়ে তোমার সাথে কিছু কথা বলব।’

‘ইয়েস স্যার।’ বলে ডরিন ডুগান উঠে দাঁড়াল।

গেরারড গারভিনও উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘আমিও উঠি লিডার। ফ্লাইটের ডিটেইলটা যেন আমাকে জানায়। আমি রুমেই থাকব।’

গেরারড গারভিন এবং ডরিন ডুগান বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

কুইন অ্যারেন্ডসী জেটির অল্প সামনে দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিলম্বিত সালজওয়াডেল স্ট্রিট। এই স্ট্রিটের পশ্চিম পাশে ১৬ তলা কুইন অ্যারেন্ডসী

হোটেল। হোটেলের ১২ তলায় একটা স্যুট ভাড়া নিয়েছে আহমদ মুসারা।স্যুটে দু'টি বেড রুম, একটা ডাইনিং এবং একটা বড় লাউঞ্জ ড্রইং। ডাইনিং-এর পাশে রয়েছে সুন্দর ছোটখাট একটা কিচেন। কেউ চাইলে এখানে রান্না বা কিছু গরম করে খেতে পারে।

লাউঞ্জ ড্রইংটাই স্যুটের প্রধান আকর্ষণ। এটা হোটেলের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে। লাউঞ্জের এ প্রান্তে বসে অপরুপ অ্যারেন্ডসী হ্রদের গোটাটাই দেখা যায়। লেকের পশ্চিম প্রান্তটা এখান থেকে অনেকটাই স্পষ্ট।

স্যুটটা ভাড়া হয়েছে ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডের নামে। আলদুনি সেনফ্রিডের ড্রাইভার পরিচয়ে আহমদ মুসা ও স্যুটে থাকছে। আর ব্রুনার জন্যে নেয়া হয়েছে দুই কক্ষ পরে আরেকটা রুম। ব্রুনা আলাদাভাবে এসে আলাদাভাবেই রুমটি ভাড়া নিয়েছে। ব্ল্যাক লাইটের চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

রাতরে খাওয়া হয়ে গেছে। এ্যাটেন্ড্যান্ট এসে বাসন-কোসন নিয়ে যাবার জন্য গুছাচ্ছিল। তখন দরজায় নক হলো। বয় গিয়েই দরজা খুরে দিল।

দরজায় দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। বলল বয়কে, 'আমরা সার্ভে করছি হোটেলগুলো গোয়েন্দা বিভাগ থেকে। এই স্যুটে কয়জন বাসিন্দা থাকে?'

'দু'জন। একজন বোর্ডার মানে মালিক। আরেকজন ড্রাইভার।' বলল বয় ছেলেটা।

'কোন দেশি?' জিজ্ঞাসা সেই দু'জনের এক জনের।

'মালিক জার্মান আর ড্রাইভারও জার্মান। কিন্তু জাতিতে শিখ।' বলল বয়।

'শিখ? তাদের সাথে আর কেউ নেই?' বলল সেই লোকরা।

'না, এরা দু'জনই এসেছেন হোটেলে।' বলল বয় ছেলেটা।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।' বলে লোক দু'জন চলে গেল।

'বয় ছেলেটা ফিরে এল। স্বগতই বলল, 'অ্যারেন্ডসীতে এসব ছিল না। এখানেও শুরু হলো দেখছি। রেজিস্টার দেখলেই তো সব জানতে পারে, রুমে রুমে এসে ডিস্টার্ব করা কেন?'

'তুমি ঠিক বলেছ। যেটা এক জায়গায় বসেই করা যায়, সেটার জন্যে রুমে রুমে জ্বালাতন তো ঠিক নয়।' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার, ওরা মনে হয় গোয়েন্দা-টোয়েন্দা কেউ নয়, অন্য কোন হোটেল পক্ষের লোক হতে পারে স্যার।'

বলতে বলতে বয় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মুখ-হাত ধুয়ে ডাইনিং-এ ফিরে এল আলদুনি সেনফ্রিড। বলল, 'আসলে কে ছিল ওরা?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমার তো মনে হয় মরিয়া হয়ে ওঠা ব্ল্যাক-লাইটরাই এই অনুসন্ধানে নেমেছে। দেখলেন না, নন-ইউরোপিয়ান শিখ-এর কথা শুনেই ওরা একটু চমকে উঠেছিল। জিজ্ঞাসা করছিল আমাদের সাথে আর কেউ আছে কি না?'

'ঠিক মি. আহমদ মুসা। এ না হলে ওরা আমাদের সাথে আর কেউ আছে কি না তা জানতে চাইবে কেন? ব্রুনাকে আমাদের সাথে না রাখার আপনার সিদ্ধান্তটা সঠিক হয়েছে।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলর, 'যাই মি. আলদুনি সেনফ্রিড, একটু কাজ সারি।'

আহমদ মুসা ল্যাপটপে অ্যারেন্ডসীর গুগল চিত্রটা সামনে নিয়ে এল। হ্রদের চারদিকে আবাসিক এলাকার অবস্থান, জংগল এরিয়া, রাস্তাগুলোর গতি-প্রকৃতি, জেটিগুলোর স্থান, সব কিছুই গভীর দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলো আহমদ মুসা। আলদুস আলারীর কাছে থেকে পাওয়া '৪৯০-এর সি' বাড়িটা কোনটা? অ্যারেন্ডসীতর চারদিক ঘিরে যে রাস্তা রয়েছে, তাতে ৪৯০ একটিই রয়েছে। কিন্তু ৪৯০ এটা অ্যারেন্ডসী থেকে বিচ্ছিন্ন বাজার এলাকার বাসস্ট্যান্ডের একটা 'রোড শপে'র নাম্বার। আর তাতে এবিসি ইত্যাদির মত কোন এক্সটেনশন নেই। তাহলে এটা ভুয়া নাম্বার? প্রাচীন ইউরোপ অংকগুচ্ছের সংখ্যামাণ দিয়েও ধাঁধাঁ তৈরি করা হতো। ৪৯০-এর সংখ্যা মানের সিরিয়াল যোগফল হলো ১৩০, তাহলে ১৩০ এবিসি কি আমাদের টার্গেট হতে পারে? গুগলে হ্রদের চারদিকের রাস্তার অবস্থান দেখে আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, ১৩০ নাম্বারটি হ্রদের পশ্চিম তীরের মাঝামাঝি কোথাও হবে। কিন্তু গুগল চিত্রে খুঁটেখুঁটে দেখেও ১৩০ নাম্বার পেল না।

আহমদ মুসা অন্যান্য ক্লু'র দিকে নজর দিল। ক্লুগুলোর মধ্যে রয়েছে 'হ্যাটটপ ট্যানেল প্যালেস' ও 'লেক প্যালেস'। 'লেক প্যালেস' বলতে হ্রদের তীরের কোন বাড়িকে বুঝানো হতে পারে। এর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। কিন্তু 'হ্যাটটপ ট্যানেল প্যালেস' অর্থ কি? ট্যানেলেই তো ট্যানেলই -ঠিক আছে। কিন্তু হ্যাটটপ-এর তাৎপর্য কি? হ্যাটটপ ট্যানেলের সরলার্থ দাঁড়ায় 'হ্যাটটপ' জায়গায় ট্যানেল অথবা হ্যাটটপ-এর মত ট্যানেল। এ দু'টি অর্থের কোনটিকে গ্রহণ করা হয়েছে? হ্যাটটপ-এর মত কি ট্যানেল হতে পারে? ট্যানেল তো হয় লম্বা-অর্থ দাঁড়ায় যোগাযোগের মাধ্যম, হ্যাটের মত বন্ধ মুখ তো হয় না। হ্যাটের মত কিছু হলে সেটা হবে খন্দক, গর্ত-ট্যানেল তো হয় না। এটা কোন বাড়ির নাম হতে পারে অথবা লেক প্যালেসেরই এটা আরেক নাম হতে পারে।

আহমদ মুসা যখন এই জটিল চিন্তায় নিমজ্জিত, তখন ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড তার পাশে এসে বসেছিল। কিন্তু আহমদ মুসা টের পায়নি। তারা কেউ কথা বলেনি। ধ্যানমগ্নের মত চিন্তায় নিমজ্জিত আহমদ মুসাকে তারা জাগাতে চায়নি। নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাবছে সে।

পল পল করে সময় বয়ে যায়। হঠাৎ আহমদ মুসা ল্যাপটপ বন্ধ করে রাখতে গিয়ে তার নজর পড়ল ব্রুনা ও আলদুনি সেনফ্রিডির উপর।

'আরে! আপনারা কখন এলেন, ব্রুনা কখন এল আমাদের স্যুটে?' বলল আহমদ মুসা।

'আমরা দশ মিনিট হলো এসে বসে আছি ভাইয়া।' ব্রুনা বলল।

'স্যরি, আমি একটা বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম। খেয়াল করতে পারিনি। স্যরি।' আমহদ মুসা বলল।

'স্যরি নয়। কোন ভাবনার মধ্যে ডুবে আছেন দেখে আমরা কিছু বলিনি।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'এতবড় কি ভাবনা ভাইয়া?' ব্রুনা বলল।

'ভাবনাটা বড়ই। আচ্ছা ব্রুনা, কোন স্থানের লোকেশন ইন্ডিকেট করতে গিয়ে যদি বলা হয় হ্যাটটপ ট্যানেল প্যালেস, তাহলে তার অর্থ কি দাঁড়াবে?' বলল আহমদ মুসা।

‘হ্যাটটপ ট্যানেল প্যালেস। মানে হ্যাটটপের মত ট্যানেল বা ট্যানেলটা হবে হ্যাটটপের মত।’ এই তো অর্থ দাঁড়ায়।

‘কিন্তু হ্যাটটপের মত হলে তা ট্যানেল হবে না। হ্যাটটপ তো ক্লোজড। ট্যানেল তো ক্লোজড হবে না। ট্যানেলের দুই মাথাই উম্মুক্ত কোন কিছুর সাথে যুক্ত থাকবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক বলেছেন ভাইয়া, তাহলে হ্যাটটপ ট্যানেলের অর্থ কি দাঁড়াবে?’ বলে ভাবতে লাগল ব্রুনা।

‘দেখ তো ব্রুনা, হ্যাটটপ-এর মত জায়গায় ট্যানেল বা বাড়ি এই অর্থটা কেমন হয়?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক ভাইয়া, এই অর্থটাই অ্যাপ্রোপিয়েট। হ্যাটটপের মত জায়গায় ট্যানেল বা বাড়ি এটাই সঠিক অর্থ ভাইয়া। কিন্তু বিষয়টা কি ভাইয়া?’ ব্রুনা বলল।

‘আলদুস আলারীর কাছ থেকে ব্ল্যাক লাইটের যে ক্লুগুলো পেয়েছিলাম, তার মধ্যে এটাও আছে। তাই এর অর্থ সন্ধান করছি। এর অর্থ পাওয়া খুবই জরুরি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তখন বলেছিলেন বাড়ির নাম্বারও পেয়েছিলেন। সেটাই তো সবচেয়ে সোজা কোন বাড়ি খুঁজে বের করার জন্য।’ ব্রুনা বলল।

‘সে নাম্বার নিয়েও ধাঁধায় পড়েছি। ওটা অ্যারেন্ডসীর পশ্চিমের একটা বাজার এলাকার আন্তনগরী বাসস্ট্যান্ডের একটা ‘রোড শপে’র নাম্বার। ভেবে দেখেছি ওটা ব্ল্যাক লাইটের হতে পারে না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভুয়া নাম্বার তাহলে ওটা?’ ব্রুনা বলল।

‘ভুয়া হতে পারে, আবার আসল নাম্বারও এর মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা। বলে আহমদ মুসা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল ব্রুনাকে।

‘হ্যাঁ ভাইয়া, একটা রুপকথায় আমি অংকের সংখ্যামাণ দিয়ে ধাঁধার কথা পড়েছি। তাহলে ১৩০ তো হতে পারে ঐ বাসার বা বাড়ির নাম্বার।’ ব্রুনা বলল।

কিন্তু সার্চ করে ১৩০ নাম্বারের কোন কিছু পেলাম না গুগলে। হতে পারে এ নাম্বারটা উল্লেখযোগ্য কোন কিছুর নয়। তাই গুগলে আসেনি। তবে নাম্বারটা অ্যারেন্ডসী হ্রদের পশ্চিম তীরের কোন এক জায়গার হতে পারে।'

কথাটা বলেই আহমদ মুসা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। পাশ থেকে ল্যাপটপ টেনে নিয়ে অ্যারেন্ডসীর স্যাটেলাইট ভিউ বের করল। বড় করে ছোট করে ভিউটাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করল। ভিউটাকে ব্রুনা ও আলদুনি সেনফ্রিডের সামনে ধরে বলল, 'দেখুন তো, অ্যারেন্ডসীকে হ্যাট-সাইজের মনে হচ্ছে না?'

ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড গভীর মনোযোগের সাথে দেখছে অ্যারেন্ডসী হ্রদের স্যাটেলাইট ভিউটা।

ব্রুনা চিৎকার করে বলে উঠল 'চমৎকার! চমৎকার!! অ্যারেন্ডসীর আকার সুন্দর একটা হ্যাটের মত।'

'এবং হ্যাটটপটা পশ্চিম উপকূলের মাঝ বরাবর।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক বলেছেন ভাইয়া, হ্যাটটপটা ঠিক পশ্চিম উপকুলের মাঝ বরাবর।' বলল ব্রুনা।

'তার অর্থ হলো, 'হ্যাটটপ ট্যানেল প্যালেস' ওখানেই পাওয়া যাব্।

এখন একটাই সমস্যা থাকলো এবং তা হলো 'লেক প্যালেস' কোথায় তা বের করা।' আহমদ মুসা বলল।

'লেখ প্যালেস কি?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'আমি জানি না। এ নামটাও পেয়েছি আলদুস আলারীর কাছ থেকে।' আহমদ মুসা বলল।

'এখন তাহলে কি পরিকল্পনা? কি করতে চাচ্ছেন আপনি?' জিজ্ঞাসা আলদুনি সেনফ্রিডের?

'আমি আজ এগারটায় বেরুব। যে ক্লুগুলো পাওয়া গেছে তা পরখ করে দেখার চেষ্টা করব। ঘটনা কোথায় নিয়ে যায় দেখা যাক।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি একা বেরুবেন?' জিজ্ঞাসা ব্রুনার। তার চোখে-মুখে ভাবনার প্রকাশ।

'একা নয়।' আহমদ মুসা বলল।

‘একা নয়? সাথে থাকবে কে তাহলে? আমি বাবা, আমরা নিশ্চয়ই নই?’ বলল ব্রুনা।

‘না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে কে?’ ব্রুনাই বলল।

‘আল্লাহ, আমার স্রষ্টা ও আমার অভিভাবক।’ আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনা, আলদুনি সেনফ্রিড কেউ কথা বলল না। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

আনন্দ-উজ্জলতার অপূর্ব মিশ্রণ সেখানে। তাদের স্থির দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

‘এই জন্যেই বুঝি আপনার কোন ভয় নেই, কোন উদ্বেগ নেই?’ বলল ব্রুনা। বিমুগ্ধ তার দৃষ্টি।

‘অবশ্যই তাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এই ভয়, উদ্বেগ থাকে না কেন?’ জিজ্ঞাসা ব্রুনার।

‘কেউ যদি মনে করে জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ, অন্য কারো হাতে এটা নেই। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে আল্লাহ যা নির্ধারিত করেছেন, তার বাইরে কিছু করার কারও ক্ষমতা নেই, তাহলে কারও মনে ভয়, কোন কিছুর জন্যে উদ্বেগ থাকার কথা নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এমন বিশ্বাস আমাদের হওয়া কি সম্ভব? সবার জন্যে সম্ভব?’ বলল ব্রুনা।

‘আল্লাহকে চেনা, তাঁর ক্ষমতা ও দয়াকে উপলব্ধি করা, তাকেঁ এবং তাঁর রাসূল স: কে মানা এই বিশ্বাস এনে দেয় ব্রুনা। আমার কথায় কি তোমার মনে নতুন উপলব্ধি আসেনি; সাহস ও শক্তি বাড়েনি? বেড়েছে। এভাবেই সেই বিশ্বাস ও বিশ্বাসের শক্তি সবার মধ্যে আসতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল। কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল।

সংগে সংগেই আলদুনি সেনফ্রিড বলল, ‘ব্রুনা, চল আমরা যাই। মি. আহমদ মুসার বিশ্রাম হওয়া দরকার।’ বলে আলদুনি সেনফ্রিড উঠে দাঁড়াল।

ব্রুনাও উঠল। বলল, ‘ভাইয়া আপনি কি মনে করেন মাকে ওরা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে এবং এখানেই?’ কান্না ভেজা কন্ঠ ব্রুনার।

‘নিশ্চিত নই ব্রুনা। তবে এখানেই থাকার কথা। এবং আমার এখনও নিশ্চিত ধারণা স্টেট হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত এরা তাকে জীবিত রাখবে।’ বলল আহমদ মুসা।

আল্লাহ আপনার কথা সত্য করুন। আপনাকে আল্লাহ সাহায্য করুন। আমি আল্লাহকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করছি। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল ব্রুনা। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে চলা শুরু করল।

আলদুনি সেনফ্রিডও চলতে শুরু করল। তার মুখও বেদনায় পান্ডুর।

অ্যারেন্ডসী লেকের পশ্চিম তীরের যে এলাকাটাকে আহমদ মুসা হ্যাটটপ বলে ধরে নিয়েছিল, সেটা জংগল ও পাহাড়ী এলাকা। অ্যারেন্ডসী হ্রদের চারদিকে ঘুরে যে সার্কুলার রোড আছে, সেই রোড হ্রদের পশ্চিম তীরে এসে এই জংগল ও পাহাড়ী এলাকার বাইরে দিয়ে গেছে। এই রোড থেকে হ্রদের কিনারা পর্যন্ত পশ্চিম তীরের এই এলাকা গোটাটাই পাহাড় জংগলে ভরা। তবে জংগল ও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে জিগজ্যাগ অনেক পথ আছে। পথগুলো খুব সংকীর্ণ নয়। দুটি গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে।

বিস্মিত হল আহমদ মুসা, এই জংগল ও পাহাড়ের মধ্যে হোটেল। রেস্টহাউজ এবং প্রাইভেট বাড়িও আছে। কোনটা পাহাড়ের উপর। কোনটা উপত্যকায়। কিন্তু পুরোটাই পাহাড় জংগলে ঢাকা।স্যাটেলাইট ম্যাপে এগুলো দেখা যায়নি। আহমদ মুসার মনে আশা জাগল। তাহলে এসব বাড়ি, রেস্টহাউজ ও হোটেল কোনটার নাম্বার ১৩০ এ হতে পারে বা ১৩০ ডি হতে পারে।

আহমদ মুসা এই জংগল ও পাহাড় এলাকায় প্রবেশ করেছে উত্তর দিক থেকে। অ্যারেন্ডসী হ্রদের পশ্চিম তীরের উত্তর অংশে বেশ বড় আবাসিক এলাকা আছে। এই এলাকা পার হয়ে একটা ঝোপের আড়ালে গাড়ি রেখে আহমদ মুসা জংগল ও পাহাড় এলাকায় প্রবেশ করেছিল।

দু'পাশের ঝোপ-জংগল, পাহাড়, পাহাড়ের টিলা। এর মধ্যে দিয়ে পাথর বিছানো রাস্তা এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে।

সেই হোটেল, বাড়ি, রেস্টহাউজগুলো বেশ দূরে দূরে। জংগল ও পাহাড় ঘেরা এগুলোকে একটা করে দ্বীপ বলে মনে হয়। হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল, জার্মানীর 'হিউম্যান হ্যাবিটেশন এনসাইক্লোপেডিয়া'-তে অ্যারেন্ডসী সম্পর্কে পড়তে গিয়ে দেখেছিল, অ্যারেন্ডসীর পশ্চিম তীরের জংগল অঞ্চলটা সরকারের সংরক্ষিত অঞ্চল। ট্যুরিজমের স্বার্থে এখানে কিছু হোটেল এবং রেস্টহাউজ করতে

অনুমতি দিয়েছে খুব উঁচু মূল্য এবং শর্তের বিনিময়ে। কিছু প্রাইভেট বাড়ি হয়েছে, কিন্তু তাদের অনেক বেশি উচ্চমূল্য দিতে হয়েছে। তবে এই সুযোগেও এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

গাড়ি ছেড়ে আসার আগে আহমদ মুসা তার পোশাকও পাল্টে ফেলেছে। কালো জুতা, কালো প্যান্ট, কালো জ্যাকেট এবং কালো হ্যাট। ব্ল্যাক লাইটেরই পোশাক।

নি:শব্দে, কিন্তু দ্রুত হাঁটছে আহমদ মুসা।

এক জায়গায় একটা টিলার বাঁক ঘুরতেই সামনে একটা গাড়ি আসতে দেখল আহমদ মুসা। গাড়িটা শর্ট আলো জ্বেলে আসছে। লং ফোকাস থাকলে ওদের চোখে ধরা পড়ে যেত আহমদ মুসা। রাস্তার ধারে একটা ঝোপের আড়ালে সরে গেল আহমদ মুসা। ঝোপটার কাছাকাছি আসতেই গাড়ির গতি স্লো হয়ে গেল এবং ঝোপের পাশে গাড়িটা থেমে গেল। গাড়ি থেকে তিনজন নামল।

নামার সময়ই একজন বলল,'অযথা গাড়ি থামালো কেন? মানুষ এ পথে যাতায়ত করে না? করে।'

'করে, ঠিক আছে। কিন্তু সে রাস্তায় নেই কেন? লুকালো কেন?' দ্বিতীয় একজন বলল।

আহমদ মুসা বুঝল ওদের কাছে ম্যানডিটেক্টর আছে নিশ্চয়। এ জন্যই আহমদ মুসার উপস্থিতি তারা টের পেয়েছে।

আহমদ মুসা দেখল ওদের পরনেও কালো পোশাক। আপাদমস্তক কালো। ওরা তাহলে ব্ল্যাক লাইটের লোক। খুশি হলো আহমদ মুসা। আহমদ মুসা তাহলে ঠিকই এসেছে। ওদের ১৩০ নাম্বার বাড়িটা নিশ্চয় এই জংগলেই পাওয়া যাবে।

ওদের থামতে দেখেই আহমদ মুসা জ্যাকেটের পকেট থেকে রিভলবার হাতে নিয়েছিল। সাইলেন্সার ফিট করলো রিভলবারে।

দ্বিতীয় জনের কথা শেষ হতেই প্রথমজন বলল, 'এত রাত, এই জংগল, ভয়েও তো মানুষ পালাতে পারে।'

‘পারে, এটা সম্ভাবনার কথা। কিন্তু পালানোটা নিশ্চয়ই সন্দেহজনক।’ দ্বিতীয় জন বলল।

ঝোপের আড়ালে বসে আহমদ মুসাও মনে মনে বলল, ‘পালানোটা সন্দেহজনক ঠিকই ভেবেছে লোকটা। আর তার পালাবার কারণ তার গায়ের পোশাক। গাড়ির পরিচয় না জেনে এই পোশাকে সে গাড়ির মুখোমুখি হতে পারেনি। এখন প্রমাণ হচ্ছে, আহমদ মুসা পালিয়ে ঠিক করেছে।’

দ্বিতীয় জনের কথার উত্তরে প্রথম জন সাথে সাথেই বলল, ‘তাহলে এখন কি করবে? খুঁজবে? কোথায় খুঁজবে?’

‘এই ডিটেস্টর তাকে ধরিয়ে দেবে। এখন সে বাম দিকে আমাদের থেকে বিশ গজ দূরে কোন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়াও। দাঁড়ালে তার দাঁড়াবার লোকেশনও চিহ্নিত করা যাবে। রিভলবার প্রস্তুত কর তোমরা।’ বলল দ্বিতীয় জন।

‘কথা বলো না, শুনতে পেলে তো সে পালাবে।’ তৃতীয় একজন বলল।

আহমদ মুসা শুনে ফেলেছে। আহমদ মুসা মনে মনে বলল, সর্বাধুনিক ডিটেক্টর ওরা ব্যবহার করছে। এ ডিটেক্টর মানুষের লোকেশনও ‘পিন-পয়েন্ট’ করতে পারে।

আহমদ মুসা ওদেরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে আনার জন্যে এবং নিজেকে আরও নিরাপদ করার জন্যে ঝোপের আড়াল থেকে দৌড়ে অল্প দূরে একটা বড় গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

‘সে আরও পূব দিকে পালাচ্ছে। যাবে কোথায়?’ বলর সেই দ্বিতীয় জন।

একটু থেমেই সে আবার বলল, ‘সে এবার চল্লিশ গজ দূরে অবস্থান নিয়েছে। এস তোমরা আমার সাথে।’

‘ও তো পালাতেই থাকবে। তাকে আমরা জানি না। কি লাভ তার পেছনে দৌড়ে?’ বলল সেই প্রথম জন।

‘পালিয়ে সে কোথায় যাবে? আর কিছু দূর এগোলেই তো লেকের পানি। আর তাকে জানি না বলেই তো তাকে জানতে হবে। এই রাতে সে কোথায় যাচ্ছে? নিজেকে আড়াল করল কেন?’ বলল দ্বিতীয় লোকটি।

সামনে টর্চের আলো ফেলে ওরা তিনজন দ্রুত এগোলো সেই গাছের দিকে। ডিটেক্টর ওদের নিখুঁতভাবে বলে দিচ্ছে আহমদ মুসা ঠিক কোথায় লুকিয়ে আছে।

আহমদ মুসা বুঝল ওরা ডেসপারেট। আহমদ মুসাকে না ধরে ওরা ছাড়বে না। আর ধরতে পারলে এই পোশাক দেখার পর তাকে তারা বাঁচিয়ে রাখবে না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্যে তাকে আক্রমণেই যেতে হবে এবং তা এখনই। সংগে সংগেই আহমদ মুসা নিজেকে গাছের সাথে সেঁটিয়ে রেখে মুখটাকে গাছের প্রান্তে নিয়ে ডান হাত বের করে আলোর উৎস লক্ষ্যে মেশিন রিভলবার দিয়ে একপশলা গুলি করল। গুলিবৃষ্টি একটা স্থান জুড়ে সমান্তরালে টেনে নিল।

টর্চ বন্ধ হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। ওদিক থেকে গুলি এল না।

আহমদ মুসা গাছের আড়াল থেকে বেব হয়ে মাটিতে গড়িয়ে ওদের দিকে এগোলো।

ওদের কাছে পৌঁছে অন্ধকারেই বুঝল তিনটি মাটিতে পড়ে আছে।

এক হাতে রিভলবার নিয়ে অন্য হাতে ওদের টর্চটাই খুঁজে নিয়ে জ্বালল। আলো জ্বালতেই আহমদ মুসা দেখতে পেল, মৃত একজনের হাতের পাশে ‘ম্যান ডিটেক্টর’ মেশিনটি পড়ে আছে। আহমদ মুসা প্রথমেই ওটা তুলে নিয়ে পকেটে পুরল। এবার এই যন্ত্রটি তার সাথে নেই। তারপর টর্চের আলো ঘুরিয়ে দেখল দু’জন মারা গেছে। একজন বেঁচে আছে। সেও বুকের উপর কাঁধের নিচে গুলিবিদ্ধ হয়ে সাংঘাতিকভাবে আহত।

আহমদ মুসা তার মুখে টর্চের আলো ফেলে বলল, ‘তোমরা আমার পিছু নিয়েছিলে কেন? আমি কি দোষ করেছি?’

‘সন্দেহবশত এটা করা হয়েছে। আপনি না পালালে এ রকমটা হতো না।’ বলল লোকটি।

‘আপনি তো সাংঘাতিক আহত। এখনি কোন হাসপাতালে তো নিতে হয় আপনাকে।।’ আহমদ মুসা বলল।

‘না, হাসপাতালে নয়। রাস্তায় গাড়ি আছে। গাড়িতে উঠতে পারলে বাসায় পৌঁছতে পারি।’

আহমদ মুসা তাকে ধরে তুলল। ধরে গাড়িতে নিয়ে গেল তাকে।

আহত লোকটিকে পেছনের সিটে শুইয়ে দিয়ে সামনের ড্রাইভিং সিটে বসে আহমদ মুসা বলল, ‘কোথায় পৌঁছে দেব বলুন।’

বাড়ি নং ১৩০। অ্যারেন্ডসী ডয়েসল্যান্ড হোটেলের দু’শ গজের মত দক্ষিণে হবে।’ বলর লোকটি।

‘১৩০’ নাম্বার উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই আহমদ মুসার সারা দেহে আনন্দের একটা উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল। মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। একেবারে ওদের গাড়িতে চড়ে ওদের বাসায় যাওয়া।’

অ্যারেন্ডসী ডয়েসল্যান্ড হোটেল পার হয়ে ১৩০ নাম্বার বাড়ি পেতে কষ্ট হলো না। প্রাচীর ঘেরা বাড়ি। অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে বাড়িটা যেন লেকের ভেতরে ঢুকে গেছে। বাড়িটা তিন তলা। পাথুরে। বাইরে থেকে খুব নিরাভরণ দেখাচ্ছে। বেশ বড় গেট। গেটে স্টিলের দরজা।

গেটের সামনে গাড়ি থামতেই লোকটি আহমদ মুসাকে বলল, ‘ গেটের পিলারে দেখুন একটা ডিজিটাল বোর্ড আছে। ওখানে আপনি প্রথমে ওয়ান থ্রি জিরো মানে ১৩০ টাইপ করুন, তারপর ১৩০-কে উল্টো করে মানে জিরো থ্রি ও ওয়ান টাইপ করুন, এরপর ১৩০-এর মধ্যখান থেকে সিরিয়ালী টাইপ করে শেষে ওয়ান টাইপ করুন। মানে থ্রি জিরো ওয়ান টাইপ করতে হবে।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে গিয়ে গেটের পিলারে ঠিক পিলার রঙের কালো একটা ডিজিটাল বোর্ড পেল। হঠাৎ পিলারের দিকে তাকালে এ বোর্ডটা দেখা যায় না। ঠিক একই ধরনের রং হওয়ার কারণে তা চোখে পড়ে না।

টাইপ শেষ হওয়ার সংগে সংগেই নি:শব্দে দরজা খুলে গেল।

আহমদ মুসা গাড়িতে ফিরে এল।

এমন অযাচিতভাবে, এমন অকল্পনীয়ভাবে ব্ল্যাক লাইটের ঘাঁটির দূর্লভ কোড জানতে পারায় আহমদ মুসা ভীষণ খুশি হলো।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে এসে বসলে আহত লোকটি বলল,‘এবার ভেতর চলুন।’

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

গাড়ি নিয়ে ভেতরে ছোট একটা চত্বর। তারপর বড় একটা গাড়ি বারান্দা। গাড়ি বারান্দার দুই প্রান্ত দিয়ে নয় দশ ধাপের সিঁড়ি উঠে গেছে উঁচু বারান্দায়। বারান্দাটা বেশ লম্বা।

লম্বা বারান্দাটিতে তিনটি গেট। গেটগুলো একই রকম। তিনটি গেট দিয়েই বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করা যায় মনে করল আহমদ মুসা।

ভেতরে প্রবেশ করে কাউকেই দেখতে পেল না আহমদ মুসা।

গাড়ি বারান্দায় গিয়ে থেমেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে আহত লোকটি বলল, ‘আপনার নাম জানতে পারি?’

‘জো কার্লোস।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বাড়ি কোথায়? জার্মানীতে?’ জিজ্ঞাসা লোকটির।

‘না, দক্ষিণ স্পেনে।’ বলল আহমদ মুসা।

দক্ষিণ স্পেনে বলল আহমদ মুসা এই কারণে যে, ওখানে মাল্টিকালার লোক বাস করে।

‘কোথায় যাচ্ছিলেন আপনি?’ লোকটি বলল।

‘হোটেল ডয়েসল্যান্ডে। ওখানে একজনের সাথে আমার দেখা হওয়ার কথা আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

হঠাৎ করে এসব প্রশ্নের মুখে পড়বে তা ভাবেনি আহমদ মুসা। মনে মনে হিসেব করল এ পর্যন্ত কোন ভুল করে বসেনি তো সে?

‘আপনার কাছে পিস্তল কেন?’ জিজ্ঞাসা আবার সেই আহত লোকটির।

‘অনেকটা নিজের সেফটি এবং অনেকটা শখের জন্যেও। এ রিভলবারের লাইসেন্স আছে আমার।’

আহত লোকটি আহমদ মুসার দিকে একবার তাকাল। লোকটির চোখে অবিশ্বাস। বলল, 'আপনার সাহস ও বন্দুকবাজি দেখে নিছক শখ ও আত্নরক্ষার কথা মনে হচ্ছে না।'

কথা শেষ করেই লোকটি আহমদ মুসাকে বলল, 'আপনি সামনে ড্যাশবোর্ডের সবুজ বোতামটায় চাপ দেন।'

চাপ দিল আহমদ মুসা। কিন্তু গাড়িতে কিংবা কোথাও কোন শব্দ শুনতে পেল না। কিন্তু দেখল চাপ দেয়ার পর বোতামটি লাল হয়ে গেছে।

বোতামে চাপ দেয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লম্বা বারান্দার তিন দরজা দিয়ে চার পাঁচজন করে লোক ছুটে বেরিয়ে এল। তাদের কারও হাতেই অস্ত্র নেই। কিন্তু তারা যে সশস্ত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকদের পেছনে মাঝ দরজা দিয়ে স্ট্রেচার ঠেলে বেরিয়ে এল দু'জন। তাদের দু'জনের গায়ে ডাক্তারের এ্যাপ্রোন।

বারান্দার একটা সিঁড়ির ধাপ সরে গিয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল স্লোপিং এসকালেটর জাতীয় কিছু। সে এসকালেটর দিয়ে ঠেলে স্ট্রেচার নামিয়ে নিচে এল। লোকটা এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়াল।

লিডার রকমের একজন লোককে ডেকে আহত লোকটি তার কানে কানে কি যেন বলল।

সংগে সংগেই লোকগুলো এসে আহমদ মুসাকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের সকলের হাতেই উঠে এসেছে পকেট মেশিনগান।

দু'জন আহমদ মুসাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে তার দুই হাত বেঁধে ফেলল।

গাড়ির দরজার সাথে ফিট করা স্ট্রেচারে শুয়ে পড়ার সময় হাত বাঁধা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'জো কার্লোস ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি আমাকে বাঁচিয়ে রেখে আমাকে আমার আশ্রয়ে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু স্যরি মি. জো কার্লোস, যা ঘটেছে তাতে আপনাকে ছেড়ে দেয়া যায় না। আমাদের বসরা বাইরে। কালকে সন্ধ্যা নাগাদ তারা ফিরবেন। তারা আপনার পরিচয় যাচাই করে যা হয় করবেন। সেই সময় পর্যন্ত আপনাকে আটক থাকতে হবে।'

একটু থেমে আহত লোকটি তার লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, 'একে বন্দী করে রাখ, কিন্তু ভালোভাবে রাখ।'

স্ট্রেচারে করে বারান্দা দিয়ে যাবার সময় আহত লোকটি মাথা উঁচু করে উচ্চ স্বরে বলল, 'জো কার্লোসকে 'ডি'-তে নিয়ে রাখ।'

'সি' শব্দটি শুনে আহমদ মুসার দেহে আনন্দের উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল।

'সি' মানে '১৩০-এর ডি', যেখানে ব্রুনার মা কারিনা কারলিনাকে প্রথমে রাখার কথা বলেছিল। নিশ্চয় '১৩০-এর এ' যেখানে ব্রুনার মাকে রেখেছে বা রেখেছিল, এর আশেপাশেই এটা হবে।

আহত লোকটি চলে গেলে আহমদ মুসার চার পাশের লোকদের একজন গিয়ে উঁচু বারান্দার দেয়ালের এক জায়গায় তিনবার নক করল। সংগে সংগে বারান্দার দেয়ালে দরজা বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসাকে ঘেরাও করে নিয়ে সবাই সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরটা বাইরের বিপরীত। সাদা মার্বেল পাথরের দেয়াল। নিচে ফ্লোরে পুরু সাদা কার্পেট। মনে হলো গোটা ফ্লোরটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

ফ্লোরটিতে সারি সারি ঘর। ক্রিস-ক্রস করিডোর। ঘরের দরজা সবগুলোই বন্ধ।

কিছু দূর চলার পর আহমদ মুসাকে একটা ঘরে প্রবেশ করিয়ে একজন বলল, 'এটাই আপনার ঘর।'

ঘরে একটা বেড।

আহমদ মুসাকে বেডে শুইয়ে দিয়ে পা বেঁধে ফেলল। হাত আগেই বাঁধা ছিল।

আহমদ মুসাকে বেডে রেখে সবাই বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাওয়ার সময় একজন বলে গেল, 'অন্য একজন আসবে। সেই আপনার খাওয়া এবং প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করবে।'

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কথা বলা লোকটিই শুধু ভেতরে ছিল।

'আচ্ছা জনাব, এই ফ্লোর তো 'সি' দেখলাম। 'এ', 'বি'-ও আছে নাকি? তাহলে তো বিরাট বাড়ি।' আহমদ মুসা লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল।

'শুধু 'সি' হয় নাকি! 'সি' থাকলে 'এ' 'বি' তো খাকবেই। এটা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয় নাকি?' লোকটি বলল।

'কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে থাকতে হবে? বসরা কোথায় গেছেন? আগে আসতে পারেন না?' বলল আহমদ মুসা বোকা-বোকা কন্ঠে।

'আমরা কি ওসব জানি? শুনেছি তারা কোর্টে গেছেন। সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না। আবার কাজ হয়ে গেলে ফিরতেও পারেন।' বলেই লোকটি বের হয়ে গেল।

আহমদ মুসা তখন কিছুটা আনমনা হয়ে পড়েছিল কোর্টে যাওয়ার কথা শুনে। স্টেট কি হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে? নকল কারিনা কারলিন কি রেডি হয়ে গেছে। আসল কারিনা কারলিন এখন কোথায়। স্টেট হস্তান্তর হওয়া পর্যন্ত তো তাঁর বেঁচে থাকার কথা। তাহলে কালকেই তো তার শেষ দিন। কিছু করার সময় তো বয়ে যাচ্ছ্ আজ রাত এবং কাল দিনই মাত্র সময় আছে মনে হচ্ছে। যা করার এর মধ্যেই করতে হবে।

আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। এভাবে এদের এই ডেরায় প্রবেশ করতে না পারলে ও সব বিষয় জানা হতো না। জানা যেত না যে, ঘটনা ফাইনাল স্টেজে পৌঁছে গেছে। সময় হাতে মাত্র এক রাত এক দিন।

আহমদ মুসা তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল রাত সাড়ে ১২টা।

আহমদ মুসা ঠিক করল ঘন্টা দুয়েক সে রেস্ট নেবে, তারপর করণীয় চিন্তা করে কাজে নামবে।

হাত পায়ের বাঁধনটা সামান্য শিথিল করে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সে চোখ বুজল। রাত আড়াইটা।

হাত-পায়ের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে তার খুব অসুবিধা হলো না। পকেটের রিভলবার তার পকেটেই রয়ে গেছে, তারা আর তাকে সার্চ করেনি। এদিকে তার মোজার সাথে গুঁজা আছে লেজার গান, সেটাও খোঁজ করে নেয়নি। জুতার গোড়ালি থেকে ছুরি বের করে হাত পায়ের বাঁধন কেটে সে সহজেই মুক্ত হতে পেরেছে।

কক্ষ থেকে বের হওয়ার পর আধা ঘন্টা ধরে ফ্লোরের এদিকের কক্ষগুলো সে দেখেছ। কক্ষগুলোর কোনটি অফিস রুমের মত, কোনটি বেড রুম, কোনটি আবার স্টোর রুমের মত। এখানে তেমন কিছুই পেল না।

ঘুরতে ঘুরতে আহমদ মুসা একটা ফাইবার পার্টিশন ওয়ালের কাছে এল। ওয়ালের দরজা কোথায় খুঁজতে লাগল সে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও দরজা পেল না্ শেষে আহমদ মুসা লেজার কাটার দিয়ে ফাইবার ওয়ালের একটা অংশ কেটে ভেতরে প্রবেশ করল।

ভেতরটা একটা স্টোর রুম। নানা পণ্যে ঠাসা।

কিন্তু এই পণ্যগুলো এত সিক্রেট জায়গায় রয়েছে কেন? প্রশ্নের জবাব পেল না আহমদ মুসা।

ঘরের এক কোণায় একটা আলমারি পেল। আলমারিটি বেশ বড়।

আলমারিটি খোলার জন্যে হাতল ধরে টান দিল আহমদ মুসা। ওটা খুলল না।

বেশি চিন্তা করার সময় নেই আহমদ মুসার হাতে। লেজার রে' দিয়ে আলমারির লক অংশটা কেটে তুলে ফেলল।

আলমারির দরজা খুলতেই দেখতে পেল একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে।

আলমারির দরজা বন্ধ করে আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। সে মনে মনে বলল, এই সিঁড়িকে ক্যামোফ্লেজ করার জন্যে তাহলে স্টোর রুমটা সাজানো হয়েছে।

নিচে নেমে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। উপরের মতই আরেকটা ফ্লোর নিচে রয়েছে।

এই ফ্লোরে কক্ষের সংখ্যা কম। কিন্তু কক্ষগুলো বড় বড় এবং সুসজ্জিত।

সামনেই মাঝখানের একটা বিশেষ কক্ষে আহমদ মুসা একটা কম্পিউটার দেখতে পেল। কম্পিউটারটা সুন্দর, বড় স্ক্রীনের। কক্ষটাও খুব সুসজ্জিত। কম্পিউটারটিতে নিয়মিত কাজ হয় বলে মনে হলো আহমদ মুসার।

কম্পিউটারের পাশের টেবিলের বাস্কেটে কাগজ। টেবিলের নিচে ওয়েস্ট পেপারের বাস্কেটও রয়েছে।

আহমদ মুসা কম্পিউটারের চেয়ারে বসে টেবিলের নিচ থেকে ওয়েস্টে পেপারের বাস্কেটটাই টেনে নিল।

বাস্কেটের কাগজগুলো পরীক্ষা করতে লাগল।

অধিকাংশ কাগজই সাদা, খণ্ড খণ্ড।

একটা খণ্ড কাগজে কিছু লেখা দেখল। খণ্ডটিকে আহমদ মুসা চোখের সামনে নিয়ে এল। লেখার উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল সে। লেখা আছে জার্মান ভাষায়; প্রোসপেকট এন্ড বেনিফিট অব ক্লোন এইট, মানে 'ক্লোন এইট'-এর সম্ভাবনা ও লাভ।

কাগজ খণ্ডটিতে এর বেশি আর কিছুই লেখা নেই।

'ক্লোন-এইট' কথাটা আহমদ মুসার মনে তোলপাড় সৃষ্টি করল। ব্রুনার নকল মা'র প্রেসক্রিপশনে দেখেছিল 'ক্লোন সেভেন'। তার মানে ব্রুনার নকল মা ক্লোন সেভেন। 'ক্লোন সেভেন'-এর কাজ সমাপ্তির পথে। এখন 'ক্লোন-এইট' তাদের নতুন প্রকল্প। এই প্রকল্পেরই প্রোসপেস্ট ও বেনিফিট হিসেব করা হয়েছে। এই হিসেবেরই খসড়া আছে হয়তো এই কাগজ খণ্ডের অংশ অন্য টুকরো কাগজগুলোতে। খুঁজতে লাগল আহমদ মুসা।

বাস্কেটে বেশি কাগজ ছিল না। কাগজের টুকরোগুলো পেয়ে গেলো সহজেই।

কাগজগুলোকে টেবিলের উপর রেখে এক সাথে জোড়া দিল আহমদ মুসা। পড়া যাচ্ছে গোটা বিষয়টা। সংক্ষেপে কথা এই;

'স্টেটের কর্তা ব্যক্তির বয়স ৫০-এর মত হবে। তার কন্যা সন্তান নয় বছর বয়সের। তার ক্লোন তৈরি সহজ। পঁচিশ বছর পর এই স্টেট হাতে পাওয়া যাবে। স্টেটটি ১০ হাজার একরের। বার্ষিক আয় কমপক্ষে ১০ কোটি ডলার। এই প্রকল্পে ঝুঁকি তেমন নেই। স্টেটের কর্তা ব্যক্তি পরিবারে এবং এলাকায় খুবই আনপপুলার।'

প্রকল্পের বিবরণ থেকে স্টেটটিকে চেনার উপায় নেই, তবে এর মাধ্যমে ওদের ষড়যন্ত্র পরিষ্কার হয়ে গেছে। 'মানুষ ক্লোন' করাকে তারা বড় বড় স্টেট, সম্পত্তি দখলের হাতিয়ার বানিয়েছে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে এর আগে ব্রুনার মায়ের স্টেট ছাড়াও আরও ছয়টি স্টেট ছয়টি ক্লোনের মাধ্যমে ওরা দখল করেছে।

আহমদ মুসা খুব আগ্রহী হয়ে উঠল ছয়টি পরিচয় জানার জন্যে, যেগুলো ক্লোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ওরা দখল করে নিয়েছে।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, 'ক্লোন এইট' এর প্রোসপেক্ট ও বেনিফিট সম্পর্কে এখানে খসড়া করা হয়েছিল নিশ্চয় কম্পিউটারে রাখার জন্যে। তাহলে অন্য ক্লোনদের বিবরণও নিশ্চয় কম্পিউটারে রয়েছে।

খুব খুশি হলো আহমদ মুসা।

কম্পিউটার ওপেন করল। কিন্তু অপারেশনে যাওয়ার জন্যে কম্পিউটার পাসওয়ার্ড চাইল।

হতাশ হলো আহমদ মুসা।

এখানে পাসওয়ার্ড বেশি খোঁজাখুঁজি করার মত সময় দেয়ার সুযোগ তার নেই। তাকে দ্রুত এগোতে হবে। আসল কাজ এখনও বাকি।

আল্লাহর সাহায্য চেয়ে আহমদ মুসা ভাবল সে যদি 'ব্ল্যাক লাইট' হতো, তাহলে কি পাসওয়ার্ড রাখাকে বেশি প্রেফার করতো।

আহমদ মুসা অনেক বিকল্প নিয়ে চিন্তা করল এবং এসবকে পাসওয়ার্ড করতাম কি না ভেবে দেখল। এক এক করে সবই বাদ গেল। অবশেষে আহমদ মুসা সিলেকশন করল 'ক্লোন প্রজেক্ট'। আহমদ মুসা মনে মনে বলল, আমি ব্ল্যাক লাইট হলে সৌভাগ্যের প্রতীক এই শিরোনামকেই আমি পাসওয়ার্ড করতাম। ব্ল্যাক লাইটের 'ক্লোন প্রজেক্ট'টির কথা বাইরের কেউ জানে না। আবার অন্য কারও পক্ষে একে এই কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড মনে করাও অসম্ভব। সুতরাং যে কোন বিচারে এটাকেই আমি পাসওয়ার্ড করতাম।

মন স্থির করে আহমদ মুসা পাসওয়ার্ড হিসেবে 'ক্লোন প্রজেক্ট'-এর ১২ টি বর্ণ টাইপ করল।

কিন্তু কম্পিউটার সংগে সংগেই জানাল এটা 'ইনভ্যালিড পাসওয়ার্ড'।

আহমদ মুসার মনটা যতটা স্থির হয়েছিল, ততটাই আবার নড়বড়ে হয়ে গেল।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, এটা তো শুধু 'ক্লোন প্রজেক্ট নয়, এটা' 'হিউম্যান ক্লোন প্রজেক্ট।'

এই চিন্তা করার সাথে সাথেই আহমদ মুসা 'ক্লোন প্রজেক্ট'-এর ১২ বর্ণের আগে 'হিউম্যান'-এর আরও পাঁচটি বর্ণ যোগ করল। এরপর আহমদ মুসা 'সাইন ইন'-এ ক্লিক করল।

ক্লিক-এর সাথে সাথে বিশ্রী দু'টি শব্দ , 'ইনভ্যালিড পাসওয়ার্ড', আবার স্ক্রীনে ভেসে উঠল।

আহমদ মুসা এবার সত্যিই হতাশ হলো।

ঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা।

রাত সাড়ে তিনটা। উদ্বেগ বোধ করল আহমদ মুসা। আর এক ঘন্টার মধ্যে এখানকার সব কাজ তাকে শেষ করতে হবে।

মনটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল।

চোখ বন্ধ করে মনটাকে আল্লাহর দিকে রুজু করল।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, 'হিউম্যান' শব্দ 'বিশেষ্য পদ' নয়, খুব বেশি হলে গুণবাচক বিশেষ্য পদ। সেদিক থেকে এটা অনেকটাই 'বিশেষণ'-এর পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং পিওর নাউন 'ম্যান' যোগ হতে পারে 'ক্লোন প্রজেক্ট'-এর সাথে।

আহমদ মুসা 'ক্লোন প্রজেক্ট'-এর আগে 'ম্যান' শব্দ যোগ করে ১৫টি বর্ণ টাইপ করল পাসওয়ার্ড কলামে। বিসমিল্লাহ বলে ক্লিক করল 'সাইন ইন'-এ।

এবার ক্লিক-এর পর স্ক্রীন পাল্টে গেল।

স্ক্রীনে চলে এল কতকগুলো ফাইল নামসহ। প্রত্যেকটি 'ক্লোন প্রজেক্ট'-এর জন্যে ভিন্ন ফাইল। ক্লোন প্রজেক্ট-১ থেকে ক্লোন প্রজেক্ট-৮ পর্যন্ত সবগুলো প্রজেক্টের নাম শোভা পাচ্ছে কম্পিউটার স্ক্রীনে।

ক্লোন প্রজেক্ট-১ এর ফাইলে ক্লিক করল আহমদ মুসা। বেরিয়ে এল প্রজেক্টের হোম পেজ। হোম পেজে প্রজেক্টের লোকেশন, প্রজেক্টের টার্গেট,

প্রজেক্টের পাত্র-পাত্রী, প্রজেক্টের প্রবলেম ও সলিউশন, প্রজেক্টের প্রসপেক্ট, এই প্রজেক্টের সাকসেস ইভ্যালুয়েশন ও ক্লোজিং।

দারুণ আনন্দিত হলো আহমদ মুসা। যা দরকার তার সবই আছে প্রজেক্ট ফাইলে। পড়ার সময় নয় এটা। কম্পিউটার থেকে হার্ডডিস্ক নিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিল আহমদ মুসা। এটা থেকে সবকিছু জানা যাবে এবং এটাই হবে প্রমাণ। ব্ল্যাক লাইট বিজ্ঞানের এক আবিস্কার 'ক্লোনিং-কে কিভাবে অপব্যবহার করেছে, কিভাবে বড় বড় পরিবারের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি গ্রাস করার জন্যে 'ম্যান-ক্লোনিং'-কে ব্যবহার করেছে, ভবিষ্যতে তার আরও কি পরিকল্পনা ছিল, সবই এই ডিস্কের মধ্যে পাওয়া যাবে।

জ্যাকেটের এক পকেট থেকে মাস্টার স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে কম্পিউটার থেকে হার্ডডিস্কটা বের করে নিল। বেরিয়ে এল আহমদ মুসা ঘর থেকে।

মাথায় এবার চিন্তা ব্রুনার মা কারিনা কালিনকে ওরা কোথায় বন্দী করে রেখেছে।

উপরের সেই স্টোর রুমে ওঠার জন্যে সিঁড়ির পা দিতে যাবে এমন সময় দেখতে পেল সিঁড়ির পেছনের দেয়ালে 'এ' লিখে ডান দিকে এ্যারো দেয়া। এ্যারোটা আবার বেঁকে উপরের দিক ইংগিত করেছে। তাহলে 'এ' হবে উপরের দিকে। আহমদ মুসা ছুটে গেল সেখানে।

আহমদ মুসা দেখল, এ্যারোর পরেই দেয়ালের সাথে প্রায় অদৃশ্য হয়ে থাকা একটা লিফট।

আহমদ মুসা লিফটের সুইচ খোঁজ করতে লাগল।

সে লিফটের তিন দিকেই ভালোভাবে সুইচ সন্ধান করল। সুইচ হতে পারে এমন কোন কিছুই চিহ্ন খুঁজে পেল না। নিচে ফ্লোরের দিকে তাকাল আহমদ মুসা। শ্বেত পাথরের ফ্লোর। আহমদ মুসা দেখল লিফটের মাঝামাঝি যে পাথরটা এসে লিফটের গোড়ায় এসে শেষ হয়েছে, সে পাথরের এ দিকের প্রান্তে একটা জায়গা থেকে পাথরের চলটা উঠে গেছে। সেখানে আরেকটা সাদা পাথর কেটে চটাটা ঢেকে দেয়া হয়েছে। জোড়া লাগানো সাদা সিমেন্ট দিয়েই। এটা সাধারণ একটা বিষয়। এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কোন কারণ নেই। কিন্তু আহমদ মুসার কাছে

বিষয়টা বড় হয়ে দেখা দিল। এত সুন্দর ফ্লোরে এত সুন্দর দৃশ্যের একটা ছন্দপতন কেন ঘটানো হয়েছে? কেন পাথরটাকেই রিপ্লেস করা হয়নি। এটা কোন কিছুর ইংগিত কি?

আহমদ মুসা পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিল চলটা ওঠা পাথরটার উপর। সংগে সংগেই চটা পাথর খণ্ডটি দেবে গেল এবং খুলে গেল লিফট।

আহমদ মুসা লিফট দিয়ে উঠতে শুরু করল। লিফটে গাইডিং কোন ব্যবস্থা নেই। লিফট কোথায় যাবে, কোথায় দাঁড়াতে হবে, তা নির্দেশ করার উপায় নেই। এসব চিন্তা করে আহমদ মুসা চিন্চিত হলো, এ লিফট সোজা 'এ'-তেই যাবে, যেমন দেয়ালের লেখায় নির্দেশ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই কয়েকটা ফ্লোর অতিক্রম করেছে লিফট। এমনটা ভাবার সময়ই লিফট দাঁড়িয়ে গেল।

লিফটের দরজা খুললে কি দেখবে কে জান্ পকেট থেকে লেজার গান হাতে নিল আহমদ মুসা। ডান হাতের তর্জনীটা রাখল লেজার গানের ট্রিগারে।

দরজা খুলে গেল। দরজাটার কিছু সামনেই একটা খাট। একজন শুয়ে সে খাটে। খাটের উপর দিয়ে আহমদ মুসার চোখ গিয়ে পড়ল চেয়ারে বসে থাকা একজন মহিলার চোখের উপর। তার দৃষ্টি ছিল আগে থেকেই আহমদ মুসার উপর। তার রিভলবারের নল আহমদ মুসার চোখ বরাবর স্থির হয়ে আছে।

আহমদ মুসা তার লেজার গান তোলার সুযোগ পেল না। ওদিক থেকে ট্রিগার টেপার একটা অস্পষ্ট শব্দও কানে এল আহমদ মুসার। অনুভব করল আহমদ মুসা গুলি ছুটে আসছে।

মাথাটা আহমদ মুসার আপনাতেই ডানদিকে সরে গেল পলকের মধ্যে।

বাম কানে প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভব করল আহমদ মুসা। ঝর ঝর করে রক্ত নেমে এল কান থেকে। মুখের একাংশ এবং জ্যাকেটের বাম দিকে ছড়িয়ে পড়ল রক্ত।

কিন্তু আহমদ মুসরা ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। তার লেজার গান তুলে নিয়েছে আহমদ মুসা। ট্রিগার টিপেছে সংগে সংগেই লেজার গানের।

চেয়ারে বসে থাকা মহিলাটি যখন বুঝতে পারল তার প্রথম গুলি ব্যর্থ হয়েছে, তখন দ্বিতীয় গুলি চালাবার তার আর সুযোগ হলো না। ততক্ষণে আহমদ মুসার লেজার গানের ভয়ংকর ছোবল মহিলাটির মাথার অর্ধাংশ উড়িয়ে দিয়েছে।

আহমদ মুসার নজর গেল খাটের উপর। খাটের উপর শুয়ে থাকা মহিলাটি উঠে বসেছে। আতংকিত সে। দুই চোখ তার আতংক-উদ্বেগে বিস্ফোরিত।

মহিলাটিকে দেখে চমকে উঠল এবং সেই সাথে আনন্দিতও হলো আহমদ মুসা। ছবির সাথে হুবহু মিল আছে এই মহিলার। আশ্চর্য! এ যে ব্রুনার মা।

আহমদ মুসা দ্রুত ব্রুনার মায়ের সামনে গেল। বলল দ্রুত কন্ঠে, ‘মা, আমি আপনার মেয়ে ব্রুনা ও আপনার স্বামী আলদুনি সেনফ্রিডের কাছ থেকে এসেছি আপনাকে উদ্ধার করতে।’

ব্রুনার মা কারিনা কারলিন নির্বাক। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

‘মা, এখনি আমার মনে হচ্ছে ওরা এসে যাবে। ওরা এসে গেলে আর হয়তো সরে পড়া যাবে না।’ আহমদ মুসা আবার বলল।

‘হ্যাঁ, তুমি ঐ শয়তানীকে মেরেছ, ভালো করেছ। সে আমাকে অনেক জ্বালিয়েছে। কি বললে, তুমি ব্রুনা মা ও সেনফ্রিডের কাছ থেকে এসেছ? ঠিক বলেছ? ওরা কি বেঁচে আছে? ওরা মেরে ফেলেনি ওদের?’ বলল ব্রুনার মা।

‘না ওরা বেঁচে আছে, ভালো আছে এবং আপনার অপেক্ষা করছে। তারাই আমাকে পাঠিয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এতক্ষণে ব্রুনার মা’র মুখটা কিছু স্বাভাবিক হলো। বলল, ‘তুমি কে? এরা তো ভয়ংকর। কিভাবে এলে এখানে? না, বুঝেছি। তুমি গুলি খেয়েও ক্লারা লিসবেথ শয়তানীকে মেরেছ। ঠিক করেছ তুমি। কিন্তু বাছা, তুমিও তো সাংঘাতিক আহত। তোমার কান তো গুলিতে ফুটো হয়ে গেছে। রক্ত নামছে তো এখনও।’ বলল ব্রুনার মা।

'ওসব কিছু না, মা আপনি উঠুন। আমাদের পালাতে হবে। হাঁটতে পারবেন, না ধরব আমি আপনাকে?' আহমদ মুসা বলল।

'বেটা আমাকে ধরে নিয়েই চল।' বলল ব্রুনার মা।

আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে খাট থেকে নামিয়ে নিল। লিফট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আহমদ মুসা লিফট থেকে বের হওয়ার সময়ই দেখে নিয়েছিল লিফটা খোলার সেই একই ব্যবস্থা এখানে আছে।

ব্রুনার মাকে নিয়ে লিফট খুলতে গিয়ে হঠাৎ আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। বলল, 'মা, একটু দাঁড়ান আমি এ রুমটাকে ভেতর থেকে লক করে আসি। রুমে কি ঘটেছে তা এই মুহূর্তে কাউকে জানতে দেয়া যাবে না।'

বলে আহমদ মুসা দৌড়ে গিয়ে ঘরের দরজা লক করে এল।

তারপর ব্রুনার মাকে নিয়ে লিফটে ঢুকল। লিফট থেকে সেই ফ্লোরে নামল। কক্ষটা আগের মত। কেউ নেই।

সে কক্ষ থেকে আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে ধরে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরের সেই আলমারির ভিতর দিয়ে স্টোর রুমে ঢুকল।

'বাবা, বেরুতে পারবে এদের ঘাঁটি থেকে আমাকে নিয়ে? এদের অনেক লোক। অনেক পাহারা। আর ওরা মানুষ মারে পাখির মত করে। আমার স্বামী-সন্তানরা বেঁচে আছে ঈশ্বর আছে বলেই। আমি কি পৌঁছতে পারব তাদের কাছে?' বলল ব্রুনার মা।

'পারবেন মা। ঈশ্বর আছেন।' আহমদ মুসা বলল।

স্টোর রুম থেকে আহমদ মুসা ফাইবার ওয়াল কেটে যে দরজা করেছিল, সেই দরজা দিয়ে তাকে বন্দী করে রাখা সেই বিশাল কক্ষটিতে প্রবেশ করল। এ কক্ষেও কেউ নেই। আহমদ মুসা কক্ষ থেকে পালিয়েছে সেটা ওরা এখনও জানতে পারেনি। এখন লোকগুলো নিশ্চিন্ত মনে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। রাত ৪টা বাজতে যাচ্ছে। এ সময় স্টপ-কালচারের সভ্যতায় সবচেয়ে গভীর ঘুমের সময়। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা।

সেই উঁচু বারান্দার দেয়ালের যে দরজা দিয়ে আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকেছিল, সেই দরজা লক করা।

আহমদ মুসা ফিসফিসে কন্ঠে বলল, 'মা, বাড়ির এটাই শেষ দরজা। এ দরজার পরেই গাড়ি বারান্দা ও চত্বর। এখানে ওদের পাহারা থাকতে পারে। মা একটা কথা মনে রাখবেন, ওরা যদি সামনে থেকে আক্রমণ করে তবে আপনি আমার পেছনে থাকবেন, আর যদি পেছন থেকে আক্রমণ করে তাহলে আপনি আমার সামনে থাকবেন।'

'নিজে গুলি খেয়ে আমাকে বাঁচাতে চাও তুমি। কে তুমি বেটা? তোমাকে জার্মান বলে মনে হচ্ছে না?'

'সব বলব মা। পরে। এটুকু ভাবুন, গোটা মানব সমাজ একটা পরিবার, সব মাই সবার মা, তেমনি সব ছেলেই সবার ছেলে।'

বলেই আহমদ মুসা পকেট থেকে লেজার কাটার বের করে দরজার লক হাওয়া করে দিল।

আস্তে খুলে ফেলল দরজা আহমদ মুসা।

সামনেই গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে জার্মান ছয় সিটের জীপ। সামনে কোন প্রহরী দেখলো না। ওরা কি বারান্দায় আছে?

আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে কানে কানে বলল, 'মা, আমার সামনে থাকবেন। দৌড় দিয়ে আমরা ঐ গাড়িতে উঠব। ঠিক এই সময়ই সাইরেনের একটা চাপা আওয়াজ তার কানে এল। শব্দটা আসছে ভেতর থেকে।

আহমদ মুসা ব্রুনার মায়ের হাত ধরে বলল, 'মা, আসুন। ওরা জেনে ফেলেছে।'

দৌড় দিল আহমদ মুসারা। গাড়িতে উঠল তারা।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে এবং ব্রুনার মা আহমদ মুসার পাশের সিটে বসেছে।

গাড়ির চাবি লকের সাথেই লাগানো ছিল। গাড়ি চালিয়ে দ্রুত গেটের কাছে চলে গেল আহমদ মুসা।

গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়েই দৌড়ে আহমদ মুসা গেটের পিলারের কাছে চলে গেল। গেটের গায়ে অদৃশ্য ডিজিটাল লকে দ্রুত আহমদ মুসা টাইপ

করল ১৩০ ০৩১ ৩০১ অংকগুলো, এ কোড অংকগুলো দিয়েই আহমদ মুসা যাবার সময় লকগুলো খুলেছিল।

অংকগুলো টাইপ করার সময়ই বারান্দায় অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেল। পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেল বারান্দা দিয়ে অনেকগুলো লোক ছুটে আসছে। তাদের হাতের হ্যান্ড মেশিনগানগুলো তাকে লক্ষ্য করে তাক করা।

আহমদ মুসা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটির উপর। গুলির বৃষ্টি ছুটে এল তাকে লক্ষ্য করে। আহমদ মুসা বলের মত গড়িয়ে ছুটছিল গাড়ির দিকে।

গুলিবৃষ্টি চলছে অবিরাম।

আহমদ মুসা গড়িয়ে সামনে গিয়ে পৌঁছল এবং গাড়ির আড়াল নিয়ে দক্ষিণ পাশ দিয়ে গাড়িতে উঠল।

তারা বারান্দা ও বারান্দা থেকে নেমে আসা লোকদের সামনে বলে গাড়ির উত্তর পাশটা ওদের গুলিবৃষ্টির প্রধান শিকার।

গাড়ির পেছনের সিটে উঠে সিট ডিঙিয়ে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল আহমদ মুসা। বলল ব্রুনার মাকে, 'মা, আপনি সিটের উপর শুয়ে পড়ুন।'

গাড়ি স্টার্ট দেয়াই ছিল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

কোডের শেষ অংক টাইপ করার সংগে সংগেই দরজা খুলে গেছে।

তীব্র বেগে গাড়ি বেরিয়ে এল গেট দিয়ে।

আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করছিল ব্রুনার মা। চমকে উঠল ফিনকি দিয়ে কাঁধ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে দেখে।

'বেটা তোমার কাঁধে গুলি লেগেছে। রক্ত বেরুচ্ছে।' বলল উদ্বেগ ও কম্পিত গলায় ব্রুনার মা কারিনা কারলিন।

'মা, ওসব থাক। আগে আমাদের বাঁচতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

ছুটে আসা সব গুলির টার্গেট তখন আহমদ মুসার গাড়ি।

ব্রুনার মা শুয়ে পড়েছে গাড়ির সিটে।

আহমদ মুসা খুশি হলো যে, গাড়ি বারান্দায় আর গাড়ি নেই। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করতে হবে ওদের। আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল-আজ আল্লাহ তাকে পদে পদে সাহায্য করছেন।

ছুটছিল আহমদ মুসার গাড়ি। জিগজ্যাগ, উঁচু-নিচু বিপজ্জনক রাস্তা। এ রাস্তায় মাঝারি স্পিডেও গাড়ি চালানো অসম্ভব। তার উপর বড় গাড়ি। ওরা সংগে সংগে ফলো করতে পারলে বিপদই হতো।

আহমদ মুসারা জংগলের প্রান্তে চলে এল। আহমদ মুসার গাড়ি রাস্তার যে দিকে পার্ক করা আছে ঝোপের আড়ালে তার বিপরীত দিকে রাস্তায় উপর সহজেই দৃশ্যমান একটা জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়েই আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটল নিজের গাড়ির দিকে। দৃশ্যমান জায়গায় গাড়ি ছাড়ল এ কারণে যে, গাড়ি দেখলে ওরা গাড়ি থেকে নামবে। কেন গাড়ি দাঁড় করালাম তা জানার চেষ্টা করবে। আশেপাশে আমরা আছি কি না এসব চিন্তায় অনেকটা সময় তারা নষ্ট করবে। এটা আহমদ মুসাদের জন্যে প্রয়োজন।

'গাড়ি ছাড়লে কেন? কোথায় যাচ্ছ বেটা?' ক্লান্ত স্বরে ব্রুনার মা বলল।

'আমার গাড়ি লুকানো আছে এদিকে।' আহমদ মুসা বলল।

'ও, সব ব্যবস্থা করেই গেছ। দেখছি এদের চেয়ে তুমি অনেক বুদ্ধিমান।' বলল ব্রুনার মা।

গাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল আহমদ মুসারা। বলল আহমদ মুসা, 'মা গাড়িতে উঠুন।' গাড়ির দরজা দ্রুত খুলে ধরল আহমদ মুসা।

ব্রুনার মাকে গাড়িতে তুলে গাড়ির দরজা বন্ধ করে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে উঠল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে। তার গাড়ি যখন রাস্তায় গিয়ে উঠল, তখন পেছনে কিছু দূরে একাধিক গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল।

আহমদ মুসা তার গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল।

কান ও কাঁধের ব্যথা আহমদ মুসা অনুভব করতে পারছে। এই কাঁধের নিচেই বাহুর মাসলে কয়েকদিন আগে সে গুলি খেয়েছিল। আহত হওয়ার কথা মনে হওয়ায় ব্যথা বাড়ছে।

কিন্তু এখন কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার সময় নয়।

আহমদ মুসা তার দুর্বল হয়ে পড়া বাম হাত দিয়ে স্টিয়ারিং হুইল ধরে রেখে ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করল। কল করল আলদুনি সেনফ্রিডকে।

ওপার থেকে সাড়া পেতেই বলল, মি. সেনফ্রিড, আমাদের মিশন সফল। আপনি ও ব্রুনা এখনি চেকআউট করে হোটেলের গাড়ি বারান্দায় আসুন। আমি ওখানে পৌঁছার পর দেরি করা সম্ভব হবে না। আপনারা গাড়িতে এলেই সব দেখবেন। আমি রাখছি।'

কল অফ করে দিয়ে আহমদ মুসা মোবাইল পকেটে রাখল।

আহমদ মুসার কথা শুনছিল ব্রুনার মা কারিনা কারলিন। আহমদ মুসা কল অফ করতেই ব্রুনার মা বলে উঠল, 'তুমি সেনফ্রিডের সাথে কথা বললে? ব্রুনা, সেনফ্রিড এখানে আছে? এখনি গাড়িতে আসবে ওরা?' কান্না রুদ্ধ কন্ঠ তার। কষ্ট করে কান্না রোধ করছে সে।

'হ্যাঁ মা, মি. সেনফ্রিডের সাথে কথা বললাম। মি. সেনফ্রিড ও ব্রুনাকে এখনি গাড়িতে দেখতে পাবেন।' আহমদ মুসা বলল।

রাতের অ্যারেন্ডসী। ফাঁকা রাস্তা। দু'একটা গাড়ি কিঞ্চিত চোখে পড়ছে।

অ্যারেন্ডসীর তিন দিক ঘুরে গাড়ি এসে তাদের হোটেলের গাড়ি বারান্দায় প্রবেশ করল।

গাড়ি দাঁড় করিয়েই আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে সামনের সিট থেকে নামিয়ে নিয়ে পেছনের সিটে বসাল।

একবার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল ব্রুনারা তখনও এসে পৌঁছেনি।

আহমদ মুসা ফিরে যাচ্ছিল তার ড্রাইভিং সিটে। এই সময় লবীর দরজা দিয়ে মি. সেনফ্রিড ও ব্রুনা বেরিয়ে এল। তাদের চোখে-মুখে উদ্বেগ-উত্তেজনা। দ্রুত ওরা গাড়ির কাছে এল।

'প্লিজ, আপনারা গাড়িতে উঠুন। মি. সেনফ্রিড পেছনটা ঘুরে আপনি বাম পাশে উঠুন।'

বলে আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল।

ব্রুনা ও সেনফ্রিড একে-অপরের দিকে একবার তাকিয়ে গাড়ির দিকে এগোলো গাড়িতে ওঠার জন্যে। গাড়িতে উঠল ওরা।

ওরা গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করতেই আহমদ মুসা গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়িতে ওঠার পরপরই ব্রুনা 'মা' বলে চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল। কেঁদে উঠল তার মা কারিনা কারলিনও।

গাড়ি রাস্তায় এসে পড়তেই আহমদ মুসা প্রায় ফাঁকা রাস্তায় গাড়ির গতি শহরের সর্বোচ্চ সীমায় তুলল।

অ্যারেন্ডসীর গভীর রাতের নীরব প্রহর। মা, মেয়ে, বাবার মিলিত কান্নার আর্তকন্ঠ তবু কারও কানেই পৌঁছল না গাড়ির বন্ধ দরজা পেরিয়ে।

আহমদ মুসা কিছুই বলল না। কাঁদা উচিত ওদের।

গাড়ি অ্যারেন্ডসী শহর পেরিয়ে সালজওয়াডেলের রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

ব্ল্যাক লাইটের লোকরা আহমদ মুসাকে হামবুর্গের রাস্তায় তালাশ করবে। কারণ ওদের এটাই জানা যে আমি হামবুর্গ হয়ে এখানে এসেছি। সুতরাং সালজওয়াডেলের রাস্তা যেমন নিরাপদ, তেমনি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত।

মা, মেয়ে, বাবার কান্না তখন থেমে গেছে। কথা বলতে ওরা শুরু করেছে।

এক সময় ব্রুনার মা কারিনা কারলিন বলে উঠল, 'সেনফ্রিড, ব্রুনা তোমরা আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। আমার ঐ ছেলেটার খবর তোমরা জান না। সে দারুণভাবে আহত। তার কাঁধে গুলি লেগেছে। তার একটা কান গুলিতে ফুটো হয়ে গেছে। সেগুলো থেকে রক্ত ঝরছ। বাছাকে তোমরা দেখ। এই ছেলের সাহস ও বুদ্ধির কোন তুলনা হয় না। মনে হয় একাই সে একশজনের কাজ করতে পারে।'

'কি বলছ মা?' বলে আর্তনাদ করে উঠল ব্রুনা।

'এই অবস্থায় উনি গাড়ি চালাচ্ছেন? আপনি দাঁড়ান ভাইয়া।' উদ্বেগভরা কন্ঠে বলল ব্রুনা।

'শুধু এই গাড়ি চালানো নয়! এমন আহত হয়েও গুলিবৃষ্টির মধ্যে সে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।' বলল ব্রুনার মা।

‘আমরা শহর থেকে বের হয়ে এসেছি। সামনে একটা টিলাময় জংগল এলাকা আছে। ওখানে গিয়ে দাঁড়াব আমরা।’ আহমদ মুসা বলল।

সত্যিই কিছু দূরে গিয়ে জংগলপূর্ণ টিলা এলাকা পাওয়া গেল।

আহমদ মুসা গাড়িটা রাস্তা থেকে একটা টিলার আড়ালে নিয়ে দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে ব্যাগটা নিয়ে নামল আহমদ মুসা।

সবাই নামল। নামল ব্রুনার মা-ও!

‘আপনারা একটু দাঁড়ান। আমি ব্যান্ডেজ বেঁধে আসছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যরি, মি. আহমদ মুসা, যেখানে আপনার আঘাতটা লেগেছে সেখানে নিজের পক্ষে ব্যান্ডেজ বাঁধা সম্ভব নয়। গাড়ির হেড লাইটের সামনে আপনি বসুন। আমি বেঁধে দিচ্ছি। প্লিজ, মি. আহমদ মুসা। আমাদের জন্য এত করছেন আর আমাদের এটুকু করতে দেবেন না?’ আবেগরুদ্ধ ভারি কন্ঠ আলদুনি সেনফ্রিডের।

‘ঠিক আছে।’ বলে আহমদ মুসা বসে পড়ল। আসলে আহমদ মুসাও জানে তার ডান হাতকে বাম হাত পুরো সহযোগিতা করতে পারবে না। ব্যান্ডেজ যাকে বলে সেটা তো হবেই না।

জ্যাকেটসহ গায়ের জামা আস্তে আস্তে খুলল আলদুনি সেনফ্রিড।

গলা ও কাঁধের সংযোগস্থলের সামান্য বাইরে কাঁধে লেগেছে গুলি। ক্ষতটা বেশ বড়। কাঁধের মাসলে গুলি থাকতে পারে, সেটা আহমদ মুসাই বলল আলদুনি সেনফ্রিডকে।

কি করবে, কিভাবে কাজ শুরু করবে, এমন দিশেহারা অবস্থায় পড়ে গেল আলদুনি সেনফ্রিড। ওদিকে আহমদ মুসা আবার বলল, ‘আমার ব্যাগের ভেতরে দেখুন একটা সুইচ নাইফ কিটস আছে। সেখান থেকে ছুরিটা বের করে ক্ষতস্থানের সামনের দিকের কিছুটা চামড়া কেটে ফেলুন। বুলেটটা বেশি গভীরে যায়নি, উপরেই আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।’

আহমদ মুসার কথা শুনেই আঁৎকে উঠল সেনফ্রিড। এই কাটাকুটো করা দূরের কথা, এটা দেখতেও তার ভয় করে।

ব্রুনা তার বাবার চেহারা দেখে সব বুঝতে পারল যে, তার বাবা এটা করতে পারবে না। কিন্তু কাজটা তো করতে হবে। গুলি বের না করলে আহমদ মুসার ক্ষতি হবে। এই চিন্তা ব্রুনাকে দারুণভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলল। ব্রুনা কলেজে পড়ার সময় ফার্স্ট এইড ট্রেনিং নিয়েছে। সে আহত জায়গায় ড্রেসিং করতে পারবে। কিন্তু গুলি বের করা! এটা তো সাংঘাতিক ব্যাপার! হঠাৎ ব্রুনার মনে পড়ল, একটা নার্সিং ক্লাসে একজন ডাক্তার একদিন বলেছিলেন, একটা গুলি যখন কোথাও প্রবেশ করে তখন সে তার রাস্তা তৈরি করেই প্রবেশ করে। একটু সাহস করলে সে পথ দিয়ে তা বের করাটাও সহজ। ব্রুনার মনে সাহসের সৃষ্টি হলো। বলল সে তার বাবা সেনফ্রিডকে লক্ষ্য করে, 'বাবা, তুমি এসবের কিছু জান না, করওনি কোনদিন। তুমি সরে এস বাবা, আমার ট্রেনিং আছে। আমি পারব।'

বলে ব্রুনা আহমদ মুসার দিকে এগোলো।

সরে দাঁড়াল মি. সেনফ্রিড।

আহমদ মুসা কিছুই বলল না।

ব্রুনা প্রথমেই ব্যাগ থেকে তুলা বের করে ক্ষতস্থানের রক্ত মুছে ফেলল। বলল, 'ভাইয়া, প্রথমে গুলিটা বের করতে হবে। আপনার তো খুব লাগবে।

'তুমি কাজ শুরু কর ব্রুনা্ ডাক্তাররা রোগীর প্রতিক্রিয়ার তোয়াক্কা করে না, তোয়াক্কা করা উচিতও নয়।' আহমদ মুসা বলল।

'ভাইয়া, আমি ডাক্তার নই। কাটার জন্যে ছুরি কিভাবে ধরতে হয় সেটাও আমি জানি না। গুলিটা আমি বের করব, এটাই আমার সিদ্ধান্ত। এখন বলুন, আপনার কাঁধের যন্ত্রনার কেন্দ্রবিন্দুটা ঠিক কোন জায়গায়?' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসা কাঁধের ক্ষতস্থানের শেষ প্রান্তের একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলল, জায়গাটা ভারি হয়ে আছে এবং যন্ত্রণাও বেশি হচ্ছে।

'গুলি এখানেই আছে ভাইয়া। আপনার কি মত?' বলল ব্রুনা।

'ধন্যবাদ ব্রুনা। তোমার ভালো কমনসেন্স আছে। তোমার সাথে আমি একমত।' আহমদ মুসা বলল।

জায়গাটাকে ব্রুনা খুব ভালোভাবে দেখল। ক্ষতস্থানের শেষ প্রান্ত থেকে সেই যন্ত্রণা ও ভারি জায়গাটার শুরু। তার মানে গুলিটা ক্ষতস্থান থেকে খুব বেশি

দূরে নয়। আর ক্ষতস্থানের শুরু ও শেষটা দেখে মনে হচ্ছে গুলিটা হিট করার পর উপরের দিকে স্লোপ করেছে। নিচের দিকে নয়। সম্ভবত গুলিটা লেগেছে গাড়িতে ওঠার সময়, পেছন থেকে। যদি তাই হয় তবে গুলি বেশি নিচে যাবার কথা নয়। ব্রুনা এই চিন্তা করল-বন মেডিকেল কলেজের একজন ডাক্তার ট্রেনার হিসেবে আসা তাদের একটা ফার্স্ট এইড ক্লাসে নানা দৈব দুর্ঘটনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে এসব কথা বলেছিলেন। ব্রুনার আজ কাজে লাগল সে কথাগুলো।

ব্রুনা আহমদ মুসার ভারি হয়ে থাকা ও ব্যথাযুক্ত অংশের কেন্দ্রটার ডান প্রান্ত দিয়ে সুইচ মেইড অদ্ভুত ছুরিটা ঢুকিয়ে দিল চোখ বন্ধ করে। ব্রুনার হিসেব ব্যর্থ হলো না। তার ছুরিটা একটা ধাতব বস্তু স্পর্শ পাওয়ার সিগন্যাল দিল। আনন্দে চোখ খুলল সে।

ছুরির ফলা যতটা ভেতরে ঢুকেছে তাতে ব্রুনা নিশ্চিত হলো, ছুরির ফলা বুলেটের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে গেছে।

ব্রুনা আবার চোখ বন্ধ করে ছুরিটাকে অর্ধবৃত্ত পরিমাণ ঘুরিয়ে নিল বাম দিকে।

এ সুইচ ছুরিটার তীক্ষ্ণ একটা ফলা আছে। ফলার নীচে বড়শীর মত বাঁকা ক্ষুদ্র একাধিক খাঁজ আছে। ব্রুনা ছুরিটা ঢুকাবার সময় ছুরির এ দিকটা বুলেটের দিক থেকে বাইরে রেখেছিল। সেটাই ঘুরিয়ে নিল।

ব্রুনা বাম হাতে আহমদ মুসার বাম কাঁধ চেপে ধরে ছুরিটা ধীরে ধীরে টানতে লাগল। শক্ত কিছুতে আটকে গেল ছুরি। এটাই কি বুলেট?

ক্ষতস্থান দিয়ে নতুন করে রক্ত বেরুতে শুরু করেছে। ব্যথাও নিশ্চয় সাংঘাতিকভাবে বেড়েছে। হাত কাঁপছিল ব্রুনার।

বুলেটটাকে ছুরির খাঁজে যাতে ভালো করে আটকানো যায় এ জন্যে ছুরিটাকে বাম দিকে আরও চেপে ধরে জোরে একটা টান দিয়ে ছুরি বের করে নিল।

চোখ খুলল ব্রুনা। দেখল ব্রুনা রক্তের সাথে বুলেটটা গড়িয়ে পড়ছে পিঠের উপর দিয়ে।

বুলেটটা হাতে নিয়ে ব্রুনা চিৎকার করে বলল, ‘থ্যাংক গড, বুলেট বেরিয়ে এসেছে।’

ব্রুনার বাবা-মা আগেই চোখ বন্ধ করে রেখেছিল দৃশ্যটা দেখতে পারবে না বলে। তারাও চোখ খুলল।

কিন্তু আহমদ মুসা পাথরের মত বসে আছে। মুখ থেকে তার একটা শব্দও বের হয়নি।

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল আহমদ মুসার ক্ষতস্থান থেকে।

ব্রুনা চিৎকার করে কথাটা বলার পরই ছুটে গিয়ে গাড়ি থেকে ব্যাগ নিয়ে এসে তোয়ালে বের করে সেটা দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরল। বলল, আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, খুব কষ্ট পেয়েছেন ভাইয়া। আনাড়ি হাতের কাজ তো?

‘আল্লাহকে ধন্যবাদ দাও ব্রুনা। বুলেট তুমি সহজেই বের করেছ। এত সহজে বুলেট বের হয় না।’ আহমদ মুসা বলল। তার কন্ঠ কিছুটা অস্বাভাবিক। কন্ঠ তার কিছুটা বেদনাহত।

ক্ষতস্থানের উপর তোয়ালেটা কয়েক মিনিট ধরে রাখার পর তা সরিয়ে নিল। রক্ত বেরুনো কমেছে।

‘দু’ রকমের ব্যান্ডেজ, কোনটা দিয়ে বাঁধব ভাইয়া?’ বলল ব্রুনা।

‘দেখ একটা প্লেইন, আরেকটা মেডিকেটেড। মেডিকেটেডটা হাতে নাও।’

ব্যান্ডেজ বাঁধল ব্রুনা। আহত কানেও ফার্স্ট এইড দিল।

‘ব্রুনা, তুমি তো দেখছি ডাক্তার-নার্সদের মতই ব্যান্ডেজ বাঁধতে পার!’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড, ব্রুনার বাবা।

‘বাবা স্কাউট হিসেবেও এটা শিখেছি। আবার আমাদের নিয়মিত ক্লাস করতে হয়েছে ‘ফার্স্ট এইড’-এর উপর।’ বলল ব্রুনা।

‘ধন্যবাদ ব্রুনা।’ বলল তার বাবা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে আরেকটা গেঞ্জিজাতীয় জ্যাকেট বের করে পরে নিল। এ জ্যাকেট সে হামবুর্গে এসে কিনেছে মাত্র আগের দিন। আজই কাজে লাগল।

আহমদ মুসা জ্যাকেট পরে ব্রুনাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, ‘এই প্রথম কোন নন-ডাক্তার আমার দেহ থেকে বুলেট বের করল।’

‘তার মানে আপনার শরীর থেকে এর আগে অনেকবার বুলেট বের হয়েছে। কতবার?’ ব্রুনা বলল।

‘আমার গোনা নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ব্রুনার মা কারিনা কারলিন বলল আহমদ মুসাকে, ‘আমি, কেন সকলেই আমরা স্তম্ভিত যে, শরীর থেকে একটা বুলেট বের করার মত এত বড় ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা ঘটল, কিন্তু তুমি বেটা একটুও উহ আহ পর্যন্ত করনি। এটা কি করে সম্ভব আমি বুঝতে পারছি না বেটা।

‘আমি উহ আহ করলে ব্রুনা কাঁধ থেকে বুলেটটা বের করতে ভয় করত।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বেটা মানুষ যখন অসহনীয় ব্যথা পায়, তখন মুখ থেকে উহ আহ শব্দ আপনাতেই বের হয়। এটা কোন বিবেচনা দিয়ে কেউ রোধ করতে পারে না।’ বলল ব্রুনার মা।

‘মা, তুমি সাধারণ লোকের কথা বলছ, কিন্তু ইনি তো অসাধারণ। আমরা বিস্মিত হইনি এটা দেখে। তুমি যা দেখে বিস্মিত হচ্ছ মা, তার চেয়ে উনি অনেক বেশি বিস্ময়কর।’ ব্রুনা বলল।

‘ঠিক বলেছ ব্রুনা। আমাকে তার উদ্ধার করার দৃশ্যগুলো এখনো আমার চোখে ভাসছে। তুমি যা বলছ সে সময়গুলোতে আমার তাই মনে হয়েছিল।’ বলল ব্রুনার মা।

কথা বলার জন্যে মুখ হা করেছিল ব্রুনা। তাকে থামিয়ে দিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘এসব থাক প্লিজ। আমার কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।’ বলে একটু থামল আহমদ মুসা।

সবাই তাকিয়েছে আহমদ মুসার দিক্

আহমদ মুসা আবার বলতে শুরু করল, ‘আমাদেরকে সকালের মধ্যে বন-এ পৌঁছতে হবে। নকল কারিনা কারলিন কাল সকালেই ‘বন’-এর কোন

কোর্টে আপনাদের স্টেট অন্যের কাছে হস্তান্তর করছে। এটা আমাদের রোধ করতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনার মা কারিনা কারলিন, ব্রুনা, ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড সকলের মুখ বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, এই সম্পত্তি পাবার জন্যেই ওরা সব কিছু করছে।'

'আমাকে যারা বন্দী করেছিল, তাদের কিছু কথা-বার্তা থেকে আমি এটা বুঝতে পেরেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি বন্দী হয়েছিলেন? কখন? কিভাবে?' বলল ব্রুনা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে।

আহমদ মুসা সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল।

'বন্দীত্ব থেকে নিজে মুক্ত হলে, আবার এত বড় ঘটনাও ঘটালে? বলল ব্রুনার মা।

ব্রুনার মা'র কথা শেষ হতেই আলদুনি সেনফ্রিড বলল, 'স্টেটজাতীয় সম্পত্তির কেনা-বেচা হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট প্রদেশের হেডকোয়ার্টার বা রাজধানীতে হয়। সুতরাং ঠিকই ধরেছেন কারলিনার স্টেটের হস্তান্তর 'বন'-এ হবে।'

'এ কারণে আমরা বন-এ যাচ্ছি। রেজিস্ট্রি আটকাতে হবে এবং ওদের ধরিয়ে দিতে হবে। দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে ওদের ষড়যন্ত্রও ফাঁস করে দিতে হবে যাতে করে আর কারও সর্বনাশ তারা করতে না পারে বিজ্ঞানের অপব্যবহারের মাধ্যমে।' আহমদ মুসা বলল্

'এত অল্প সময়ে কিভাবে সম্ভব সেটা মি. আহমদ মুসা?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড। তার কন্ঠে হতাশা।

'দেখা যাক।' বলে পকেট থেকে মোবাইল বের করল আহমদ মুসা। কল করল জার্মানীর পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিসকে। ওপারে বরডেন ব্লিস-এর নিদ্রাজড়িত কন্ঠ পেতেই আহমদ মুসা বলল, 'আমি খুবই দু:খিত স্যার। ঘুম থেকে আপনাকে জাগালাম। কিন্তু বিষয়টি খুবই জরুরি।'

'মি. আহমদ মুসা, আপনি রাতে না ঘুমিয়ে কাজ করছেন! তার চেয়ে আমার ঘুম ভাঙানো কি খুব বড় হলো? বলুন মি. আহমদ মুসা, আপনার টেলিফোন

আমাকে আনন্দ দেয়, গৌরবান্বিত করে। জরুরি বিষয়টি কি প্লিজ বলুন।' বলল জার্মানীর পুলিশ প্রধান।

'আমি যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করছি, সেটা আপনি জানেন স্যার। ব্রুমসারবার্গ স্টেটের মালিক কিডন্যাপড হওয়া মিসেস কারিনা কারলিনাকে ঘন্টা খানেক আগে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়েছে তার স্টেটটা সকালেই হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছে। বন্দী অবস্থায় তার ফিংগার প্রিন্ট তারা দলিলে নিয়েছে। কোর্টে তার জায়গায় হাজির করছে তার ক্লোন করা নকল কারিনা কারলিনাকে। আপনার সাহায্য ছাড়া এই হস্তান্তর ঠেকানো যাবে না স্যার।' আহমদ মুসা বলল।

'মানে আসল কারিনা কারলিনের ক্লোন তৈরি করা হয়েছে? কিন্তু বয়স? এটা ধরা পড়বে না?' বলল ওপার থেকে পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

'এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্রুমসারবার্গ স্টেটের মালিক কারিনা কারলিনের সম্ভবত টিস্যু চুরি করে ২৫ বছর আগে এই ক্লোন তৈরি করা হয়েছে। চুলে রং করে, মেক আপ করে বয়সের পার্থক্য দূর করা হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'এতো সাংঘাতিক ব্যাপার মি. আহমদ মুসা। ঐ ক্লোন এবং ব্ল্যাক লাইট নামক গ্যাংয়ের লোকদের আমাদের হাতে পাওয়া দরকার। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আমি এখনি ব্রুমসারবার্গ ও বন-এর পুলিশকে বলে দিচ্ছি। তারা বন-এর সব কোর্টে পাহারা বসাবে।

আর সেখানকার প্রসিকিউশনকেও কারিনা কারলিনের ব্রুমসারবার্গ স্টেটের কোন ব্যাপার হলে তারা যেন সেটা পুলিশকে জানায় এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে চোখে চোখে রাখে। আর আপনি আহমদ মুসা আসল কারিনা কারলিনকে নিয়ে চলে আসুন।' বলল জার্মানীর পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

'স্যার, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাকে জানানো দরকার। এই ব্ল্যাক লাইট গ্যাংটি যেভাবে কারিনা কারলিনের ব্রুমসারবার্গ স্টেট দখল করতে চেষ্টা করছে, ঠিক এভাবেই এই গ্রুপটি এর আগে উত্তর জার্মানীর ৬টি স্টেট দখল করেছে। তারা...।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস বলে উঠল, 'তার মানে আহমদ মুসা, আরও ৬টি ক্ষেত্রে আসল মালিকের ক্লোন তৈরি করে সেই ক্লোন দিয়ে ৬টি স্টেট দখল করে নিয়েছে ঐ গ্যাং?'

'ঠিক বলেছেন স্যার। এটাই ঘটেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু কিভাবে প্রমাণ করব আমরা মি. আহমদ মুসা?' বলল পুলিশ প্রধান।

'মিসেস কারিনা কারলিনের কেসসহ ঐ ৬টি কেসের যাবতীয় বিবরণ, তথ্য, ফটোগ্রাফ ওদের কম্পিউটারে ছিল। আমি সে ডিস্ক নিয়ে এসেছি।'আহমদ মুসা বলল।

'বলেন কি আহমদ মুসা? এসব যদি আমরা পেয়ে যাই, গ্যাং-এর রাঘব বোয়ালকে ধরতে পারি, তাহলে এটাই হবে এই শতাব্দীর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা, শতাব্দীর সবচেয়ে বড় মামলা। আর এর গোটা কৃতিত্ব আপনার হবে আহমদ মুসা। মি. আহমদ মুসা আমি নিজে বন-এ আসছি, আপনিও আসুন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আমি ভোরে বন-এ পৌঁছাচ্ছি। আপনি ভালো আছেন তো মি. আহমদ মুসা?' বলল পুলিশ প্রধান।

'হ্যাঁ, ভালো আছি স্যার। তবে সামান্য আহত।' আহমদ মুসা বলল।

'আহত? গুলি লাগেনি তো?' বলল পুলিশ প্রধান।

'কাঁধে গুলি লেগেছিল। ওটা বের করা হয়েছে। এখন ভালো আছি।' আহমদ মুসা বলল।

'আমাকে উদ্বেগের মধ্যে ফেললেন আহমদ মুসা। এই অবস্থায় আপনি কিভাবে বন-এ আসবেন? আপনি কোথায়? আমি হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করব?' বলল পুলিশ প্রধান।

'না স্যার, হেলিকপ্টার লাগবে না। আমরা অনেক দূর এসে গেছি। আমরা ঠিক সকালের মধ্যেই বন-এ পৌঁছে যাব।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে, আপনার কথা মেনে নিলাম। আপনার জীবন আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান মি. আহমদ মুসা। নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন। তাহলে মি. আহমদ মুসা...।' থামল পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

‘ঠিক আছে স্যার। এখনকার মত এটুকুই। রাখি স্যার। বাই।’ আহমদ মুসা বলল।

মোবাইলের কল অফ করে পকেটে রেখে আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মি. সেনফ্রিড কাজ হয়ে গেল। আর কিছু চিন্তা নেই। জার্মানীর পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস এখনই বন ও ব্রুমসারবার্গের পুলিশ ও জুডিসিয়াল প্রসিকিউশনকে বলে দিচ্ছেন সব কোর্টের উপর নজর রাখতে এবং ব্রুমসারবার্গ স্টেট হস্তান্তরের জন্য যারা যাবে, তাদের নজরে রাখতে। আর পুলিশ প্রধান নিজেই সকালে ওখানে যাচ্ছেন।

আহমদ মুসা থামতেই ব্রুনার মা কারিনা কারলিন, ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড এবং ব্রুনা প্রায় এক সাথেই বলে উঠলো, ‘ক্লোন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যা যা বললেন আপনি, সবই তাহলে ঠিক?’

‘হ্যাঁ, ব্ল্যাক লাইটের সম্পত্তি দখলের বড় অস্ত্রই হলো ক্লোন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘নকল মা তাহলে মায়ের ক্লোন ছিল, এটা তাহলে প্রমাণ হলো।’ বলল ব্রুনা।

‘হ্যাঁ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র! কি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র! পঁচিশ বছর আগে মায়ের ক্লোন করা হয়েছে, এটা আপনি কিভাবে জানলেন।’ জিজ্ঞাসা ব্রুনার।

‘আমি এটা আলদুস আলারীর কাছ থেকে শুনেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার উঠল, ‘আর সময় নষ্ট করা নয়। সকালেই আমাদের পৌঁছতে হবে বন-এ। চলুন গাড়িতে উঠি।’ আহমদ মুসা বলল। সবাই উঠল।

‘বেটা আহমদ মুসা, তুমি এসব কি বললে! আমার কানকেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। আর তোমাকে মানুষ বলেও বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি এ্যাঞ্জেল বেটা! আমাদের ভাগ্যে কিভাবে সৌভাগ্যের সূর্য হয়ে উদয় হলে? ঈশ্বরকে আমি কিভাবে ধন্যবাদ জানাব!’ অনেকটা স্বাগত কন্ঠে বলল মিসেস কারিনা কারলিন। তার কন্ঠ ভারি, অশ্রুরুদ্ধ।

‘হ্যাঁ মা, আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাদের চালান। সব ধন্যবাদ, সব প্রশংসা তাঁরই জন্যে।’ আহমদ মুসা বলল।

সবাই গাড়ির দিকে চলল।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে উঠতে যাচ্ছিল।

ব্রুনা বাধা দিয়ে বলল, ‘এই অবস্থায় আপনি গাড়ি ড্রাইভ করবেন না ভাইয়া। আমি ড্রাইভ করছি। আপনি পাশে বসে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেই চলবে। বাবাকে জিজ্ঞেস করুন আমি ভালো ড্রাইভার কি না।’

‘ধন্যবাদ ব্রুনা। তুমিই ড্রাইভ কর।’ বলে আহমদ মুসা পাশের সিটে গিয়ে বসল।

আলদুনি সেনফ্রিড হাত ধরে গাড়িতে তুলল তার স্ত্রী কারিনা কারলিনকে।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

নি:শব্দে চলছে গাড়ি।

নীরবতা ভাঙল ব্রুনা। বলল, ‘এই মুহূর্তে আমার মত সুখী দুনিয়াতে আর কেউ নেই। স্যার, আপনি আমার পাশে। আমার প্রিয় মা-বাবা আমার সাথে। এই চলা যদি চলতেই পারতাম অনন্তকাল।’ আবেগে ভারি কন্ঠ ব্রুনার।

‘আরে ব্রুনা, আনালিসার কথা তো বলছিস না, সে কোথায়?’

ব্রুনা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও বলতে পারল না। ঠোঁট তার কেঁপে উঠে থেমে গেল।

‘সে জার্মানীর বাইরে। এখন বল তোমার শরীর কেমন?’ আলদুনি সেনফ্রিড প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

নানা ধরনের কথা শুরু হলো বাপ, মা ও মেয়ে এই তিনজনের মধ্যে। চলতেই থাকল কথা।

আহমদ মুসা তাদের আলোচনায় যোগ দিল না।

সে ভাবছে আগামী কাল সকালের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে।

৭

আহমদ মুসারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে বন-এ পৌছতে পারল না। অবশ্য পুলিশ প্রধান বরডেন ব্রিসের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ তাদের ছিল।

পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস সকাল ৮টায় বার্লিন থেকে বন পৌছেছিল।

সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যেই ব্ল্যাক লাইটের লোকদের পুলিশ লোকেট করে ফেলে। ওরা সাড়ে ৯টাতেই বন-এর একটা কোর্টে পৌছেছিল। সকাল ১০টায় ব্রুমসারবার্গ স্টেট হস্তান্তরের দলিল হবার কথা।

ঠিক সকাল ১০টায় ওরা দলিল রেজিস্ট্রির জন্যে কোর্টে ওঠে। কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হয়ে সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় দস্তক্ষত ও টিপসহির মাধ্যমে তার স্টেট হস্তান্তর করছে, এই হলফ যখন নকল কারিনা কারলিন করে এবং তা রেকর্ড হয়, তখনই পুলিশ গোটা কোর্ট ঘিরে অ্যারেস্ট করে নকল কারিনা কারলিন ও ব্ল্যাক লাইটের সব লোককে প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও আত্নসাতের অভিযোগে।

কোর্ট প্রাথমিক প্রমাণ চাইলে পুলিশ প্রধান স্বয়ং কোর্টকে জানান, 'যে কারিনা কারলিন স্টেট হস্তান্তর করছে, তিনি সম্পত্তির মালিক নন। প্রকৃত মালিক আসল কারিনা কারলিনের তিনি ক্লোন, নকল। সাড়ে দশটার মধ্যেই আসল কারিনা কারলিন এসে পৌঁছাবেন।'

কোর্ট পুলিশ প্রধানের আবেদনে বেলা ১১টা পর্যন্ত সময় মঞ্জুর করেন।

আহমদ মুসাদের গাড়ি কোর্ট প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছালে পুলিশ প্রধান স্বয়ং কোর্ট থেকে তাদের গাড়ির কাছে আসেন।

এসেই তিনি আহমদ মুসাকে সব জানান।

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং বলেন ব্ল্যাক লাইটের যাদেরকে ধরেছেন তাদের মধ্যেই ব্ল্যাক লাইটের প্রধানও আছেন। তাকে চিহ্নিত

করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আপনি অ্যারেন্ডসীর পুলিশকে বলুন অ্যারেন্ডসী লেকের পশ্চিম তীরে হোটেল অ্যারেন্ডসী ডয়েসল্যান্ডের উত্তর পাশে ১৩০ নাম্বার বাড়িটা ব্ল্যাক লাইটের একটা ঘাঁটি। পুলিশকে ওটা দখলে নিতে হবে।'

ধন্যবাদ আহমদ মুসা। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমি নির্দেশ পাঠাচ্ছি। আর ডিস্কটা আপনি দিন, সেই ছয়টা ক্লোন ও তার লোকদের এখনি ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।' বলল পুলিশ প্রধান।

আহমদ মুসা আসল ডিস্কের একটা কপি পুলিশ প্রধানের হাতে তুলে দিল। আসার পথেই আহমদ মুসা ডিস্কটার একটা কপি করে নিয়েছিল। সাবধানতার একটা অংশ হিসেবেই করেছিল এটা আহমদ মুসা।

ডিস্কটা পকেটে পুরে পুলিশ প্রধান বলল, মি. আহমদ মুসা আপনাকে হাসপাতালে নেয়া প্রয়োজন কি না?'

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ব্রুনা দ্রুত কন্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার তাঁকে হাসপাতালে নেয়া প্রয়োজন। আজকেই উনি দু'বার গুলি বিদ্ধ হয়েছেন, কানে ও কাঁধে। এ ছাড়া দু'দিন আগে তিনি বাম বাহুতেও গুলি খেয়েছেন।'

'সর্বনাশ, এসব কথা তো মি. আহমদ মুসা আমাকে বলেননি। এই আহত অবস্থায় আপনি কাজ করছেন। করবেনই তো! ভুলেই যাচ্ছি কেন যে, আপনি আহমদ মুসা। যাক, আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন।' বলে পুলিশ প্রধান বন-এর পুলিশ কর্মকর্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি মিসেস কারিনা কারলিন এবং তাঁর স্বামী ও মেয়েকে কোর্টে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি নিজে আহমদ মুসাকে সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যান।'

'প্লিজ, আমাকে সামরিক হাসপাতালে নয়, পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে চলুন। হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে আমার দু'টি শর্ত আছে। এক, আমার নাম গোপন করতে হবে, দুই, চিকিৎসা হবে, কিন্তু কোন অপারেশন নয়।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক আছে তাই হবে আহমদ মুসা।' বলে বনের পুলিশ কর্মকর্তাকে পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস বললেন, 'ঠিক আছে পুলিশ হাসপাতালেই নিন।

আমাদের জন্য যে কেবিনগুলো বরাদ্দ, তার কোন একটিতে ওঁকে রাখবেন।' বলল পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

বিশাল পুলিশ বেষ্টনির মধ্য দিয়ে মিসেস কারিনা কারলিনদের নিয়ে পুলিশ প্রধান চললেন কোর্টের দিকে। আর আহমদ মুসাকে নিয়ে বন-এর পুলিশ কর্মকর্তা চললেন পুলিস হাসপাতালের দিকে। তার গাড়ির আগে-পিছে রয়েছে পুলিশের প্রহরা।

পরদিন জার্মানীর সকল কাগজে ৮ কলাম ব্যাপী হেডলাইন:

'শতাব্দীর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ষড়যন্ত্র দিনের আলোতে নিয়ে এসেছে জার্মান পুলিশ।' বিবরণে লেখা হয়েছে কি করে বড় বড় স্টেট মালিকদের ক্লোন তৈরি করে মালিকদের হত্যা করে তার জায়গায় ক্লোনকে বসিয়ে একের পর এক সম্পত্তি গ্রাস করা হয়েছে তার কাহিনী। কারিনা কারলিনের ব্রুমসারবার্গের স্টেটসহ সাত সাতটি স্টেটের ক্লোন ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরন কাহিনী আকারে পত্রিকায় এসেছে। তারা লিখেছে , ব্রুমসারবার্গের ঐতিহ্যবাহী পরিবারের উত্তরসূরি কারিনা কারলিনের ক্লোন তৈরি করে তাদের দশ হাজার একরের স্টেট দখল করতে গিয়ে এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেছে। ষড়যন্ত্রকারীরা আসল কারিনা কারলিনকে কিডন্যাপ করে তার জায়গায় তার ক্লোনকে বসিয়ে তার মাধ্যমে স্টেট হস্তান্তরের সব ব্যবস্থা চুড়ান্ত করেছিল। কিন্তু রেজিস্ট্রির সময় শেষ মুহূর্তে তারা ধরা পড়ে যায়। পুলিশ বিশ্বস্ত সূত্রের খবর পেয়ে তাদের ধরে ফেলে এবং পুলিশ 'ব্ল্যাক লাইট' নামক ষড়যন্ত্রকারীদের সব ষড়যন্ত্রের রেকর্ডসংবলিত একটা কম্পিউটার ডিস্ক পেয়ে যায়। ডিস্ক থেকে তথ্য উদ্ধার করেই পুলিশ উত্তর জার্মানীর আরও যে ৬টি স্টেট ষড়যন্ত্রকারীরা ক্লোন করে দখল করে নিয়েছিল সেগুলোতে একযোগে অভিযান চালায় এবং ক্লোনসহ তাদের লোকদের ধরে ফেলে। এসব স্টেটের আসল মালিকরা কোথায় কিংবা তাদের কি করা হয়েছে পুলিশ এখনো তার অনুসন্ধান চালাচ্ছে। ভয়াবহ, বিপজ্জনক ও সুবিশাল এই ষড়যন্ত্র ধরে ফেলার কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে দেশের সকল প্রান্ত থেকে সকলেই পুলিশের প্রশংসা করছে এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে এবং পুলিশ প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার ও পুলিশদের জাতির পক্ষে পুরস্কৃত করার দাবি জানানো হচ্ছে।

এই ষড়যন্ত্র বিষয়ে জনগণকে অবহিত করার ক্ষেত্রে দেশের টিভি চ্যানেলগুলো আন্তরিক ভূমিকা পালন করছে। গতকাল থেকে তারা এই ঘটনার উপর অব্যাহতভাবে অনুষ্ঠান প্রচার করছে। পুলিশ প্রধান, ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার, কারিনা কারলিনের পরিবারসহ ষড়যন্ত্রের শিকার ৭টি পরিবারের সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকার ও বক্তব্য নেয়া হচ্ছে।

পুলিশ হাসপাতালের ভিভিআইপি কক্ষের বেডে শুয়ে আহমদ মুসাও পত্রিকার বিবরণগুলো পড়ছিল। এসব রিপোর্ট টিভিতে গতকাল থেকেই সে দেখে আসছে। ভীষণ খুশি আহমদ মুসা অন্যান্য ৬টি স্টেটের সম্পত্তি আত্মসাৎকারী ক্লোন ও তার লোকজন ধরা পড়ার সংবাদে।

পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস আহমদ মুসার কক্ষে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা একটা ইজি চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল।

পুলিস প্রধান বরডেন ব্লিস ঘরে প্রবেশ করেই জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসার কপালে চুমু খেয়ে বলল, ‘আমি আপনার পিতার বয়সের মি. আহমদ মুসা। কিন্তু আমার ইচ্ছা করছে, আপনার পা ছুঁয়ে আপনাকে স্যালুট দিতে।’

আহমদ মুসা ও বরডেন ব্লিস কেউ-ই দেখতে পায়নি দরজায় এসে দাঁড়ানো ব্রুনা, ব্রুনার মা কারিনা কারলিন ও ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডকে।

পুলিস প্রধান থেমেই আবার বলল, ‘মি. আহমদ মুসা, আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে গোটা বিষয় জানিয়েছি। সেটা জানাতে গিয়ে আপনার কথা তাদের বলতে হয়েছে। আপনার নাম গোপন করতে বলেছিলেন, সেটা তাঁদের কাছে গোপন করা সম্ভব হয়নি। তারাও আপনাকে জানেন দেখলাম। আজই একবার তাঁরা আপনার সাথে দেখা করতে আসবেন।’

‘ধন্যবাদ স্যার। ভালো হতো যদি আপনি আমার ব্যাপারটা তাঁদের কাছে গোপন রাখতে পারতেন। আমি...।’

‘কেন ভাইয়া, গোপন রাখতে হবে কেন? কত ভালো হতো যদি পত্রিকা ও অন্য মিডিয়াগুলো কাহিনীর পেছনের কাহিনী প্রচার ও প্রকাশ করতে পারতো।’

আহমদ মুসা কথার মাঝখানেই উচ্চস্বরে কথাগুলো বলতে বলতে ব্রুনা ঘরে প্রবেশ করল। তার সাথে তার বাপ-মাও।

‘ঠিক বলেছ মা। আমারও এটাই কথা। গোপন করার কি প্রয়োজন ছিল? কিন্তু বলতো, তোমাদের সাক্ষাৎকারে তোমরা ওর সম্পর্কে কিছু বললে না কেন?’ বলল পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

‘এটা ভাইয়াকে জিজ্ঞাসা করুন স্যার। তিনি যেমন আপনার মুখ বন্ধ করেছেন, তেমনি আমাদেরকেও কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তার সম্পর্কে একটা কথাও যাতে না বলি। তাঁর নির্দেশ না মানার সাধ্য আমাদের আছে?’ ব্রুনা বলল।

‘এই গোপনীয়তা কেন মি. আহমদ মুসা আপনার? ছবি তো নয়ই, আপনার ব্যক্তিত্ব, কাজ ইত্যাদি কেন আপনি প্রকাশ করবেন না? হাজারো মানুষকে এটা অনুপ্রেরণা দিতে পারে।’ বলল পুলিশ প্রধান গম্ভীর কন্ঠে।

‘আমি কখনও রিটায়ারমেন্টে গেলে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করব। কিন্তু মি. বরডেন ব্লিস! স্যার, আপনি অন্তত জানেন, স্বার্থে আঘাত দিয়েছি, ষড়যন্ত্র বানচাল করেছি, এমন শত্রু আমার দুনিয়াজোড়া। তারা দুনিয়াময় ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার কাজ, আমার কাজের ধরণ, কোথায় কোন রুপে কাজ করছি, আমার এখনকার লোকেশন ইত্যাদি মানে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ জানার জন্য। আমি আমার এসব প্রকাশ করে একদিকে যেমন তাদের মাথা ব্যথা বাড়াতে চাই না, তাদের উস্কে দিতে চাই না, অন্য দিকে তেমনি আমি যা করছি, তা একজন মানুষ হিসেবে আল্লাহর জন্যে করছি, মানুষের জন্যে মানুষ কিছু করলে আল্লাহ খুমি হন বলে করছি, কোন প্রশংসা, কোন ধন্যবাদ, কোন বিনিময় পাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। তাই এসব আমি অহেতুক প্রকাশ্যে প্রচার করতে চাই না।’ আহমদ মুসা বলল। তার গম্ভীর কন্ঠ খুব নরম ও শান্ত। আহমদ মুসা থমল।

কেউ কোন কথা বলল না।

নির্বাক যেন সকলে। সম্মোহিত যেন তারা।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ ব্রুনা ও ব্রুনার মা কারিনা কারলিনের চোখের কোণা ভিজে উঠেছে অশ্রুতে। এক সময় নীরবতা ভেঙে পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস ধীর কন্ঠে বলল, ‘মি. আহমদ মুসা, আপনি কাজের দিক দিয়ে যেমন আকাশস্পর্শী, তেমনি

মনের দিক দিয়েও এক অতলান্ত সাগর। একটা কথা বলুন মি. আহমদ মুসা, আল্লাহ অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্যে করা মানে মানুষের জন্যে করা, কারণ মানুষ মানুষের জন্যে কিছু করাকে ঈশ্বর পছন্দ করেন-এই মহান কনসেপ্টে আপনি উদ্ধুদ্ধ হলের কোথা খেকে?'

আমার ধর্ম ইসলাম আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট মানুষের কাছ থেকে এটা চান, কারণ পৃথিবীতে শান্তি ও স্বস্তির সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে এটা খুবই প্রয়োজন।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা!' বলে আনন্দ-বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা পুলিশ প্রধান কিছু বলতে যাচ্ছিল, 'এই সময় হাসপাতালের পরিচালক ঘরে প্রবেশ করল। বলল বরডেন ব্লিসকে, 'স্যার, অয়্যারলেস পেলাম, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখানে আসছেন।'

শুনেই শশব্যস্ত হয়ে উঠল পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস। বলল পরিচালককে, 'সবকিছু ঠিক আছে তো। এই ঘরটাকে আরেকটু ড্রেসিং করুন। আরও সোফা এখানে নিয়ে আসুন।'

'মি. আহমদ মুসা, আমরা চলি। পরে আসব।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'না মি. সেনফ্রিড। আপনারা বসুন ড্রইং রুমে। আপনাদের সাথে দেখা হলে খুশিই হবেন তারা।' পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস বলল।

'ঠিক আছে? অবশ্যই বসছি।' বলে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এক সাথে অ্যাটাস্ড ড্রইং রুমে প্রবেশ করল ব্রুনারা।

আহমদ মুসার কক্ষকে ঠিকঠাক করার জন্যে অনেক লোক এসে গেল। হাসপাতালের অফিসার-কর্মচারিদের তখন ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেছে চারদিকে।

সর্বত্রই একটা সাজসাজ রব। কিন্তু তাদের সকলের মধ্যেই একটা কানাঘুষা চলছে ভিভিআইপি কক্ষটিতে কে আছেন? পুলিশ তো নয়; তাহলে কে, যার জন্যে পুলিশ প্রধান এসে বসে আছেন, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন?

আর শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না আহমদ মুসার। গতকাল ছাড়া পেতে চেষ্টা করেছিল হাসপাতাল থেকে। কিন্তু পুলিশ প্রধানের বাধায় সেটা হয়নি। দুর্বলতা কাটার জন্যে আরও দু'একদিন বিশ্রামে থাকা দরকার।

পাশ ফিরে শুয়ে আহমদ মুসা পাশ থেকে আইফোনটা তুলে নিল। পুলিশ প্রধান আইফোনটা তাকে প্রেজেন্ট করেছে।

আইফোন হাতে নিয়ে আহমদ মুসা হোমস্ক্রীন ওপেন করতেই একটা মেসেজ দেখতে পেল। ওয়াশিংটন থেকে সারা জেফারসন পাঠিয়েছে। ক্লিক করে ফুল টেক্সট তাড়াতাড়ি সামনে নিয়ে এল। সংক্ষিপ্ত মেসেজটা পড়েই চমকে উঠেছে সে। মেসেজটি পড়ল আহমদ মুসা:

'গতকাল এফবিআই জানিয়েছে, দু'দিন আগে ওয়াশিংটনে আপনার শত্রু তিনটি শক্তিশালী সংগঠন মিটিং করেছে। সে মিটিং-এ আপনাকে শায়েস্তা করার জন্যে আপনার পরিবারের উপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত হয়েছে। গতকাল থেকে বাড়িতে এফবিআই পাহারা বসিয়েছে। এফবিআইকে জানানো ছাড়া কোথাও বেরুতে নিষেধ করা হয়েছে। আপা এ সময় আপনাকে এসব জানিয়ে ডিস্টার্ব করতে চাননি। কিন্তু উদ্বেগ আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। আপনাকে সব জানিয়ে সেই উদ্বেগ কিছু হালকা করার চেষ্টা করলাম।' সারা।

আহমদ মুসার মনে জোসেফাইনের সুন্দর মুখটা ভেসে উঠল। আহমদ মুসা তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তুমি সব সময় আমার সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাব, দুশ্চিন্তা থেকে আমাকে সব সময় দূরে রাখতে চাও। তোমার চিন্তা, দুশ্চিন্তা নিরাপত্তাহীনতা তোমার কাছে কিছুই নয়, কিন্তু আমার কাছে সবকিছু। মনে মনে ধন্যবাদ দিল সারা জেফারসনকে। স্বগতই বলল, ঠিক সময়ে জানিয়েছ তুমি সারা। ওরা তিন সংগঠন কারা আমি জানি না। তবে অনুমান করতে পারি। তাদের হুমকি শূন্যগর্ভ অবশ্যই নয়।

মোবাইল বেজে উঠল এ সময়। কল অন করল আহমদ মুসা।

ওপার থেকে জোসেফাইনের গলা পেতেই সালাম দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'কেমন আছ তোমরা জোসেফাইন, তোমার টেলিফোনের আইডি হাইড করা কেন?'

‘ও কথার উত্তর পরে দেব। বল, কেমন আছ?’ বলল জোসেফাইন।

‘এখন ভালো।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তার মানে আগে ভালো ছিলে না। কি হয়েছিল তোমার?’ বলল জোসেফাইন। তার কন্ঠে উদ্বেগ।

‘আমি জিজ্ঞেস করেছি, তোমরা কেমন আছ। তার জবাব এড়িয়ে গেছ। সে জবাব আগে দাও।’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল ওপার থেকে জোসেফাইন। বলল, ‘হ্যাঁ , তাহলে শোন আমি ভালো আছি, সারা ভালো আছে, আহমদ আবদুল্লাহও ভালো আছে।’

‘ধন্যবাদ। কিন্তু আহমদ আবদুল্লাহ তিন নাম্বারে কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘বয়স অনুসারে সিরিয়াল।‘ বলল জোসেফাইন হেসে উঠে।

‘সারা এল তালিকায়, তার মা বাদ পড়ল কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

আবার হাসল জোসেফাইন। বলর, ‘গ্রুপ’ বা ‘ফ্যামিলি’ বলে একটা কথা আছে না, আমরা একটা গ্রুপ। তাই তার নামটা মনে পড়েছে।’ বলল জোসেফাইন।

মুহুর্তের জন্যে থেমেই জোসেফাইন আবার বলল, ‘ থাক এসব। তুমি সত্যিই ভালো আছ তো? তোমার মিশনের কি অবস্থা?’

‘তুমি খুশি হবে জোসেফাইন, মিশন আমার সফল। কারিনা কারলিন উদ্ধার হয়েছে। তাদের স্টেট রক্ষা পেয়েছে। তার সাথে আরও ছয়টা স্টেট রক্ষা পেয়েছে রাহুগ্রাস থেকে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘থ্যাংকস আল্লাহ। এবার তাহলে আমেরিকার টিকিট কাট।’ বলল জোসেফাইন।

‘কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেন সেটা তুমিই জান।’ বলল জোসেফাইন।

‘জানি, আমার জোসেফাইন আমেরিকায়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘শুধু জোসেফাইন নয়, তোমার সব আমেরিকায়।’ বলর জোসেফাইন।

কথা শেষ করেই আবার বলে উঠল, ‘কথা বাড়িও না। কবে আসছো আমেরিকায়?

‘তুমি যখন বলবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এখনি এস।’ বলল জোসেফাইন। সে হাসল।

‘তাই আসছি। আহমদ আবদুল্লাহর তো গলা পাচ্ছি না?’ আহমদ মুসা বলল।

‘সে সারার কাছে। সে সারাকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে।’ বলল জোসেফাইন।

‘এটা কি ভালো জোসেফাইন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘বাচ্চার স্বাধীনতায় হাত দেবে নাকি?’ বলল জোসেফাইন।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সবচেয়ে আগে যে টিকিট পাব, সে টিকিটেই আমি আসছি জোসেফাইন।’

ভালো থেকো, আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন।’ বলে সালাম দিয়ে আহমদ মুসা কল অফ করে দিল।

চোখ বুজে কিছুক্ষণ হৃদয়ে গেঁথে রাখা জোসেফাইনের ছবি দেখল। তারপর মনে মনে তাকে বলল, জোসেফাইন কোন খারাপ খবর আমাকে দিতেই চাও না, যতটা পার নিজেই তার ভার বহন করতে চাও। তোমাদের বিপদের কথা এখনও গোপন করে গেলে।

আইফোন পাশে রেখে উঠে বসল আহমদ মুসা। হাসপাতালের প্যাড, কলম টেনে নিয়ে একটা চিঠি লেখার পর মোবাইলটা তুলে নিল পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিসকে টেলিফোন করার জন্যে। আর এই সময়ই বরডেন ব্লিস দরজায় নক করে আহমদ মুসার ঘরে প্রবেশ করল।

‘আল হামদুলিল্লাহ, পেয়ে গেলাম আপনাকে। আপনাকেই টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কি ব্যাপার মি. আহমদ মুসা? জরুরি কিছু?’ পুলিশ প্রধান বলল।

'আমার পরিবার এখন ওয়াশিংটনে। কিছু সমস্যা হয়েছে সেখানে। সবচেয়ে আগে যে ফ্লাইট পাব, সেটাতে আজই আমি ফ্লাই করতে চাই মি. বরডেন ব্লিস।' বলল আহমদ মুসা।

এই সাথে পাসপোর্টের একটা কপি দিয়ে দিল বরডেন ব্লিসকে।

পাসপোর্টের কপি নিয়ে পুলিশ প্রধান উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আমি আসছি এখনি মি. আহমদ মুসা।'

ঘর থেকে বেরুলেন পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

পাঁচ সাত মিনিট পর পুলিশ প্রধান ফিরে এল হাসতে হাসতে। বলল, 'কত তাড়াতাড়ি যাবেন দেখুন মি. আহমদ মুসা। বেলা ২টায় লুফথানসা লন্ডন হয়ে ওয়াশিংটন। বিকেল ৪টায় বৃটিশ এয়ারওয়েজের বিশেষ ফ্লাইট লন্ডন, মন্ট্রিল হয়ে ওয়াশিংটন। বিকেল ৫টায় ফ্রেন্স এয়ার লাইনস প্যারিস, রাবাত হয়ে ওয়াশিংটন। পরের ফ্লাইটগুলো আরও দেরিতে বলে সেগুলোর টাইম নেয় হয়নি।'

'ধন্যবাদ মি. বরডেন ব্লিস। অনেক পরিশ্রম করেছেন। আমি দুপুর ২টায় লুফথানসা ফ্লাইটে যেতে চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'তার মানে অন্তত ১২টায় আপনাকে বের হতে হবে। তাহলে হাতে আপনার মাত্র ১ ঘন্টা সময়। পারবেন এর মধ্যে রেডি হতে? মি. সেনফ্রিডের বাসায় আপনাকে যেতে হবে না?' বলল পুলিশ প্রধান।

'না স্যার, ওখানে আর যাচ্ছি না। একটা চিঠি লিখেছি। এ চিঠিটা আপনার লোককে দিয়ে মি. সেনফ্রিডের বাড়িতে পৌছে দিতে হবে। আর স্যার, আমি গোসল করেই রেডি হয়ে যাব। প্লিজ, আপনি বিমান বন্দরে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক আছে আহমদ মুসা। আমি ওদিকের সব ব্যবস্থা করছি। আপনি গোসল করে রেডি হয়ে নিন।'

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

আহমদ মুসা গোসল সেরে পোশাক পরে ব্যাগ গুছিয়ে রেডি হয়েই ছিল। পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস আসতেই তার সাথে বেরিয়ে পড়ল।

এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে বরডেন ব্লিস আহমদ মুসার সঙ্গে একই গাড়িতে উঠল।

ভিআইপি লাউঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর পিএস এসে পুলিশ প্রধানকে তিনটা প্যাকেট দিয়ে গেল।

প্যাকেটগুলো পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস্ আহমদ মুসার সামনে নিয়ে বলল, 'মি. আহমদ মুসা প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে এগুলো আপনার জন্যে উপহার।'

'কি আছে মি. বরডেন ব্লিস এগুলোতে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'একটাতে আছে হিরের নেকলেস মিসেস আহমদ মুসার জন্যে। দ্বিতীয়টিতে আছে হীরের নিবের সোনার কলম মাস্টার আহমদ আবদুল্লাহর জন্যে এবং তৃতীয়টিতে একটা পোষ্ট টুয়েন্টি ফার্স্ট সেনচুরি ০০১ রিভলবার। সিংগেল ট্রিগার এ থেকে ৪টা মিনি সাইজ গুলি বের হয়। এর প্রত্যেকটি গুলির বিস্ফোরণ ক্ষমতা হ্যান্ড মর্টারের একটা গুলির বিস্ফোরণ ক্ষমতার সমান।' বলে পুলিশ প্রধান প্যাকেট খুলে রিভলবারটা আহমদ মুসাকে দেখাল।

একজন পুলিশকে বলে প্যাকেটগুলো আহমদ মুসার লাগেজে ঢুকিয়ে রি-প্যাক করে দিল।

ঠিক বেলা ১টা ৪৫ মিনিটে আহমদ মুসা বিমানে উঠল।

পুলিশ প্রধান তাকে বিমান পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

ব্রুনা, ব্রুনার মা ও আলদুনি সেনফ্রিড তাদের বন-এর বাসার বাইরের ড্রইংরুমে বসে ছিল। শুনছিল কারিনা কারলিন ব্রুনার কাছ থেকে তার বড় বোন আনালিসার কথা। আহমদ মুসা যাকে গৌরী বলে জানে।

একজন পুলিশ অফিসার গেটের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইল।

ব্রুনা বেরিয়ে গিয়ে তাকে নিয়ে এল।

ড্রইং রুমে এসে পুলিশ অফিসার কারিনা কারলিনকে লক্ষ করে বলল, ‘আপনি নিশ্চয় মিসেস সেনফ্রিড?’

‘জি, হ্যাঁ। বলুন তো কি ব্যাপার?’

‘কিছু নয় ম্যাডাম। একটা চিঠি আপনাকে দিতে এসেছি।’ একটা ইনভেলাপ তার দিকে বাড়িয়ে বলল পুলিশ অফিসার।

‘কার চিঠি?’ চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল কারিনা কারলিন।

‘আহমদ মুসার চিঠি। যিনি পুলিশ হাসপাতালে ছিলেন।’ বলল পুলিশ অফিসার।

‘ছিলেন মানে? এখন নেই?’ প্রশ্ন ব্রুনার। তার কন্ঠে কিছুটা উদ্বেগ।

‘নেই ম্যাডাম। বেলা ২টায় তিনি ওয়াশিংটন যাত্রা করেছেন।’ বলল পুলিশ অফিসার।

পুলিশ অফিসারের কথাটা কানে যেতেই ব্রুনার মনে হলো সে যেন আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল মাটিতে। আঘাতটা তার বুকে এস বিঁধল। হৃদয়ের কোন এক অন্ধকার কোণ থেকে সজীব যন্ত্রণার এক প্রস্রবণ তার হৃদয় মনে এক সয়লাব নিয়ে এল। সে সয়লাব অশ্রু হয়ে নেমে এল দু’চোখ দিয়ে। দু’হাতে মুখ ঢেকেছে ব্রুনা।

পুলিশ চলে গেছে।

‘ব্রুনা দেখতো আহমদ মুসা কি লিখেছে?’

বলে ব্রুনার মা কারিনা কারলিন ব্রুনার দিকে চাইল। দেখল, ব্রুনা দু’হাতে মুখ ঢেকে সোফায় মাথাটা এলিয়ে দিয়েছে।

কারিনা কারলিন সোফার ওদিকে একটু সরে গিয়ে ব্রুনার হাত টেনে নিয়ে বলল, ‘কি হয়েছে মা তোমার? অসুস্থতা বোধ করছ?’

কিন্তুব্রুনার মুখের দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়ে দেখল অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে তার দু’গণ্ড। কি হয়েছে মা? আহমদ মুসা চলে গেছে তাই কি?’

‘কারলিন, আহমদ মুসা কি লিখেছে পড়। জানাই তো গেল না ঘটনা কি?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

কারিনা কারলিন একবার তাকাল আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে। তার দুই চোখে কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা অনুসন্ধান।

'ঠিক আছে পড়ছি সেনফ্রিড।' বলে চিঠিটা মেলে ধরল তার চোখের সামনে।

"মা,

খুব ভালো হতো যদি আমি আপনার স্নেহের সান্নিধ্যে কয়েকটা দিন কাটাতে পারতাম। কিন্তু হলো না। খুব জরুরি হওয়ায় আকস্মিকভাবেই আমাকে ওয়াশিংটন যেতে হচ্ছে।

আপনাদের সাথে কথা বলে বিদায় নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ইচ্ছা করেই তা করলাম না। বিদায়ের বেদনা আমি সইতে পারি না, বেদনার অশ্রু আমার কাছে অসহনীয় লাগে-এ জন্যেই পেছনে ফিরে তাকাতে ভয় পাই আমি। স্মৃতি আমার কাছে এক যন্ত্রণাদায়ক ইতিহাস। এই আমার অসৌজন্য ও বেয়াদবিকে আপনারা নিশ্চয় মাফ করবেন। ব্রুনাকে বুদ্ধিমতি, সাহসী ও স্পষ্টভাষী এবং মি. সেনফ্রিডকে পিতাসুলভ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হিসেবে পেয়েছি। তাঁরা আমার মিশনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। খুবই ভালো লাগছে গৌরীর দেয়া দায়িত্ব আমি পালন করতে পেরেছি। আমার জীবন রক্ষায় গৌরীর আত্মবিসর্জনকে চিরদিন আমি সম্মান করে যাব।

আপনার ছেলে আহমদ মুসা।"

চিঠি শেষ করতে গিয়ে কারিনা কারলিনও কেঁদে ফেলল। বলল, ছেলেটা শুরু থেকেই আমাকে মা বলে ডেকেছে। তার এত সুন্দর মা ডাকে আমি কখন যেন তার মা হয়ে গেছি। বলে গেলেও পারত বাছা। আসলে ওর মনটা খুব নরম। এখন যেমন কাঁদছি আমরা, তখনও তো কাঁদতাম। এটাই সে এড়াতে চেয়েছে।

ব্রুনা এসে মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। বলল, 'মা, উনি আপার ঋণ পরিশোধ করতে এসেছিলেন। আমাদের সাথে সম্পর্ক ওঁর কাছে কিছুই নয় মা।'

'মা ব্রুনা, মনে আছে একদিন সে বলেছিল, সময়ের স্রোতে সে ভাসমান। সময় তাকে কখন কোথায় নিয়ে যায়, এটা তিনিও আগাম জানেন না।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘না বাবা, উনি তো লিখেছেন, উনি বলে যেতে পারতেন। একজন লোক এভাবে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাবেন। এই পৃথিবীতেই তিনি আছেন, কিন্তু তার কিছুই আমরা জানব না, একটা টেলিফোন নাম্বারও নয়, এটা কেন বাবা?’ বলল ব্রুনা। তার কন্ঠ কান্নারুদ্ধ।

‘ঠিক মা, এটা ভাবা যায় না। কিন্তু সে যে আহমদ মুসা। একটু ভিন্নভাবে তাকে দেখতেই হবে।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘ভিন্নভাবে দেখতে পারছি না বাবা। মানুষ মানুষই। এটা তাঁর চেয়ে ভালো আর কেউ বোঝে না।’ বলে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল ব্রুনা।

কারিনা কারলিন তাকাল আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে। বলল, ‘ছোট তো, মনে খুব কষ্ট পেয়েছে। সেই তো শুরু থেকে আহমদ মুসার সাথে আছে।’

‘কষ্ট সে আগেই পেয়েছে কারলিন।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘কেন, কিভাবে, কোথায়?’ কারিনা কারলিনের চোখে কিছুটা উদ্বেগ।

‘না জেনে, না বুঝেই ব্রুনা বড় একটা আশার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল।’ বলল সেনফ্রিড।

‘সে আশা কি আহমদ মুসাকে নিয়ে? তারপর?’ কারিনা কারলিন বলল।

‘পরে বলব, চল দেখি ব্রুনা কি করছে। বলে উঠে দাঁড়াল সেনফ্রিড।

কারিনা কারলিনও উঠল।

লুফথানসার ফ্লাইট সাঁতার কাটছে আকাশে।

এগোচ্ছে সে ওয়াশিংটনের দিকে।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই লুফথানসা পৌঁছবে ওয়াশিংটনের আকাশে।

আহমদ মুসার দু’চোখ জানালা দিয়ে বাইরে।

দেখছে অন্ধকার চাদরে ঢাকা আমেরিকাকে।

ঐ অন্ধকারের মত রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা এক ষড়যন্ত্রের পিছু নিতে আবার সে আমেরিকায়। ক্রল করছে জাহাজ ল্যান্ডিং-এর জন্যে।

পরবর্তী বই

আবার আমেরিকায়

কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Zareen Firdegar Chowdhury
2. Arif Rahman